“চাঁদনী আপার দেবর আমার বুকে হাত দিয়েছে, আপা। আমি খুব ব্যাথা পেয়েছি জানো? কি বিশ্রী ছোঁয়া!”

সাত বর্ষীয় ছোটো বোনের মুখে এমন বিশ্রী একটা কথা শুনতেই শরীরটা শিরশির করে কেঁপে উঠলো চিত্রার। ঘর্মাক্ত মুখ খানা রাগে লালবর্ণ ধারণ করলো। বোনের দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলো ছোট্টো মেয়েটা ভয়ে কেমন গুটিশুঁটি মেরে

আছে! তাড়াতাড়ি বোনকে নিজের দু’হাতের আঁজলে আগলে নিলো সে। হতভম্ব কণ্ঠে বললো,

“দেখি তো আমার চেরি সোনা, জামাটা একটু সরাও। আপা একটু দেখি।”সবচেয়ে নিকটতম ভরসার স্থান পেয়ে মেয়েটা নির্দ্বিধায় জামা সরালো। জামা সরাতেই আৎকে উঠলো চিত্রা। কেমন লাল হয়ে গেছে মেয়েটার সাদা ধবধবে চামড়াটা! কি

ভীষণ বিশ্রী ভাবেই না ছুঁয়েছে এতটুকু বাচ্চাটাকে! ভাবতেই ঘৃণায় টইটম্বুর হয়ে গেলো চিত্রার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা। ক্ষ্যাপে উঠলো সে। অথচ বাড়ি ভর্তি এত মানুষ! ঝোঁকের বশে কিছু করে বসলে তার খেসারত না আবার ছোটো চেরিকে দিতে হয়। বিরক্ত, রাগ দুটো অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যখন আ*ন্দোল*ন

শুরু হলো চিত্রার মস্তিষ্কে, তখন বাহির থেকে তার ডাক পড়লো। আজ তার বড় বোন চাঁদনীর গর্ভকালীন সময়ের সাত মাস পূর্ণ হওয়ায় ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেই চাঁদনীর শ্বশুর বাড়ির লোকজনও এসেছে। অবশ্য তার আপন বড় বোন না চাঁদনী, তার বড় চাচার মেয়ে হলো চাঁদনী আপা।

আর ছোট্ট চেরিও তার আপন বোন না। তার ছোট চাচার মেয়ে হলো চেরি। চেরির পূর্ণনাম হলো তোফা। কিন্তু আদর করে সবাই বাচ্চাটাকে চেরি বলে। আর মেয়েটা চেরি ফলের মতনই সুন্দর, আদুরে, গোলগাল। তাই তো এতটুকু বাচ্চাও আজ বাজে ছোঁয়ার স্বীকার হলো। চিত্রার পরিবারটা বেশ বড় পরিবার বলা যায়। চিত্রার মা-বাবা, বড় চাচা-

চাচী, ছোট চাচা-চাচী, চিত্রার আপন বড় ভাই তুহিন, বড় চাচার ছেলে দু'জন দিহান আর তৃষান, ফুপি আর ফুপির একমাত্র ছেলে বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্য অনয়, চেরি,চেরির আরেকজন বড় বোন যে চিত্রারও বড় অহি আপা এবং চিত্রা নিজে। চাঁদনীও বড় চাচার মেয়ে কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে বিধায় তাকে এই পরিবারের দলে আর টানা হয়

না কারণ সে এখন অন্যের ঘরের। একমাত্র চাঁদনীর বিয়ে হওয়ার ফলে এত বড় পরিবারে একজন মাত্র সদস্য কমেছে।

“আপা, আম্মু শুনলে তো আমায় বকবে তাই না? আম্মু তো বলে দুষ্টুমি করতে না এত। অচেনা কারো সাথে খেলতে না। আমি কীভাবে জানবো ঐ ভাইয়াটা আমাকে চকলেটের কথা বলে এমন ব্যাথা

দিবে! আমি আর দুষ্টুমি করবো না, আপা।”চেরির এমন অসহায়ত্ব দেখে বুক ভার করে কান্না এলো চিত্রার। বয়ঃসন্ধির বয়স তো, তাই আবেগের স্রোতে কান্নাটাই আসে প্রথমে। কিন্তু সে কাঁদবে না মেয়েটার সামনে, তাহলে মেয়েটা আরও বেশি ভয় পেয়ে যাবে। কণ্ঠনালিতে আটকে থাকা কান্নার স্রোতটা গিলে ফেললো

চিত্রা। খুব কষ্টে মুখে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে বললো,

“কেনো খেলবে না তুমি হ্যাঁ? অবশ্যই খেলবা। আপা আছি না তোমার সাথে? কেউ কিছু করবে না আর দেখো। তুমি কেবল ঐ পঁ*চা ভাইয়াটার রুমের সামনে আর যাবে না, কেমন? মনে থাকবে তো?”অবুঝ চেরি ডানে-বামে মাথা নাড়ালো। কি নিষ্পাপ ছোটো

মুখখানা! টানা টানা, মায়া মায়া দু’টি চোখ বাচ্চাটার। অনেক ফর্সা আর স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় ভীষণ আদুরে লাগে মেয়েটাকে। আর এই ছোট্ট মেয়েটার শরীরে হাত দিতে নাকি বাঁধে নি ঐ লোকটার। কিছু তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এত সহজে তো ছাড়া যাবে না অ*স*ভ্য টাকে। বোনের মুখ খানা ধুইয়ে দিয়ে সুন্দর করে চুল গুলো বেঁধে দেয়

চিত্রা। কান্না করতে করতে লাল হয়ে গেছে বাচ্চাটার মুখ। পারে না যেন বুকের সবটুকু স্নেহ ঢেলে দেয় মেয়েটার তরে।চেরিকে তৈরী করিয়ে চিত্রা নিজেও গোসল করে এলো। মাত্রই কলেজে থেকে এসেছিলো সে। সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা তার। তাই এখন নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলেজে। সে সুবাধেই বাড়িতে অনুষ্ঠান থাকা স্বত্তেও তাকে

কলেজ যেতে হয়েছিলো। সে অবশ্য তত উন্নত শ্রেণীর ছাত্রী না। কোনোমতে চলনসই রেজাল্ট হলেই সে সন্তুষ্ট। ভাদ্রের উত্তপ্ত গরমে পরিবেশ ঘর্মাক্ত। আর সেই গরম দিয়ে এসে হুট করে এমন ঘটনার সম্মুখীন হওয়াতে বিরক্তিতে তেতো ভাব চলে এলো তার শরীরে। গোসল করায় আপাতত কিছুটা শান্তি মিলছে।

গোসল করে লাল টকটকে একটা থ্রি-পিস পড়লো চিত্রা। অতঃপর চেরির হাত ধরে বাড়ির বাগানের দিকে এগিয়ে গেলো,মূলত অনুষ্ঠান টা সেখানেই।বিরাট আয়োজন করা হয়েছে চাঁদনীর জন্য। কত রকমের খাবারের যে আয়োজন করা হয়েছে তা হিসেব করেও শেষ করা যাবে না যেন। চিত্রা ছুটে এসেই ধপ করে

তার আপুর পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো।

চিত্রাকে দেখে ভারী পেটের গোলগাল, ফর্সা ধবধবে চাঁদনী মুচকি হাসলো। বাম গালটা টেনে দিয়ে বললো,

“কই ছিলিস চিতাবাঘ? এতক্ষণ লাগিয়ে কী পরীক্ষা দিয়েছিস শুনি! পরীক্ষাকে এত সিরিয়াসলি নেওয়ার মেয়ে তো তুই না? কি ব্যাপার

শুনি!”বড় আপার দিকে আর চোখে তাকিয়ে মুখ বাঁকালো চিত্রা। বেশ ভাব নিয়েই বললো,

“তোমাদের মতন জর্জ-ব্যারিস্টার হওয়ার মতন ছাত্রী হয়তো না তাই বলে পাশ মার্কটা তুলবো না? বাবাকে তো চেনো, ফেল করার অপরাধে না আবার জেলে দিয়ে দেয়। নিজের ক্ষমতার যে দাপট দেখায় সে!”

চিত্রার কথায় হাসলো চাঁদনী। মেয়েটা তার বাবাকে তেমন পছন্দ করে না বলা যায়, বেশ ভয় পায়। একমাত্র নিজের বাবাকে ছাড়া পুরো পৃথিবীকে উ*ত্যক্ত করার ক্ষমতা ওর আছে। বাবার সাথে ওর যে শীতল একটা যুদ্ধ প্রতিনিয়ত হয় তা সবারই জানা আছে। তবুও নিজের বাবাকে তো আর এমন কথা বলা শোভা পায় না। সেই জন্যই চাঁদনী

চোখ রাঙালো, ছোট্টো ধমক দিয়ে বললো,“এমন বলে না চিতাবাঘ, তুই না ভদ্র মেয়ে।”

“হ্যাঁ, আমি কী তা অস্বীকার করেছি? ভদ্র বলেই তো পিছে পিছে বলছি, অ*ভদ্র হলে তো মুখের সামনে বলতাম।”

কথাটা বলেই ফিচলে হাসলো চিত্রা। চাঁদনী চেয়েও রাগী রাগী মুখ করে রাখতে পারলো না। চিত্রাটা এমনই,

যেখানে থাকবে সেখানেই হাসির মেলা বসবে।

চাঁদনী আর চিত্রার কথার মাঝে চোখের গোল চশমাটা ঠেলতে ঠেলতে হরেক পদের ভাজার থালা নিয়ে উপস্থিত হলো অহি। ঘাঁড় অব্দি চুল গুলো গরমে বেশ বিরক্ত করছে তাকে। অহির মুখমন্ডলে একটা নিষ্পাপ নিষ্পাপ ভাব থাকে

সবসময়। আর মেয়েটা বেশ গম্ভীরও।

বড় পিতলের থালাটার মাঝে সাত রকমের ভাজি। ভারী থালাটা চাঁদনীর সামনে রেখে ক্ষান্ত হলো সে। সব খাবার আপাতত চলে এসেছে। থালাটা রেখেই ওড়না দিয়ে নিজের মুখটা মুছলো অহি। চেরিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ছোট্টো কণ্ঠে বললো,“তোমার খিদে লেগেছে,

চেরি? আপা কি তোমাকে খাবার খাইয়ে দিবো?”

ছোট্টো চেরি অহির কোমড়ের দিকে জামা আঁকড়ে ডানে-বামে মাথা নাড়িয়ে বললো,

“বড় আপার খাওয়া হোক, তারপর আমি খাবো। চিত্রা আপা খাইয়ে দিবে।”

চেরির কথাটা ভালো লাগলো না অহির। বিরক্তিতে নাক-মুখ কুঁচকে বললো,

“তোমার চিত্রা আপা নিজের খাবার নিজে খেতে পারে নাকি? যে তোমাকে খাইয়ে দিবে!”

অহির কথায় মুখ ভেংচি কাটলো চিত্রা। চেরির দিকে তাকিয়ে মুখ ফুলিয়ে বললো,

“তোমার মেঝো আপা অনেক খেতে পারে বুঝলা? তাই তো এমন কাঠির লাহান শুকনা।”

“এই চিত্রা, কেমন ভাষার ব্যবহার করিস বাড়িতে? তোর সাথে থেকে চেরিও এসব শিখে।”

অহির নাক-মুখ ছিটকানো কথায় ফিক করে হেসে দিলো চিত্রা। হাসতে হাসতেই বললো,“ছোট আপা, তুমি তো শিক্ষক হবে তাই

না? তোমার সাথে পার্ফেক্ট মানাবে সেই পেশা। এখনই তোমার মাঝে একটা মাস্টারনি মাস্টারনি ভাব আছে। সমস্যা নাই, তুমি আমাদের দিয়েই প্রথম প্রেকটিস টা করতে পারো। আমরা মাইন্ড করবো না।”

চিত্রার কথার তালে চাঁদনীও হাসলো। অহি কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলো উত্তর বিহীন। চিত্রার সাথে কথা বলা টাই একটা বোকামি। আর

অহি বরাবরই নিজেকে ভীষণ চালাক দাবী করে।পুরো বাগান ভর্তি নিজেদের বাড়ির মানুষেই গিজগিজ করছে। মাত্রই অনুষ্ঠান শুরু হবে। হুট করে কোর্ট প্যান্ট পড়া চাঁদনীর দেবরটা হাজির হলো। ধপ করে বসে পড়লো চিত্রার পাশে। তাকে দেখতেই গুটিয়ে গেলো ছোট্টো চেরি। চিত্রারও হাসি হাসি মুখে অমাবস্যা নামলো। মুখ আঁধার করে

সে চাঁদনীর পাশ থেকে উঠে চেরির সাথে দাঁড়ালো।

চাঁদনীর দেবর মহিন সবার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসলো। গদোগদো কণ্ঠে চিত্রার উদ্দেশ্যে বললো,

“আরে আরে বেয়াইন সাহেবা, উঠে পড়লেন যে! আমার পাশে বসলে কি ক্ষয় হয়ে যাবে নাকি শরীর?”

চিত্রা মুখ বাঁকালো। অন্যদিকে তাকিয়ে বললো,“আপনার তো

অনেক কারেন্ট, যদি শক খেয়ে যাই।”

চাঁদনী কোনো মতে নিজের হাসিমুখ বজায় রাখলো। বোনের এমন ভঙ্গির কথা তার যে তত পছন্দ হয় নি সেটা প্রকাশ না করার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো।

চিত্রার বড় ভাই তুহিন এগিয়ে এলো বোনদের দিকে। বেশ গম্ভীর স্বরে বললো,

“চিত্রা, যা তো একটু ছাদে, ছাদের মরিচ গাছ থেকে কালো কালো কয়েকটা মরিচ তুলে আন। জানিস না চাঁদনীটা মরিচের ঘ্রাণ পেলেই খুশি হয়ে যায়? যা নিয়ে আয়।”

“ভাইজান, বড় আপার পেটের ছোট্টো বাবুটা ঝাল খেতে পারবে?”

চেরির প্রশ্নে হাসলো তুহিন। মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে বললো,

“হ্যাঁ খেতে পারবে, চেরি। ও তো খুব সাহসী বাবু, তাই পারবে। ঝাল না খেলে বড় হবে কীভাবে!”

“ঝাল না খেলে বড় হওয়া যায় না বুঝি? এ জন্য ই কি বাহার ভাই এত ঝাল খায়? তাই তো বলি বাহার ভাই অত বড় কেন!”তুহিন মিষ্টি হেসে চেরির গাল টেনে দিলো অতঃপর চোখের ইশারায় চিত্রাকে মরিচ আনার তাগাদা দিলো। যেই না

চিত্রা যেতে নিবে তন্মধ্যেই চিত্রার বড় চাচী হাজির হয়। ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বলে,

“আহা, দুপুর হয়ে এলো যে! অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে। চিত্রা মা, যা তো বাহারকেও ডেকে আন। এক দৌড়ে যাবি আবার এক দৌড়ে আসবি। যা।”

চিত্রা মাথা দুলিয়ে ছুট লাগালো ছাঁদের দিকে। তবে যাওয়ার আগে

চেরিকে ছোট আপার সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলো।ছাদে টুকটাক সবজি গাছের পাশাপাশি অনেক রকমের ফুল গাছ অবস্থিত। বিভিন্ন ধরণের ফুল সংগ্রহ করাই যেন চিত্রার কাজ। তার ভীষণ ভালো লাগে এ কাজ করতে। তাই তো ছাদে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পা বাড়ালো ফুল গাছ গুলোর দিকে।

কয়েকদিন আগে তিনটি নতুন ফুলের চারাগাছ লাগিয়ে ছিলো। আজ সব গুলোরই কি সুন্দর হাসি হাসি ফুটন্ত মুখ দেখা যাচ্ছে! চিত্রা মুগ্ধতা সামলাতে না পেরে পত্রলেখা, মৌসন্ধ্যা আর রঙ্গন ফুলের গাছ থেকে একটা একটা করে ফুল ছিঁড়ে নিলো। এই ফুলের গাছ গুলো তত সহজলভ্য নয়। কিছুদিন আগে যখন সে এই তিনটা ফুলের গাছের জন্য

হা হুতাশ করছিলো তখনই ছাঁদে দেখা যায় এ ফুলের গাছ। চিত্রা জানে, ভাইজান বা বড় চাচা ছাড়া কেউ এ কাজ করবে না। কারণ তারা দু’জনই চিত্রার সকল আবদার পূরণ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আর চিত্রার আবদারটাও যেন তাদের কাছেই।আনমনেই ফুল গুলো মাথায় গুঁজতেই পেছন থেকে ভরাট পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এলো,

“এই মেয়ে, ফুল ছিঁড়েছো কেনো? গাছের ফুল গাছেই শোভা পায়। তাকে ছিঁড়ে নিজের চুলে গোঁজার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই।”

গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠের এমন ধমকে বিরক্ত হলো চিত্রা। সেই বিরক্ত ভাব কপাল কুঁচকে ঝেরে ফেলে বললো,

“গাছটা কি আপনার!”

“গাছটা কি তোমার? তোমারও না। গাছটা বর্তমানে যেখানে অবস্থানরত,

যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, গাছটা এখন তার।”

লোকটা যে বরাবরই যুক্তিতে পারদর্শী চিত্রা তা জানে। তাই এই গম্ভীর মানবকে বিব্রতবোধ করাতে কুটিল হেসে বললো,“তাহলে আপনিও তো আমার বাড়িতে অবস্থান করছেন। তাহলে আপনি কি আমার!”

ছেলেটা হাসলো। চিত্রার মাথায় যে অস*ৎ বুদ্ধির ছড়াছড়ি সেটা তার ভালোই জানা আছে। তাই দু'আঙ্গুলের মাঝে সিগারেট টার শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া গুলো আকাশ পানে উড়িয়ে কেমন সতর্ক কণ্ঠে বললো,

"আমায় জ্বালাতে এসো না মেয়ে, নিজেই জ্বলে যাবে।"

চিত্রা মুখ ভেংচি কাটলো। গোমড়া মুখে বললো,

“নিচে আপার অনুষ্ঠান শুরুর পর্যায়ে, আপনাকে ডাকছে বড় চাচী।”

“আমি গিয়ে কী করবো? তোমার আপা কীভাবে এত খাবার খায়, সেটা দেখবো!”

চিত্রার পারদে পারদে বিরক্তের ভাব বাড়লো। মরিচ গাছের দিকে যেতে যেতে বললো,

“একদম আপনার গা ছাড়া ভাব আমায় দেখাবেন না। যেতে মন

চাইলে যাবেন না হয় যাবেন না। অনুষ্ঠান তো আর আমার না যে আপনার হাতে পায়ে ধরে নিয়ে যাবো। আর তাছাড়া আপনি তো সবসময় বাসায় থাকেন না, আজ আছেন বলেই ডাকছে।”“আমি গেলে তো তোমার হি*টলার বাপ নাক-মুখ কুঁচকাবে। যাই একটু উনার শিরার-উপশিরার বিরক্ত ছড়িয়ে আসি।”

চিত্রা আর কোনো উত্তর দিলো না। মরিচ গাছের দিকে এগিয়ে গেলো সে। লোকটার বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া ভাবটা ঠিক পছন্দ না তার। বাবা-মেয়ের এ দিকে ভীষণ মিল। দু'জনেই এই ছেলেকে দেখতে পারে না।

বাহারের ধপাধপ চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেলো। যেতে যেতে বললো,

"শুনো মেয়ে,

আমি ছুঁয়ে দিলে পরে, অকারণেই যাবে ঝড়ে,
গলে যেন সে বরফ গলে না।”চিত্রা তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে। শ্যামলা, ছিপছিপে গড়নের লোকটার এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস গুলোই যেন বয়ঃসন্ধির আকর্ষণ। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল গুলো কেমন হেলেদুলে পড়ছে, সিগারেট ফুঁকে যাওয়া পোড়া ঠোঁটও যেন আরেক প্রকারের

মা*দ*কতা আছে। পুড়ে যাওয়া গাড়ো খয়েরী রঙের ঠোঁটটাকে বহুরূপী ডালিয়া মনে হয়।

চিত্রার ভাবনার মাঝেই নিচ থেকে হৈচৈ ভেসে এলো। চিত্রা দৌড়ে ছাঁদের কার্নিশ ঘেষে নিচে তাকাতেই দেখলো মহিন গাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে বেশ গা ছাড়া ভাব নিয়ে দু'হাত পকেটে গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে বাহার। উফ্, সত্যিই

লোকটা জ্বালিয়ে দিবে একদিন। ঝরঝরে রোদ্দুরে ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে আছে প্রত্যেকের শরীর। সাথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে আকষ্মিক ঘটনায়। ধুপধাপ পা ফেলে তন্মধ্যেই ছুটে এসেছে চিত্রা। মহিন গালে হাত দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেও বোধহয় বুঝতে পারছে না চ*ড়ের কারণটা।

তুহিন এগিয়ে এলো প্রথমে। কোনোরকমের উচ্চবাচ্য না করেই শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,

“কী হয়েছে বাহার ভাই? মহিন কিছু করেছে?”

বাহার যে সবে একটা অদ্ভুত কাজ করেছে সেটার কোনো ছাপ তার মুখমন্ডলে নেই। বরং বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো,“আমি মানুষকে শুধু শুধু কিছু দেই না জানোই তো।

নিশ্চয়ই সে দেওয়ার মতন কাজ করেছে তাই দিয়েছি।”

তুহিন মহিনের দিকে তাকালো। বাহার সোজাসাপ্টা উত্তর দিবে না সেটা সে বেশ ভালো করেই জানে। বাহারের চরিত্রের সাথে সোজাসাপটা উত্তরটা আশা করাও এক ধরণের বোকামি। তাই সে দ্বিতীয় প্রশ্নটা মহিনকেই করলো,

“কী করেছো মহিন?”

ততক্ষণে মহিনেরও হতভম্ব ভাব কেটে গেলো। অবাক কণ্ঠে বললো, “আমি তো কিছুই করি নি।”বাহার পকেটে হাত গুঁজেই হাসলো। ক্ষীণ হাসি। কিন্তু ততক্ষণে মহিনের পরিবার ক্ষেপে গেলো। হৈ হৈ করে ছুটে আসলো মহিনের মা মানে চাঁদনীর শাশুড়ি। আঙুল উঁচিয়ে বাহারের দিকে তাঁক করে দাঁত কিড়মিড় করে বললো,

“এই ছেলে, এই, তোমার সাহস কীভাবে হলো আমার ছেলের গায়ে হাত তোলার?”

“কিছুই তো করলাম না আন্টি। সাহসের কী দেখলেন এখনো?”

মহিলার দাঁত কিড়মিড় করা প্রশ্নের জবাবে এমন উত্তর যেন অনাকাঙ্খিত ছিলো। দূর হতে চিত্রার ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। এখানে তার বাবা উপস্থিত না থাকলে হয়তো

এতটা ভয় তাকে কাবু করতে পারতো না। অথচ তার বাবা র*ক্তলাল চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছে। ঘটনা বিগড়াতে যে বেশি সময় লাগবে না তা বুঝতে বেশি সময় লাগলো না চিত্রার।মহিনের মা লতা বেগমের রাগ চক্রবৃদ্ধি আকারে বাড়লো। বেছে বেছে সে চিত্রার বাবা নুরুল সওদাগরের দিকে তাকিয়েই চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ করে বললো,

“ভাই সাহেব, আপনারা হা করে সবটা দেখছেন! বাহিরের একটা উটকো ছেলে আপনাদের সামনে এমন একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেললো অথচ আপনারা নিশ্চুপ? ছেলেটাকে ধমকও দিচ্ছেন না!”

“উনার ধমকের পরোয়া অন্তত বাহার করে না, আন্টি। ভুল জায়গায় ভুল তথ্য প্রেরণ করাটাই বোধহয় মহিলা সমাজের কাজ।”

এবারও বাহারের কণ্ঠ স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক থাকতে পারলেন না নুরুল সওদাগর। খেঁক খেঁক করে বলে উঠলেন,

“এই অ*ভ*দ্র ছেলে, বড়দের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় জানো না? অন্যায় করেছো অথচ নূন্যতম লজ্জাবোধ নেই।”“লজ্জাবোধের ফাংশনটা আমার ঠিক কাজ করে

না। আর ভুল জায়গায় তো আরও আগে কাজ করে না।”

সূর্যের তেজ বাড়লো, সাথে তড়তড় করে বাড়লো নুরুল সওদাগরের রাগ। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলো বাহারের দিকে। বাহারের বুকের বা’পাশটাতে ধাক্কা দিলো শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে। ছেলেটা দু’পা পিছিয়ে গেলো অপ্রত্যাশিত ধাক্কায়। অথচ কোনো প্রতিক্রিয়া

দেখালেন না নুরুল সওদাগরকে। বরং কোনো বাক্যব্যয় ছাড়াই বিরাট আরেকটা চ*ড় বসালো মহিনের গালে। পরিস্থিতি আরেক ধাপ হতভম্ব হলো। সবাই কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। নুরুল আলমও কম হতভম্ব বোধহয় হলো না। বাহার যেন অদৃশ্য ভাবে চড়টা তাকেই দিলো। নুরুল আলমের মতন শক্ত, কঠোর পুরুষ

ভাষা হারালেন। নিজের বড় ভাইয়ের দিকে তাকালেন হতভম্ব চোখে। কোনো মতে উচ্চারণ করলেন,“বড়ভাই, আপনি দেখলেন তো!”

ছাঁদের কার্নিশ ঘেষে অনবরত কাক শোরগোল তুললো। পরিবেশ যেন প্রয়োজনের তুলনাও শীতল। চিত্রার বড় চাচা গলা পরিষ্কার করে যখন বাহারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা

চালালেন বাহার সবাইকে অবাক করে দিয়ে তৃতীয় তথাপি শেষ চড়টা মারলো মহিনের ডান গালে। এবং সবাইকে অবাকের চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে হেলতে দুলতে চলে গেলো বাড়ির মেইন গেইট পেরিয়ে। সবাই কেবল তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। বর্তমানে এই

তাকিয়ে থাকাটাই যেন উত্তম কাজ হয়ে দাঁড়ালো সবার কাছে।

লতা বেগম তার পাশের চেয়ারটাই ধপ করে বসে পড়লেন। এতক্ষণের ঘটা কর্মকাণ্ড যেন সবারই নেহাৎ ভ্রম মনে হলো। বাহার যখন গেইট পেরিয়ে অদৃশ্য হলো উচ্চকণ্ঠ শোনা গেলো নুরুল সওদাগরের। ভয়াবহ রকমের চিল্লিয়ে বললেন,“এই বে*য়াদব ছেলেটা যেন এ বাড়িতে

আর পা না রাখে। বিনা কারণে একটা ছেলেকে এত গুলো চড় মারলো অথচ তার ভয়, আফসোস কিছুই নেই? বড়ভাই, এটার বিহিত আপনাকেই করতে হবে।”

“বাবা, বাহার ভাই অকারণে কিছুই করেন না আমরা সবাই ই জানি। নিশ্চয় আমাদের অজান্তে কিছু হয়েছে।”

তুহিনের কথা থামলো তার কথার পৃষ্ঠে উত্তর দিলো চাঁদনীর স্বামী। লোকটা নিপাট ভদ্রলোক। খুব সহজে রেগে যান না, ভীষণ ঠান্ডা মানুষ। ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে চলে গিয়ে জীবনে সুখী মানুষ সে। কিন্তু আজকের অনাকাঙ্খিত ঘটনার পর লোকটাও চুপ থাকতে পারলো না। বিষ্ময় নিয়ে বললেন,“তুহিন তোমার কথা-ই নাহয় মানলাম। এত গুলো

চড় তো আর এমনি এমনি দেয় নি, নিশ্চয় কারণ আছে। বাহার ভাই এর উচিৎ ছিলো না সে কারণ গুলো বলার? এত গুলো মানুষকে এক সমুদ্র প্রশ্নের নিচে ফেলে দেওয়া টা উনার মতন বুদ্ধিমান লোকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। সব জায়গায় গা ছাড়া ভাবটা আদৌও মানানসই?”

অবস্থা বেগতিক। কথার পৃষ্ঠে শুরু হলো কথার ঘাত-প্রতিঘাত। অথচ

যাকে নিয়ে এত কিছু সে নির্জীব ভকবে প্রস্থান করেছে। বাহার ভাইয়ের কাজটা বড্ড চোখে বাজলেও বাড়ির বেশিরভাগ মানুষই তার পক্ষেই কথা বলছে। কথা কাটাকাটি যখন বাজে পর্যায়ে তখন চিত্রার মনে হলো বাহারের পক্ষ থেকে একটা কারণ উল্লেখ্য করতে হবে যেন চড়টা যুক্তিযুক্ত হয়। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ করার আগেই

বাড়ির সবচেয়ে গম্ভীর, ঠান্ডা অহি কথা বলে উঠলো। খুব ক্ষীণ স্বরে বললো,“বাহার ভাই আমার পক্ষ থেকে চড়টা মেরেছেন। উনার দোষ নেই।”

অবাকের উপর অবাক হচ্ছে পরিবারের বড় সদস্যরা। ছোটোরাও সেই তালিকার বাহিরে না। অহির মা ছুটে এলেন মেয়ের দিকে। ধমকে বললেন,

“কি বলছিস, অহি! আজেবাজে কথা বলবি না একদম।”

মায়ের ধমকে ভয়ে অহির মুখটা এতটুকু হলো। তখন মেয়েটার ভরসার হাত হয়ে এলো চিত্রার মা। এই ভদ্রমহিলা প্রচুর বুদ্ধিমতী। অহির কথার ইঙ্গিত বুঝতে তার এক সেকেন্ডও ব্যয় হলো না। তাই নিজের ছোটো জা কে চোখের

ইশারায় চুপ করিয়ে অহিকে আদুরে স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,

“আচ্ছা অহি, বলো তো মহিন ঠিক কী করেছে তোমার সাথে? অসভ্যতামো করেছে কি!”

অহি উপর-নীচ মাথা নাড়ালো। যার অর্থ “হ্যাঁ”। চোখের গোল গোল গ্লাসের চশমাটা ঠেলে চোখের সাথে আঁটসাঁট করে দিয়ে নত মুখে বললো,“মহিন আমার স্পর্শকাতর

জায়গায় বাজে ভাবে ছুঁয়েছে। সেটাই হয়তো বাহার ভাই দেখে ফেলছে, আমি তো লজ্জায় প্রতিবাদ করতে পারতাম না, ভাগ্যিস উনি করে দিয়েছে।”

সবার দৃষ্টি এবার মহিনের দিকে পড়লো। মহিন অবাক চোখেই তাকিয়ে রইলো অহির দিকে। তুহিন এসে এলোপাথাড়ি কতগুলো আঘাত করলো তার শরীরে। ঘৃণায়

প্রত্যেকের শরীর রি রি করে উঠলো। অহি স্বভাবসুলভ বেশ ঠান্ডা মেয়ে। এই মেয়ে যে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবে না সেটা সবারই জানা।

লতা বেগম নিজের ছেলের বেহাল অবস্থা মানতে না পেরে ছেলের সামনে সুরক্ষার দেয়াল হয়ে দাঁড়ালেন। ছেলেকে নিজের পিছে আড়াল করে হাত জোর করে বললেন,“আমার ছেলেকে আর

মেরো না, বাবা। অনেক তো মেরেছো। ও ক্ষমা চাইবে অহির কাছে। এবার মতন ছেড়ে দেও। আমি ওর আচরণে লজ্জিত। ভাবতে পারি নি আমার ছেলে এমন হবে। ক্ষমা করো বাবা।”

তুহিনের রাগ তখন আকাশ সমান। নিজের বাড়ির মেয়েদের সে যথেষ্ট সামলে রাখে, অথচ এই আত্মীয় নামক জা*নোয়ারটা নাকি বাজে

আচরণ করে বেঁচে যাবে, কখনোই না।

তুহিন তার বাবার উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়লো,“বাবা, এবার আপনি কিছু বলবেন না? এতক্ষণ তো অনেক কথা বলছিলেন। ওরে এবার জেলে দেন। এত বড় সাহস ওর। হ্যারাসমেন্টের দায়ে জেলের ঘানি টানবে ও। ব্যবস্থা করুন।”

উৎসবমুখর পরিবেশটা হুট করে ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। চেরিকে আকড়ে ধরে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রা। সওদাগর বাড়ির সকল সদস্যই বেশ চতুর। আত্মীয়দের মাঝে এমন বিশ্রী ঘটনা ঘটলে তাদের বড় মেয়ের সংসারেও যে আঁচ আসতে পারে সেটা তাদের ঢের জানা। পাড়া প্রতিবেশী তন্মধ্যেই ছিঃ ছিঃ শুরু করলো। তিলকে তাল

বানালো। অহির চরিত্রে কিঞ্চিৎ কালি ছোড়াছুড়ি হয়ে গেলো।

বাড়ির সবচেয়ে বড় সদস্য আফজাল সওদাগর নিজের মুখ খুললেন। গম্ভীর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“যা হয়েছে তা শেষ। মহিনকে তো যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বাকিটা আমরা পারিবারিক ভাবে মিটিয়ে নিবো। এ নিয়ে আশাকরি আর কোনো কথা হবে না। আমাদের

মেয়ে এখানে নেহাৎ ই ভুক্তভোগী, ওরে নিয়ে আর কোনো সমালোচন আর কেউ করবেন না আশা রাখি।”শেষের কথা টা যে পাড়া প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে বলা তা বুঝতে বাকি রইলো না কারো। লতা বেগম নিজির র*ক্তা*ক্ত ছেলেকে কোনোভাবে ধরে রেখে ক্ষীণ অথচ কঠোর স্বরে বললো,

“আমি ওরে নিয়ে এখনই চলে যাচ্ছি। চাঁদনীর তো আর কয়েকমাস পরেই ডেলিভারির ডেইট, ও এখানেই থাকুক। আমাদের বংশে বউদের প্রথম সন্তান তার বাবার বাড়িতেই হয়। জুনায়েদ, তুই কি যাবি আমাদের সাথে?”

শেষের প্রশ্নটা তিনি নিজের বড় ছেলের উদ্দেশ্যে করলেন। জুনায়েদ লোকটা ভদ্রলোক, সহজ সরল

হলেও ভীষণ বাস্তববাদী। তাই নিজের মায়ের প্রস্তাবকে অকপটে না করে বললো,

“আমার তো কথা ছিলো সময়ে, অ-সময়ে চাঁদনীর পাশে থাকার। তাই এসময়েও ওর পাশেই থাকতে হচ্ছে। তোমরা যাও মা।”লতা বেগম বড় ছেলের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন। মহিলার ভাব এমন যে এ পৃথিবীতে তার ছোটো ছেলের

মতন শুদ্ধ পুরুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই ছোটো ছেলে যাই করবে তা হাসিমুখে মেনে নেওয়া টা উচিৎ কাজ। যেহেতু চাঁদনীর পরিবার মেনে নেই নি তাই বংশের নতুন নিয়ম বের করে শাস্তিস্বরূপ চাঁদনীকে ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে ও বাড়িতে নিবেন না তা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। কেউ কোনো রকম প্রতিক্রিয়া জানালেন না। সবার ভাব এমন যে,

লতা বেগমের বংশের নিয়মটা তারা নির্দ্বিধায় পালন করবেন।

যখন বড়দের কথোপকথন চললো মহিন ধীর কণ্ঠে বললো,

“আপনাকে তো আমি ছুঁই নি অহি, তবে এবার নিশ্চয় ছুঁয়ে দিবো। এমন ভাবে ছুঁবো যেন নিজেকে দেখে নিজে লজ্জা পান।”অহি নিরুত্তর রইলো। ভাব এমন, সে কথাখানা শুনে-ই নি।

মহিন আর তার মা চলে যেতেই আরেক দফা ক্ষমা চাইলো জুনায়েদ। ভাইয়ের কর্মকান্ডে যে সে লজ্জিত সেটা তার আচরণেই প্রকাশ পেলো। সবটুকু ঘটনায় চাঁদনী ভড়কে গেছে। সংসারটা ভাঙতে বসলো ভেবেই ভয়ে কাঁপলো তার মন। বাঙালি নারীদের কাছে তো আবার সংসারই সব। ধ্যান, জ্ঞান, বেঁচে থাকা।দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গড়িয়ে

সন্ধ্যা। বাড়ির পরিবেশ ক্ষানিকটা থমথমে। যে যার মতন নিজেদের ঘরে আছেন। অন্যান্য দিনের মতন হৈ চৈ নেই, হাসি-তামাশা নেই।

আকাশ যখন কমলা রঙ ছেড়ে কালো রঙে নিমজ্জিত হলো ছাঁদ থেকে ভেসে এলো তখন গিটারের টুংটাং শব্দ। চিত্রার বয়ঃসন্ধি মনের মন খারাপের আবেশটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো হুট করেই। গিটার

তো বাহার ভাই মাঝ রাতে বাজান, তাও মাঝে মাঝে। আজ এমন একটা দিনে এসময়ে গিটার বাজাচ্ছেন যে! পরক্ষণেই মনে পড়লো আজ বাবা বাড়িতে। আর বাবাকে বিরক্ত করা বাহার ভাইয়ের সবচেয়ে পছন্দের কাজ। আনমনেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

বাহার ভাই তাদের বাড়িতে এসেছে আজ একবছর হতে চললো। কোনো

আত্মীয়তা নেই লোকটার সাথে। কেবল আর কেবল মাত্র দিহান আর তৃষাণের শিক্ষক হয়েই এ বাড়িতে খুঁটি গেড়েছেন সে।গতবছর যখন দিহান আর তৃষাণ ভাইয়ার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে তখন কূলকিনারা খুঁজে ভালো শিক্ষকের সন্ধান চললো। অতঃপর একদিন হুট করেই বড় চাচা বাহার ভাইকে নিয়ে এলেন। কঠোর, গা ছাড়া

ভাবের এই বাহার ভাইয়ের কড়া শাসন আর পরিশ্রমে দু’জনই দারুণ রেজাল্ট করলো। বাহার ভাই বর্তমানে ইংলিশে মাস্টার্স পড়ছেন পাবলিক ভার্সিটিতে। ছাত্র হিসেবে ভীষণ মেধাবী হওয়ায় সে এ বাড়ির সকলের মন পেয়ে যায়। অবশ্য অনেকটা গা ছাড়া ভাব আছে বিধায় চিত্রা আর তার বাবা বাহারকে পছন্দ করে না। চিত্রাদের পরিবারের

সবচেয়ে বড় সন্তান হলো তুহিন, সে সবার বড়। বড় চাচার তখন সন্তান ছিলো না। কিন্তু তুহিন ভাইজান হওয়ার পর বড় চাচার ঘর আলো করে চাঁদনী আপা এলো তারপর ছোট চাচার ঘরে এলো অহি আপা, তারপর দিহান আর তৃষাণ ভাই যমজ হলো বড় চাচীর ঘরে। অতঃপর চিত্রা এবং তারপর সবার ছোটো আদরের চেরি। বর্তমানে

তৃষাণ ভাই আর দিহান ভাইকে পড়াশোনায় সাহায্য করার পাশাপাশি চেরি আর অনয়কেও পড়ান বাহার ভাই। এলাকায় মোটামুটি বাহার ভাইয়ের একটা পরিচিতি আছে, কারণ সে সবাইকে বেশ সাহায্য করেন।নানান রকম কথা ভাবতে ভাবতে ছাঁদের দিকে পা বাড়ালো চিত্রা। বাহার ভাই তো আজ দুপুরে খায় নি, এখন খাবেন কিনা জিজ্ঞেস

করতেই ছাঁদের দিকে পা বাড়ালো। ছাঁদের চিলেকোঠার ঘরেই বাহার ভাই থাকেন। থাকার খরচ না দিলেও খাবার খরচ বাহার ভাই দেন। তার এক কথা, অন্যের থালে খেয়ে খোঁটা কামাতে পারবেন না।

ছাঁদের দরজার সামনে আসতেই অস্বচ্ছ গিটারের শব্দটা তুমুল হলো। বাহার ভাইয়ের গলা ছেড়ে গানের শব্দ এলো,

“রক্তের সাথে মানুষ গুলি করে বেইমানি,
স্বার্থের কারণে মানুষ হয়, হারামি,,
আবার চলার পথে সুখ দুঃখে, পর আপন হয়,
আমি শুধু আমার আপন কথা মিথ্যে নয়।”চিত্রা মনযোগ দিয়ে তাকালো মানুষটার দিকে। হাঁটু অব্দি প্যান্ট পড়া, ফুটপাতের খুব সস্তার একটা ছাই রাঙা পাতলা টি-শার্ট গায়ে, চুল

গুলো এলোমেলো সাথে সিক্ত, বোধহয় গোসল করেছে। মানুষটার বেলা – অবেলায় উদ্ভট কাজ করার শখ।

তন্মধ্যেই গান থামিয়ে সিগারেট ধরালো বাহার। পরিবেশ তখন নিশ্চুপ প্রায়। এর মাঝেই ধপধপ পা ফেলে কে যেন ছাঁদের দিকে আসছে মনে হতেই দরজার আড়ালে লুকালো চিত্রা। ভেবেছিলো মা-চাচীর

মধ্যে কেউ এসেছে কিন্তু চিত্রাকে অবাক করে দিয়ে অহি হাজির হলো। হাতে তার ঢেকে রাখা থালা। চিত্রা ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে রইলো। অহি আপা কিনা খাবার এনেছে! এক গ্লাস পানি খায় না যে, সে নাকি আজকাল বাহারের জন্য খাবার আনছে!

অহি চুল গুলো দুলাতে দুলাতে ছাঁদে পা রাখতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো

চিত্রা। অতঃপর বাহারের মতন করে আনমনেই বললো,“শুনো মেয়ে,
বাহার ছুঁয়ে দিলে পরে, অকালেই যাবে ঝরে,
গলে যাবে যে বরফ গলে না।”
চিত্রার গান থামতেই ছাঁদ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো। পরক্ষণেই বাহারের কণ্ঠ ভেসে এলো,
“চিন্তা নেই মেয়ে,

কারো একদিন হবো, কারো এক রাত হবো,
এর বেশি রুচি কারো হবে না।”
চিত্রার চোখ অবাকে বড় বড় হয়ে গেলো। তার গান কি তবে বাহার ভাই শুনে ফেললো!বাহারের হুট করে অদ্ভুত গানের কারণে হা হয়ে রইলো অহি। বিস্মিত কণ্ঠে বললো, “আপনি কাকে মিন করে গানটা গাইলেন!”

বাহার আঁধারে ঢাকা সিঁড়ির দিকে একবার পলক ঝাপ্টা দিয়ে তাকালো, অতঃপর কিছু হয় নি এমন ভাব করে আকাশের পানে তাকিয়ে রইলো। অহি জানে বাহার এত সহজে উত্তর দেওয়ার পাত্র নয়। তাকে প্রশ্ন করাটা নেহাৎই বোকামি। আর অহির মতন চালাক মেয়ের বোকামি করা সাজে না।

গলা পরিষ্কার করে কথা ঘুরানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে অহি বললো,

“আপনার জন্য খাবার এনেছিলাম। সারাদিন তো না খাওয়া আপনি।”

অহির কথা থামতে দেরি অথচ বাহারের পিছে ঘুরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে দেরি নেই। যেন বিদ্যুৎ এর বেগে পিছে তাকিয়েছে এক সেকেন্ড ব্যয় না করে। বাহারের দৃষ্টি অহিকে ক্ষানিকটা ভড়কে দিলো। মেয়েটা

বোকা বোকা একটা হাসি দিয়ে আমতা-আমতা করে বললো,“আমি না, মেঝো মা পাঠিয়েছে।”

বাহার অহিকে পা থেকে মাথা অব্দি একবার পরখ করলো। অতঃপর ঠোঁটের ভাজে থাকা সিগারেটার মাঝে দু’টো টান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে দিলো আকাশে। খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“মিথ্যে কেন বলেছিলে? তোমাকে তো মহিন কিছু করে নি।”

অহির স্থির হাত দুটো কেঁপে উঠলো। সেই কাঁপা হাতেই খাবের প্লেট টা ধরে রেখে আছে বহু কষ্টে। বাহার কাঁপা হাতের দিকে দৃষ্টি দিলো অতঃপর কণ্ঠ সামান্য উঁচু করে আঁধারে নিমজ্জিত সিঁড়ির পানে তাকিয়ে হাঁক ছাড়লো,

“এই মেয়ে, এখানে আসো তো একটু।”

চিত্রা এতক্ষণ সবকিছুই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলো। আকস্মিক ডাকে সে ভীত হলো। ধরা পরে যাওয়ার লজ্জাও পেলো। তবুও সে জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়লো না।

বাহার অধৈর্য হলো। বিরক্তও হলো কিঞ্চিৎ। সম্পূর্ণ ঘটনায় বোকা বনে

রইলো অহি। অবাক কণ্ঠে বললো,“ওখানে কেউ নেই তো।”
বাহার অহির কথায় তেমন পাত্তা দিলো বলে মনে হলো না। কণ্ঠের জোর বাড়ালো, বিরক্তের সহিত অধৈর্য্য কণ্ঠে বললো,
“রঙ্গন ফুল কানে গুঁজে রাখা রঙ্গনা, তোমাকেই বলছি, এখানে আসো।”
চিত্রা এবার সিউর হলো বাহার তাকেই ডাকছে। ইশ্ এমন লুকিয়ে

কথা শুনতে গিয়ে ধরা পরে যাওয়ার মতন লজ্জা যেন আর হয় না। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লজ্জার পাল্লা বাড়বে বৈ যে কমবে না তা চিত্রার বেশ জানা আছে। তাই ধীর পায়ে দরজা পেরিয়ে অহিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

অহি অবাক হলো চিত্রাকে দেখে। সে যে এখানে মোটেও চিত্রাকে আশা করে নি, সেই কথা ছড়িয়ে

গেলো তার মুখ-চোখ জুড়ে। ফ্যাল ফ্যাল নয়নে চিত্রার পানে তাকিয়ে আকাশ সমান বিষ্ময় নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লো,“তুই এখানে!”

লজ্জায় চঞ্চল চিত্রা ক্ষানিকটা নেতিয়ে গেলো। মুখটা ছাঁদের খড়খড়ে ছাই রাঙা উঁচু নিচু ফ্লোরে নিবদ্ধ করে ধীর কণ্ঠে বললো,

“আমি, আমি তো বাহার ভাইয়ের কাছে এসেছিলাম। সে খাবে কিনা

জিজ্ঞেস করতে। ছোট চাচীই তো পাঠালো।”

অহি ভ্রু কুঁচকে কেমন দৃষ্টিতে যেন কতক্ষণ তাকালো চিত্রার দিকে অতঃপর ঘাড় অব্দি চুল গুলো বাতাসে উড়িয়ে গা ছাড়া ভাবে বললো,

“অথচ আম্মু বিকেলে চাঁদনী আপাকে নিয়ে চ্যাকআপ করাতে

গেছে। আমি যতটুকু জানি সে এখনো ফিরে নি। তাহলে!”

একে তো লুকিয়ে এসে ধরে পড়ে গিয়েছে তার উপর মিথ্যেটাও যুক্তিহীন হয়ে যাওয়ায় লজ্জায় মাথা নত করতে করতে চিবুক ঠেকলো গলদেশে। অহি হাসলো, প্রায় খোঁচা মেরেই বললো,“সব ধরণের খারাপ অভ্যাস তোর আয়ত্তে ছিলো, এখন

কি আড়ি পেতে কথা শোনার অভ্যাসটাও রপ্ত করতে চাচ্ছিস!”

সবটা সহ্য করতে পারলেও অহি আপার খোঁচাটা সহ্য করতে পারলো না চিত্রা। চোখ টইটুম্বুর হয়ে দেখা দিলো অশ্রুর স্রোত। ঠোঁট কাঁপিয়ে কিছু বলার আগেই বাহারের রাশভারী কণ্ঠ ভেসে এলো,

“ঝগড়া করার হলে তোমরা নিচে গিয়ে ঝগড়া করতে পারো। বিনা

কারণে একমাত্র মহিলা জাতিই বোধহয় এত কথা খরচ করতে পারে।”

কথা কাটাকাটি থেমে গেলো। চুপ হলো প্রকৃতি। চিত্রা নাক টেনে গিলে ফেললো কান্না। বাহার এবার চিত্রার দিকে তাকালো, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো,“চেরির মতন বাচ্চা মেয়ের সাথে খারাপ ঘটনা ঘটেছে, অথচ

তুমি সেটা জেনেও কীভাবে হজম করলে! অদ্ভুত!”

চিত্রা থতমত খেয়ে গেলো। বাহার ভাই অব্দি কথা কীভাবে এলো? তাহলে কি চেরিই বলেছে? চেরি না বললে অহি আপাও বা জানলো কীভাবে? সবটা তাহলে চেরির কাজ! ভাবনার মাঝেই বাহারের ছোটোখাটো একটা রামধমক ভেসে এলো,

“কেনো বলো নি চেরির ঘটনাটা?”

আকষ্মিক ধমকে দু’বোনই কেঁপে উঠলো। চিত্রার আকাশ-পাতাল উজাড় করে মন খারাপ হলেও সে প্রকাশ করলো না বরং মাথা নত করেই বললো,

“আমি ভেবেছিলাম পরে আলাদা করে বলবো। এতটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে যদি এসবের স্বীকর হয় তাহলে মেয়েটার কত খারাপ সময়

যায়! আর যদি সে সময়ে সমাজের মানুষ তিলকে তালায় বানায় তাহলে বাচ্চাটার উপর দিয়ে কি যাবে ভেবেছেন? এ জন্য ই আমি বলি নি।”এবার বাহার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছুঁড়লো অহির উদ্দেশ্যে,

“তুমি কোনো মিথ্যে বলেছো? নিশ্চয় চিত্রার বলা কারণ টার জন্য, তাই না?”

অহি মাথা উপর-নীচ করে সম্মতি প্রদান করলো। বাহার তপ্ত একটা শ্বাস ফেলে ঘুরে ছাঁদের কার্নিশ ঘেষে দাঁড়ালো। অথচ বয়ঃসন্ধির চিত্রা তখন মনের ভিতর অবাকের সাম্রাজ্য নিয়ে অথৈজলে প্রায় ডুবন্ত অবস্থায়। বাহার ভাই আর অহি আপা অব্দি খবরটা কীভাবে গেলো না জানা অব্দি যেন মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

মনের এই তুমুল উত্তেজনা নিয়েই আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন তুললো চিত্রা,

“আপনারা সবটা জানলেন কীভাবে, বাহার ভাই?”

বাহার উত্তর দেয় না। মনের সুখে গিটারে টুংটাং সুর তোলে। লোকটা যেন সব কিছুই নিজের মন মর্জি মতন চালাবে। তার যখন বলতে ইচ্ছে হবে বলবে, শুনতে ইচ্ছে হলে শুনবে কিন্তু কারো কথায় তার

নিয়মের কিঞ্চিৎ অবহেলাও করে না।

অহি কতক্ষণ চিত্রার উৎকণ্ঠা মাখানো মুখের উপর চোখ বুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ ফুলিয়ে বললো,“তুই চলে আসার পর চেরি আমার সাথে ভয়ে সেঁটে ছিলো। প্রাণোচ্ছল মেয়েটার এমন কান্ড দেখে অনেক অবাক হই। তারপর এক কিনারে নিয়ে বাচ্চাটাকে জোর

করে জিজ্ঞেস করতেই সব অকপটে বলে দেয়। বাহার ভাই হয়তো শুনেছিলেন সবটা। তাই মে*রেছেন। কিন্তু সবার সামনে চেরির কথা বললে সবাই হালকা ভাবেও নিতো হয়তো, বা অন্যান্য দিক বিবেচনা করেই আমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছি সবটা।”চিত্রা মনযোগ দিয়ে সবটা শুনলো। অহি আপার প্রতি ভালোলাগা টা আরেকটু বেড়ে

গেলো। অহি আপার সাথে তার গলায় গলায় ভাব ছিলো না কখনোই। কারণ আপা বেশি গম্ভীর। আর খুঁতখুঁতে স্বভাবের হওয়ায় চিত্রার চঞ্চলতা তত পছন্দ করেন না। অহি আপাকে আদর্শ নারীর খাতায় রাখা যাবে নির্দ্বিধায়। নারী সত্তার সকল গুণ তার মাঝে অবস্থিত।

নিরবতার জাল ভেঙে নিচ থেকে চিত্রার মায়ের গলার স্বর ভেসে এলো। সে চিত্রাকে বেশ ব্যাতিব্যস্ত কণ্ঠে ডাকছে। চিত্রা আর অপেক্ষা করলো না, ধপাধপ পা ফেলে ছুটে গেলো নিচে। অহি গম্ভীর কণ্ঠে সবধান বাণী দিলো, “আস্তে যাবি, অন্ধকার এখানটায়। পড়ে যাস না যেন।”চিত্রার মুখের হাসি প্রশস্ত হলো। একটু আগে অহি আপার

খোঁচা দেওয়া কথাটা যতটা ব্যাথা দিয়েছিলো এখন সাবধানী কণ্ঠটা ততটাই প্রশান্তি দিলো।

চিত্রা চলে যেতেই অহি তার হাতের খাবের প্লেট টা বাহারের চিলেকোঠায় নিয়ে গিয়ে রাখলো নিঃশব্দে। আবার শব্দহীন পায়ে বাহারের পিছে এসে দাঁড়ালো। বাহার ঘুরলো না অহির দিকে। আগের স্থানেই দাঁড়িয়ে থেকে ফিচলে কণ্ঠে বললো,“কিছু বলবে?”

“আপনি আগাগোড়া পুরোটাই নকল মানুষ, তাই না?”

অসময়ে অহির এমন অদ্ভুত কথা শুনেও চমকালো না বাহার। এমন কি কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখালো না। বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো,

“আচ্ছা! নকল মানুষ? তা নকল হলেও বা কী? তোমার কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না?”

“আপনি জ্বলন্ত নে*শা বাহার ভাই। যে নে*শা হয়তো আমার আর চিত্রার শরীরে ভয়ঙ্কর বেগে ছুটছে। চিত্রা টিনএজার, আবেগের বয়স ওর। দুনিয়া রঙিন ওর। কিন্তু আমি, আমার মতন মেয়েকেও আপনি ঠিক থাকতে দিচ্ছেন, বাহার ভাই। আপনি জলজ্যান্ত বি*ষ, যা চিত্রা না বুঝে গ্রহণ করছে আর আমি বুঝে।”

অহির শেষ দিকে কণ্ঠটা কেমন উত্তেজিত লাগলো। হয়তো এত গম্ভীর আলোচনা করতে গিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরের সবটুকু রক্তকণিকায়।

বাহারের ভাব এমন যে অহির কথা গুলো নিত্যান্তই স্বাভাবিক। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কথা থামিয়ে অহি কতক্ষণ জিরিয়ে নিলো। অতঃপর বাহারের দিকে

কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরস মুখে হাসি দিয়ে বললো,“আমি জেনেশুনে বি*ষ, করিয়াছি পান।”

এক সেকেন্ডও আর দাঁড়ালো না অহি। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছাঁদ ছেড়ে দিলো সে। তার মতন অত লাজুক, ঠান্ডা মেয়ে এমন কথা বলতে পারে ভাবতেই লজ্জায় তার শরীর হিম হয়ে আসছে। বাহারের সামনে থাকলে আর মুখ দেখাতেই পারবে

না। তাই লজ্জা লুকাতেই চলে যাওয়া।

বাহারের দ্বিতীয় সিগারেট টাও শেষ হলো। আড়মোড়া ভেঙে সে অলস ভঙ্গিতে দেহটা টেনে নিয়ে গেলো নিজের ঘরটাতে। ঘরের কৃত্রিম আলোটা বন্ধ করে মাথার নিচে দু'হাত গুঁজে শুয়ে পড়লো। থালার ভাত, গ্লাস ভর্তি পানি স্থির ভাবে আগের জায়গাতেই পরে রইলো।

বাহার ছুঁয়েও দেখলো না বরং গলা ছেড়ে গাইলো,

“শত রাত জাগা হবে,

থালে ভাত জমা রবে

খাওয়া-দাওয়া কিছু মজা হবে না।”চিত্রা সিঁড়ি বেয়ে ছাঁদ থেকে নামতেই তার বাবার মুখোমুখি হলো। মা বোধহয় এ জন্য ই এত ডাকছিলেন। বাবার সামনে এসেই চঞ্চল পা জোড়া থেমে গেলো

চিত্রার। মাথাটাও নিচু করে দৃষ্টি নামালো।

নুরুল সওদাগর মুখ চোখ কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন। অতঃপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

“রাত-বিরেতে ওর দস্যিপনা বন্ধ করলেই আমি খুশি হবো।”

চিত্রার মা মুনিয়া বেগম মেয়ের দিকে তাকালেন। অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,

“এখনই তো একটু দস্যিপনা করবে। যে বয়সে যেটা মানানসই, সেটা করবে না? অদ্ভুত কথা বলো।”

স্ত্রীর কথা বিশেষ পছন্দ হলো না নুরুল সওদাগরের। বিশাল এক ধমক দিয়ে বললেন,

“অতি উড়লে ঝরতে সময় লাগবে না। সামলাও।”অপমানে চিত্রার মুখ লাল হয়ে গেলো। রাগে-ক্ষোভে

চোখে জল এলো। কান্নাটা আটকে দিয়ে বললো,

“একদিন আমার ঝরে যাওয়ার কারণ নিশ্চয় আপনি হবেন, আব্বু। আমি দেখতে পারছি আমার ভবিষ্যৎ।”

এই প্রথম, এই প্রথম বোধহয় চিত্রা বাবার মুখের উপর কথা বললো। ব্যাপার টা ভীষণ অপ্রত্যাশিত ছিলো। রান্নাঘর থেকে চিত্রার বড় চাচী অব্দি

হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তৃষাণ আর দিশান সোফায় বসা ছিলো। চিত্রার কথায় তারাও আহাম্মক হয়ে গেলো।

চিত্রা আর দাঁড়ালো না, এক ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলো। বাবার মুখের উপর যে সে এমন একটা কথা বলতে পারবে কখনো ভাবে নি। সবটাই যেন বাহার ভাইয়ের ছোঁয়াচে রোগ। লোকটার গা ছাড়া

ভাব দেখতে দেখতে নিজের মাঝেও কেমন সে ভাব চলে এসেছে। বাহার ভাই জলজ্যান্ত রোগ। যা ছড়িয়ে পড়ছে মস্তিষ্ক জুড়ে।উত্তপ্ত দুপুরে শরীর পুড়ে যাওয়ার যোগাড়। আজ চিত্রার মেজাজটাও বেশ চটে আছে। কলেজ থেকে বের হতেই তার ক্লাসমেট রিফাত তাকে পত্র দিয়েছে। তাও যে সে পত্র না, একশ বানান ভুল পত্র। পত্র পেয়ে যতটা

না উৎফুল্ল হয়েছে ততটাই বানান দেখে রেগে গিয়েছে। প্রেমপত্র না যেন ক্লাসের সবচেয়ে গ*র্দ*ভ ছাত্রের পরীক্ষার খাতা। চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে রিফাতের মুখেই ছুঁড়ে ফেলে এসেছে সে।

রাস্তা পাড় হতেই অহি আপার সাথে দেখা চিত্রার। অহি আপা চেরিকে স্কুল থেকে নিতে এসেছে। চিত্রার কলেজ আর চেরির স্কুল প্রায়

কাছাকাছি। পরিচিত মুখ দেখতেই চিত্রার মন নেচে উঠলো। ছুটে গেলো অহি আপার কাছে। চেরিও বেশ খুশি হয়েছে চিত্রা আপাকে দেখে। চিত্রা আপার সাথে তার আবার বেশ ভাব।

স্কুল কলেজের গলি ছাড়িয়ে নিজেদের এলাকায় ঢুকতেই বাহার ভাইকে চোখে পড়লো চিত্রার। পাড়ার মোড়ের বড় পিলারটার সাথে

দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছে। দুনিয়ায় যেন তার এটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর নেই।

চিত্রা আড় চোখে তাকালো, মিনমিন করে বললো,“বাহার ভাইয়ের কাছে এলেই সব জ্বলে যায়, হোক সেটা নিকোটিন কিংবা হৃদয়।”

নিজের কথায় নিজেই অবাক হলো চিত্রা। অহি আপা শুনে ফেললো না তো! ভয়ে ভয়ে অহি আপার দিকে

তাকালো সে। অহি তখন ফোনে ব্যস্ত। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন চিত্রা। দু একটা রিক্সা চলে যাচ্ছে অদূরে। চিত্রার জুতোর ফিতা টা কিছুটা খুলে যাওয়ায় উপুড় হয়ে বসে ফিতাটা লাগিয়ে নেয় সে। অহি আর চেরি বেশখানিকটা সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাহার সিগারেট শেষ করে হাসিমুখে চেরির কাছে এগিয়ে আসতে নিলেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা

চলন্ত বাইক থেকে কিছু তরল পদার্থ ছুঁড়ে মারলো চিত্রা দের উদ্দেশ্যে। তিন মেয়ের ভয়ানক চিৎকারে ভারী হলো এলাকা। বাহার কেবল হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলো।নিরব রাস্তা তুমুল চিৎকারে সরব হলো। আশেপাশের মানুষ গুলো আকষ্মিক ঘটনার হতভম্বতা কাটিয়ে ছুটে আসলো মেয়ে গুলোর কাছে। বাহারও থমকে দাঁড়ানো নিশ্চল পা

গুলো কোনোমতে টেনে নিয়ে এসে দাঁড়ালো মাটিতে লুটিয়ে পড়া চেরির পানে। ছোট্টো মেয়েটা কেমন করে যন্ত্রণায় হামাগুড়ি দিচ্ছে! পাশেই চিত্রা তার বা'হাত ধরে লাফাচ্ছে। মেয়েটার বা'হাতটাও বিধ্বস্ত প্রায়। অহি কাকে জড়িয়ে ধরবে ভেবে পেলো না। ছোট্টো চেরি গাল ধরে চিৎকার করে কাঁদছে, চিত্রা নিজের বা'হাত ধরে লাফাচ্ছে, হুট করে

সুন্দর মুহূর্তটা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো! এলাকার মানুষ খবর পাঠালো চিত্রাদের বাড়ি। চিত্রা নিজের জ্ব*লন্ত হাতটা নিয়েই নিচে বসে পড়লো। চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা চেরিকে ডান হাত দিয়ে অনবরত ধাক্কানো শুরু করলো। সাথে তার তুমুল আহাজারি। ছোট্টো চেরি নিবিড়, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলো।চিত্রা কিংবা

চেরি কাউকে ধরলো না অহি। বরং ছুটে গেলো তার থেকে পাঁচ হাত দূরের বিশাল দোকানটার দিকে। তার ছুটে যাওয়াটা যেন এ মুহূর্তে আরেক অপ্রত্যাশিত কাজ। বাহার চেরিকে কোলে তোলে নিলো আর চিত্রার হাত ধরে টেনে তুললো। লোকটা বোধহয় এ প্রথম এতটা হতভম্ব হয়েছে। মুখ দিয়ে কথাও

বের হচ্ছে না। কোনো মতে চিত্রাকে ধমকে বললো,

“উঠো তো, এখানে বসে থাকলে কোনো সমাধান হবে না, উঠো দ্রুত। তুমি না অনেক সাহসী? উঠো। চেরির অবস্থা কিন্তু খারাপ।”চিত্রার বা’হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। তবুও মস্তিষ্ক তার সচল। চেরির কথা সেই সচল মস্তিষ্কের নিউরনে ঝড় তুললো।

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো। ক্রন্দনরত মুখ খানা নিয়ে অসহায়ের মতন প্রশ্ন করলো বাহারকে,

“আমার চেরি ঠিক হয়ে যাবে তো, বাহার ভাই?”

বাহার কেবল ক্রন্দনরত মেয়েটার মুখের দিকে তাকালো। চিত্রাদের বাড়িতে এসেছে পুরো বারোমাস সম্পন্ন হলো কিন্তু এভাবে মেয়েটাকে বোধহয় দেখা হয় নি। কখনো

তাকানোর প্রয়োজনই বোধ করে নি। আজ কিঞ্চিৎ মায়া হচ্ছে মেয়েটার জন্য। নিজেরও পুরোটা হাত ঝলসে গেছে, তবুও মেয়েটার চিন্তা সব ছোটো বোনের জন্য। হয়তো এই আচরণটার জন্য ই এত মায়া লাগছে।তন্মধ্যেই ছুটে এলো অহি। হাতে তার বড় বড় দু'টি পানির বোতল। সে ব্যতিব্যস্ত হাতে

একটা পানির বোতল বাহারের দিকে এগিয়ে দিয়ে কোনো মতে বললো, “বাহার ভাই, চেরির মুখে হসপিটাল না যাওয়া অব্দি পানিটা ঢালতে থাকবেন। আমি চিত্রাকে নিয়ে পরের রিকশায় আসছি। পানি ঢালা থামাবেন না কোনো মতে।”এই মুহুর্তে এসে অহির চিত্রার প্রতি এতটা ভালোবাসায় বাহার মুগ্ধ। মুগ্ধতা কাটিয়ে বাহার পানির

বোতলটা নিয়ে ধপ করে উঠে বসলো রিকশায়। অহি চিত্রাকে সাবধানে টেনে পরের রিকশায় উঠলো। নিজের হাতে থাকা দ্বিতীয় বোতলটার মুখের ঢাকনাটা খুলেই চিত্রার হাতে অনবরত পানি ঢালতে লাগলো। দু'টো রিকশাই গন্তব্য ধরলো হসপিটালের। অহি চিত্রার হাতে পানি ঢালছে আর স্বান্তনার স্বরে বলছে,

“কিছু হবে না তোর, ভয় পাচ্ছিস না তো? এই যে অহি আপা আছি তো তোর সাথে। কোনো ভয় নেই তোর।”

আহ্লাদে আর যন্ত্রণায় চিত্রার কান্নারা আরও শব্দ তুললো। অহি কেবল ব্যাথাতুর চোখে ছলছল তাকিয়ে রইলো। বোন গুলো যে তার প্রাণ। এভাবে সুন্দর ফুল গুলোর মূর্ছে যাওয়া টা যে সে মানতে পারছে না।

হসপিটালের করিডোরে কত মানুষের আনাগোনা! সরকারি হসপিটালে তুলনামূলক ভাবে ভিড়টা একটু বেশিই থাকে। হৈ চৈ, ভিড়ে পরিপূর্ণ করিডোরে একটা আতঙ্কিত পরিবার দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভিতর তাদের ঝড়ের তীব্রতায় হাহাকার করে উঠছে। একেকটা মানুষ যেন পাথর হওয়ার উপক্রম। চেরির মা কাঁদতে কাঁদতে দিশাহারা

প্রায়, বড় চাচীও কাঁদছে। কেবল কাঁদছেন না চিত্রার মা। মুখ-চোখ তার শক্ত, কঠিন। মা জাতির মুখ-চোখ এতটা কঠিন সচারাচর হয় না তবে এই ভদ্রমহিলার হয়েছে। বরাবরই সে একটু শক্ত প্রজাতির মানুষ। খুব সহজে সে নেতিয়ে যান না। নারীজাতি স্বভাবসুলভ কোমল হয় কিন্তু চিত্রার মা ঠিক উল্টো। সে বার বার ধমকে ধমকে ছোটো

জা’কে চুপ থাকতে বলছেন। এমন করলে যে অসুস্থ হয়ে যাবে।

তৃষাণ আর দিহান ও কাঁদছে। বোনদের তারা খুব বেশিই ভালোবাসে। তুহিন ছোট ভাইদের স্বান্তনার স্থল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঔষুধের জন্য যে তুমুল ছোটাছুটি হচ্ছে সেটা করছে বাহার। চেরির বাবা প্রবাসী, তিনি বছরের এক-দু’বার ছুটিতে আসেন। উনাকে

এখনো কিছু জানানো হয় নি। চিত্রার বাবা ডিউটিতে ছিলেন, তাকে জানানো হয়েছে সে আসছেন। আফজাল সওদাগর শহরের বাহিরে গিয়েছিলেন ব্যবসায়িক কাজে। আর তুহিন যেহেতু সবাইকে ভরসা দিচ্ছে তাই এই ঔষুধের দায়িত্ব টা পড়লো বাহারের কাঁধে। বাহার কোনো রূপ অবহেলা না করে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

চেরিকে আর চিত্রাকে আলাদা আলাদা থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে। ওদের অবস্থা ভীষণ গুরুতর। তবে অহিকে সিফট করা হয়েছে একটা কেবিনে কারণ ভয়ানক এই পানীয়ের কিঞ্চিৎ ছিঁটে অহির ডান হাতের কিছু কিছু জায়গায় পড়েছে। তখন বোনদের জন্য অনুভব ততটা না করলেও হসপিটালে আসার পর জ্বলে যাচ্ছিলো। অতঃপর তারও

চিকিৎসা শুরু হলো।প্রায় ঘন্টা খানেক পেরুতেই ছুটে এলো নুরুল সওদাগর। চোখেমুখে লেপ্টে থাকা উৎকণ্ঠা। শরীরে জড়ানো আইনের পোশাক। এসেই প্রথম দফায় প্রশ্ন ছুঁড়লো,

“চেরি, অহি কেমন আছে? ঠিক আছে ওরা?”

ঠিক এই মুহূর্তে প্রশ্নটা স্বাভাবিক হলেও বাহারের ভীষণ ভাবে কানে

লাগলো। প্রশ্নটা কেমন যেন খচখচ শব্দ তুললো সন্দেহের ঝুড়ি খানায়।“ওদের খবর জানায় নি এখনো। বাবা, চিত্রারও বা’হাতটার বেশ বাজে অবস্থা।”

বাবার প্রশ্নের উত্তরটা তুহিন বেশ বুদ্ধিমানের মতন দিলো। বাবাকে যেন স্মরণ করিয়ে দিলো চিত্রাও ভুক্তভোগী। নুরুল সওদাগর কিছুটা

বিব্রত হলেন। অতঃপর প্রহর গুনলেন কিছু ভালো খবরের।

বাড়ি থেকে চাঁদনীর অনবরত ফোন আসছে। ফুপুকে তার কাছে রেখে আসা হয়েছে। মেয়েটারও তো এখন প্রায় গর্ভকালীন শেষ সময়। এতটা চাপ হয়তো ওর শরীরও নিতে পারবে না।

অবশেষে টান টান উত্তেজনা এবং অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বেরিয়ে

এলো ডাক্তার। সব হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ালো। ডাক্তারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, তবে প্রশ্ন করার সাহস হলো না কারো। মনের মাঝে ভয় গুলো আকাশ ছুঁয়েছে।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে প্রশ্নটা প্রথম বাহারই করলো,“ওদের কী অবস্থা? কতটুকু ক্ষতি হয়েছে?”

হাতের গ্লাবস খুলতে খুলতে বয়স্ক ডাক্তার ভয়ে মুখিয়ে থাকা

পরিবারটার দিকে দৃষ্টি দিলেন। খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,

“আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা দিয়ে ফেলেছি। কেমিক্যাল টা পরার পর আপনারা পানি দেওয়াতে অনেকটা রক্ষা হয়েছে। এ*সি*ড পরার পর একমাত্র পানি দিলেই এটার প্রকোপ অনেকটা কমে যায়। তবে,ছোটো বাচ্চাটার শ্বাসনালী আর ডান গালটার অবস্থা ভালো না। শ্বাস

নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। লাইফ সাপোর্টে রাখা আছে। আর যে মেয়েটার বা’হাত পুড়েছে ওর এতক্ষণ জ্ঞান না থাকলেও এখন জ্ঞান ফিরেছে। ওর হাতের অবস্থাও ভালো না। আপনাদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। অবস্থা বলা যায় তত সুবিধার না। আর যার ছিঁটকে এসে অল্প স্বল্প লেগেছে তাকে পুরো চিকিৎসায় দেওয়া হয়েছে। সে এখন

ঘুমের ইনজেকশনের কারণে ঘুমিয়ে আছে।”চেরির মায়ের হাউমাউ করে কান্না বাড়লো। প্রতিটি প্রাণ যেন এমন একটা খবরে আহত হলো। চেরি আর চিত্রাই ঐ বাড়ির প্রাণ, তাদের অস্বাভাবিক এমন ঘটনায় সবারই প্রাণ ঝরে যাওয়ার উপক্রম। নুরুল সওদাগর ততক্ষণে তার পুলিশ টিমকে খবর জানিয়ে দিয়েছে। এমন একটা ঘটনা যে-ই

করেছে, তাকে বাঁচতে দেওয়া হবে না।

চেরির মা কাঁদতে কাঁদতে যখন ক্লান্ত প্রায় মুনিয়া বেগম ছুটে গেলেন নিজের মেয়ের কাছে। ডাক্তার তো বলেছে মেয়েটার জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলতে চায়। মেয়েটাকে অবশ্যই সাহস দিতে হবে।মুনিয়া বেগমের পিছে পিছে তুহিন,দিশান,তৃষাণ সবাই ই গেলো। এমনকি এতক্ষণের

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হওয়া চেরির মা অবনী বেগমও গেলেন নিজের বড় জা'য়ের হাত ধরে। সওদাগর বাড়িটা এমনই, এখানে আমি তুমি বলে কিছু নেই, এখানে সবাই মিলে আমরা। নারী মহলে কথা কাটাকাটি, কিঞ্চিৎ রেষারেষি থাকলেও বাড়ির বাচ্চাদের প্রতি সবাই সহনশীল, নমনীয়। এক রকমের ভালোবাসা প্রতিটা সন্তানের জন্য।

চিত্রার অনবরত শ্বাস নেওয়ার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে মেয়েটা কতটা অসহনীয় ব্যাথায় কাতরাচ্ছে। মুনিয়া বেগম এসেই মেয়ের ডান হাতটা চেপে ধরলেন। এতক্ষণের শক্ত, দৃঢ় মানবী মেয়ের অসহায়ত্ব দেখে ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন। মুঠোয় রাখা মেয়ের হাতটা পরম স্নেহে কতক্ষণ আদর করে দিলো। খুব যত্নে চুমু এঁকে দিলো।

চিত্রা কোনোরকমে উচ্চারণ করলো,“আমার চেরি কেমন আছে, আম্মু?”

অবনী বেগম এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ তার মুখে যে ভয়াবহ কান্নাটা ছিলো, এখন সেটা গিলে ফেলেছে। চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন,

“সবাই ভালো আছে। তুই চিন্তা করিস না। সুস্থ হয়ে উঠ।”

চিত্রা ছোট চাচীর দিকে তাকালো। ঠোঁট ভেঙে তার কান্না এলো। ছোট চাচী যে খুব সাবধানে মিথ্যে কথা বলার প্রয়াস চালিয়েছে সেটা বুঝতে তার বাকি রইলো না।

তন্মধ্যেই চিত্রার কক্ষে হুড়মুড় করে প্রবেশ করলো চিত্রার বাবা নুরুল সওদাগর। এসেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,“তোমার কলেজের সামনে

নাকি কোন বখাটে ছেলের সাথে আজ ঝামেলা করেছো? এটা কি সত্যি!”

এমন ভয়াবহ সময়ে এই প্রশ্নটা যেন নেহাৎ ই বেমানান মনে হলো। চিত্রা কেবল ফ্যালফ্যাল করে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। এই মুহূর্তটাতে বোধহয় সে বাবার স্নেহ ছাড়া কিছুই প্রত্যাশা করে নি।

নুরুল সওদাগর স্থান,কাল, পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলো। ধমকে বললো, “তুমি নিজেই যেচে বিপদ ডেকেছো, তোমার সাথে ভুক্তভোগী ঐ নিষ্পাপ দুটি মেয়েও। তোমাকে বার বার বলেছি সাবধান হও নি। সব জায়গায় দেখিয়ে গেছো নিজের দস্যিপনা। খুব সম্ভবত আজ সকালে যে ছেলের সাথে ঝামেলা করেছো সে-ই এ কাজটা করেছে। নিজে

যেচে বিপদ এনেছো এবার ভুগতে থাকো। আমার তো আফসোস হচ্ছে ঐ মেয়ে দু'টির জন্য। পুড়লে তুমি একাই পুড়তে, ওদের তো দোষ ছিলো না।"

কক্ষে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষ অবাক হয়ে নুরুল সওদাগরকে দেখে গেলো। বাবার এমন উক্তি আদৌও সাজে! তাও মেয়ের এ অবস্থায়?

নিরবতাকে আরেক ধাপ অবাক করে কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বাহার ভাই বলে উঠলো,“এমন বাবার মেয়ের কেবল পুড়ে যাওয়া না, মরে যাওয়া উচিৎ।”

বাহারের কথায় মিষ্টি হাসলো চিত্রা। বা’চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুবিন্দু। কাঁপা কণ্ঠ, মুখে হাসি নিয়ে সে বললো,“আমিন।”

নিরবতা বাড়লো। বিষাদ বাড়লো। চিত্রা অনুভব করলো, শরীরে পরা এ*সি*ডও বোধহয় এত জ্বালায় নি যতটা বাবার কথা জ্বালিয়েছে। চামড়া পু*ড়ে যাওয়ার জ্বালার চেয়ে হৃদয় পু*ড়ে যাওয়ার ব্যাথা বেশি। চামড়ায় প্রলেপ লাগানো যায়, হৃদয়ের গতি কী? কেবল ক্ষত বয়ে বেড়ানো ছাড়া!“মরার মত বাইচ্চা আছি,

আর মারবি কী?
শরীর থেকে আত্মাটাই তো
বের হওয়ার বাকি।
বেইমান ভরা দুনিয়ায় সব আঘাতে
ভরপুর,
যে যার মতন আঘাত দিছে, পারছে
যতদূর।”
গিটারের শব্দটা থামলো, পরিবেশে
তখনও অভিযোগের সুর গুলো ভেসে
বেড়াচ্ছে। অভিযোগ করা মানুষটা

নিশ্চুপ, নিরুত্তর। মধ্যরাতে শো শো করা বাতাসের কারণে মাঝে মাঝেই গানের তাল কেটেছিলো, কিন্তু অভিযোগের ঝুড়ি হালকা হয় নি। অভিযোগ গুলো বেশ শক্ত-পোক্ত কিনা।ফোনের স্ক্রিনে ছোট্ট ম্যাসেজ আসতেই কালো, আঁধারিয়া স্ক্রিনটাতে আলো জ্বলে উঠলো। তত প্রয়োজনীয় বার্তা না, ইন্টারনেট প্যাকেজের ম্যাসেজ। বাহার দৃষ্টি

রাখলো ফোনের স্ক্রিনটাতে। রাত তিনটা বেজে সাত মিনিট। রাতটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, পানসে, বিষণ্ণ লাগছে যেন। ছাঁদের হরেক রকমের ফুল গাছের ফুল গুলো থেকে মিশ্রিত একটা ঘ্রাণ ভেসে আসছে। মিশ্রণের কারণে ঘ্রাণটা ঠিক মিষ্টি লাগছে না, বরং কিছুটা উদ্ভটই লাগছে। বাহার মুখ-চোখ কুঁচকালো। এই হরেক রকমের ঘ্রাণের থেকে তার পুড়ে

যাওয়া নিকোটিনের ঘ্রাণটা বোধহয় বেশিই ভালো। হুট করেই ভীষণ ধোঁয়া উড়ানোর তৃষ্ণা পেলো তার। প্যান্টের পকেট তন্নতন্ন করে সে দেশলাইয়ের বাক্সটা ছাড়া আর কিছুই পেলো না। প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসটা না পেলে বিরক্তের স্রোত বয়ে যায় শরীরে। বাহারের ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটলো। বিরক্তিতে কপাল কুঁচকালো।

দুপুরেই তো সিগারেট টা শেষ হলো তারপর এত অঘটনের কারণে আর কেনা হয় না। ভাবতেই একটা হতাশার শ্বাস বেরিয়ে এলো। এই মুহূর্তে সিগারেট টা বেশিই প্রয়োজন। পানসে রাতটাকে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিলেই বিষণ্ণতা কিছুটা কমবে।এলোমেলো ঝাকড়া চুল গুলো থেকে চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ে গায়ে জড়ানো টি-শার্টটার অনেক

অংশই ভিজে গেছে। সেদিকে খেয়াল দিলো না বাহার, বরং আস্তে ধীরে পা ফেলে সে সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকে নিচে চলে এলো। চিত্রাদের বাড়ির ছাঁদে যেতে হলে তাদের মেইন দরজার বাহিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। সেই সুবাধে বলা যায় কে, কখন ছাদে যায় আসে তা এতটা বুঝতে পারে না ঘরের ভেতরের লোকজন।

ছাদ থেকে নেমে যেই না মেইন গেইট পাড় হয়ে বাহিরে যেতে নিবে তন্মধ্যেই চিত্রাদের বাড়ির বৃদ্ধ দারোয়ান বাহারকে ডাক দিলো,“বাহার চাচা, আম্মাজান গো কী খবর? আপনি তো দেইখা আইছিলেন তাই না?”

যেতে যেতেও থেমে দাঁড়ালো বাহার। বয়সের ভারে কুঁচকে যাওয়া চামড়ার মানুষটার দিকে তাকালো। রাতের

রাস্তার সোডিয়ামের হলদেটে আলোয় লোকটার কালো কুচকুচে মুখটা চিলিক দিয়ে উঠলো। বৃদ্ধ দারোয়ানের চোখের কোণে অশ্রুদের ভীড় চোখ এড়ায় নি বাহারের। বাহার অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো বলে লোকটা থেকে বাহারের অবস্থান প্রায় সাত-আট হাত। বাহার পিছিয়ে এলো। বৃদ্ধ দারোয়ানের বরাবর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো,

“আপনি ঘুমান নি, চাচা?”“না চাচা, বাড়ির ফুল গুলানের এই অবস্থা, আমি কেমন কইরা সুখের নিদ্রা যামু কও?”

লোকটার কথায় বাহার কিঞ্চিৎ অবাক হলো। বাড়ির সামান্য দেহরক্ষী অব্দি মেয়ে গুলোর চিন্তায় ঘুমায় নি অথচ সে দিব্বি এসে এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিলো। অদ্ভুত!

“কইলা না তো চাচা, আম্মারা ভালো আছে?”

বাহার মুখ ছোটো করলো, বিরস মুখে উত্তর দিলো,

“না চাচা, তত ভালো নাই। তবে অহির ততটা ক্ষতি হয় নি। সে কাল-পরশুই বাসায় চলে আসতে পারবে। চেরি আর চিত্রারই অবস্থা খারাপ।”বৃদ্ধ লোকটা ফ্যালফ্যাল করে কেঁদে দিলো। চোখের পানি

গুলো বাহারের কাছে মুক্তোর দানার মতন লাগলো। সে কেবল নির্মিশেষ তাকিয়ে রইলো ক্রন্দনরত আবু চাচার দিকে। পুরুষ মানুষদের কান্না করাটা ঠিক মানানসই না হলেও আবু চাচার কান্নাটা বেশ মায়া মায়া। কালো, কর্কশ মুখটার দিকে তাকালে কোনো টান অনুভব না হলেও কান্নার মাঝে অগাধ ভালোবাসা আছে। বাহার লোকটার ডান বাহুতে

ভরসার হাত রাখলো, আশ্বাস দিয়ে বললো,

“কান্না করবেন না, চাচা। আল্লাহ্ রে ডাকেন। কান্না করে আর কি’বা হবে।”

আবু চাচা নিজের ডান হাতের তালুর সাহায্যে চোখের অশ্রুবিন্দু গুলো মুছলো। তবুও ভিজে ভিজে জল বিন্দু গুলো লেপ্টে আছে গালে। কান্না থামিয়ে লোকটা ভীষণ অসহায়

কণ্ঠে বললো,“জানো বাবা, এ বাড়ির মানুষ গুলা বড্ড ভালো। অহি মামুনি শান্ত ছিলো ছোট বেলা থেকে। ওর জন্য কারো চিন্তা ছিলো না কিন্তু চিত্রা মামুনি ছিলো অনেক দুষ্টু। একটু চোখের পলক পড়তেই মেয়েটা গেইটের বাহিরে চলে যেতো। অনেক নাকানিচুবানি খাওয়ালেও দিনশেষে মেয়েটা কত যত্নশীল ছিলো। আর চেরি মামুনিরে

তুমি দেখলাই। ও গো এত বিপদ হইবো ভাবি নাই। সবই পাপের ফল বুঝলা। বাপ-মায়ের পাপ, সন্তানরে ধরে।”

শেষের কথা টুকু বাহারের মনে দারুণ সন্দেহ জাগালো কিন্তু সে প্রকাশ করলো না। কারণ সে এতটুকু জানে, আবু চাচা অনেক বিশ্বস্ত লোক, যে বাড়ির নুন খায়, সে বাড়ির খারাপ চাইবে না। হয়তো

এখন অতি আবেগে কথা টা বের হয়ে গেছে, নাহয় এটাও বের হতো না। মনুষ্য জাত এমনই, এদের আবেগের স্রোত এত বেশিই যে, আবেগের বশে এদের বিবেকের মাঝে মাঝে কার্যক্ষমতা লোপ পায়। বাহার আবু চাচাকে ঘরে পাঠিয়ে নিস্তব্ধ রাস্তায় পা বাড়ালো। ঘুমিয়ে আছে রাতের শহর, তাই তো এত নিশ্চুপ। চিত্রাদের রাজধানীর

নামকরা প্রাইভেট হসপিটালে ট্রান্সফার করা হয় নুরুল সওদাগরের হম্বিতম্বিতে। কোনোমতেই সে এই সরকারি হসপিটালে মেয়েদের রাখবেন না। ভালো চিকিৎসা পেতে হলে তার মতে প্রাইভেট হসপিটালের বিকল্প নেই। বাহারের তখন এসব জিনিস গুলো একটু বেশি বেশিই মনে হয়েছিল। যে বাবার মেয়ের বাঁচা মরা নিয়ে ভাবনা

নেই, তার হসপিটালের পরিবেশ নিয়ে ভাবনাটা নেহাৎ ই হাস্যকর মনে হলো। এমন গা জ্বালানো আদিখ্যেতা বাহারের ঠিক সহ্য হয় নি তাই সে রাত এগারোটার দিকেই চলে এসেছে। বাড়িতে আপাতত চাঁদনী, ফুপু,ফুপুর ছেলে অনয় আর চাঁদনীর স্বামী ছাড়া কেউ নেই। সবাই হসপিটালে। চিত্রার বড়ো চাচাও চলে এসেছে। চিত্রার ছোটো

চাচাকেও জানানো হয়েছে। উনিও যত দ্রুত সম্ভব আসার চেষ্টা করবে। চিত্রাদের এলাকায় এত রাতে অবশ্য কোনো দোকান খোলা নেই। বড়লোকের অভিজাত এলাকা কিনা। বাহার চুল গুলো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একটা বিরক্তের শ্বাস ফেললো। একটা বিদঘুটে রকমের শব্দ বের হয়ে এলো মুখ থেকে। পায়ের সামনে পড়ে থাকা খোলা

বোতলটাকে ডান পায়ে লাথি দিয়ে তাচ্ছিল্য করে বললো,

“শা*লা বড়লোক হলেই ঝামেলা। সামান্য সিগারেট খেতে কিনা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতে হচ্ছে! সামান্য একটা সিগারেটই যদি না পাওয়া যায়, তবে তোদের এত বড়োলোকি ভাবসাব দিয়ে কি লাভ? সিগারেট রাখে না ভদ্র এলাকা অথচ একেকটা বড় বড় পার্টির নাম করে

ম*দ খেয়ে টাল হয়ে থাকে। নারী নে*শায় টাকা উড়ায়। সব রাতে করে, দিনেই এসব বড়োলোকেরা সাধু সাজে। যত্তসব ফাউল লোকজন। আমাদের গরীবদের ধোঁয়া উঠানোর আনন্দটাও তাদের সহ্য হয় না। গরীবদের শখ, আহ্লাদ, খুশিতে লা*থি মেরেই যেন এদের চিরসুখ।”অনির্দিষ্ট, গন্তব্যহীন হেঁটে অবশেষে বড় রাস্তের মোড়ে খুপরির

মতন চায়ের দোকানটা খোলা পেলো বাহার। সেখান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে যেই না বাড়ির পথে পা বাড়াতে নিলো, হঠাৎ মনে হলো তখনের অতিকষ্টে মিষ্টি হাসি দেওয়া মেয়েটাকে একটু দেখতে যাওয়া উচিৎ। কি নিদারুণ কষ্টই না মেয়েটা পেয়েছে?আধাঘন্টার পথ একা একা, বেখেয়ালি ভাবে হেঁটে অবশেষে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছালো বাহার।

অথচ বাহারের জীবনে এত গুলো দিনেও কোনো গন্তব্য ছিলো না। একরাতের মধ্যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও বাহার ভাইয়েরও একটা গন্তব্য হলো। ফোনের স্ক্রিনে সময় দেখার জন্য দৃষ্টি দিতেই দেখলো একদম চারটা বাজে। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেললো বাহার। অলস, ধীর, ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে সাদা

ধবধবে, পরিষ্কার হসপিটালের তিন তলায় নিয়ে গেলো।

করিডোরে মানুষ নেই তেমন। বাহার যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে প্রায় অনেকটা দূরে তুহিন চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে, তুহিনের কাঁধে মাথা রেখে দিশান ঘুমাচ্ছে। বাহার যতটুকু জানে হসপিটালের নিচে তলায় একটা বিরাট জায়গা আছে যেখানে

রোগীদের সাথে আসা মানুষরা থাকে। হয়তো বাকিরা সেখানেই। বাহার ধীর গতিতে গুনে গুনে পা ফেলে চিত্রার কেবিনের সামনে দাঁড়ালো। যেইনা কেবিনের দরজা খুলতে যাবে, তুহিনের ঘুম ঘুম ভরাট কণ্ঠ ভেসে এলো,“বাহার ভাই, আপনি যে!”

বাহারের ভড়কে যাওয়ার কথা থাকলেও সে বেশ স্বাভাবিক রইলো।

দরজার হাতলেই হাতটা রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তুহিনের দিকে তাকালো। অতঃপর তার গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠে বললো,

“হ্যাঁ, দেখতে এসে ছিলাম তোমাদের। তুমি বিশ্রাম করো।”

তুহিন আর কোনো প্রশ্ন করলো না, প্রতিক্রিয়া জানালো না। বাহার ভাইয়ের কথা পালন করে সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেললো।

মিনিট দুই পেরুতেই ভারী ভারী শ্বাস ফেললো। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে।

বাহারের হুট করেই মনে হলো এত রাতে আর দেখা করার প্রয়োজন নেই। যেই না সে হালকা খুলে যাওয়া দরজারটা আটকে দিয়ে চলে যেতে নিলো, পেছন থেকে মুমূর্ষু ডাক ভেসে এলো,“বাহার ভাই।”

বাহার আর পা আগাতে পারলো না। পিছে ঘুরে বিছানায় লেপ্টে থাকা চিত্রার দিকে তাকালো। মেয়েটা এত রাত অব্দি জেগে আছে! মেয়েটার হাতে এই মোটা ব্যান্ডেজ। কাল হয়তো ওর আর চেরির সার্জারী নিয়ে আলোচনা হবে।

বাহারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্বিতীয় ডাক দিলো চিত্রা,

“বাহার ভাই, আসেন।”

এমন ডাক ফিরিয়ে দেওয়ার আগ্রহ বাহারের মাঝে আর দেখা গেলো না। সে ধীর গতিতে চিত্রার কেবিনে প্রবেশ করলো। কেমন হিমশীতল রুমখানা! বাহারের এতক্ষণের কিঞ্চিৎ ঘেমে থাকা শরীরটা শিরশির করে উঠলো কৃত্রিম শীতলতায়।

বাহার যেতে যেতে একবারে চিত্রার বেডখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

পা হতে মাথা অব্দি মেয়েটাকে পরখ করে বললো,“কেমন আছো?”

এমন অসময়ে,অদ্ভুত প্রশ্নটা যেন বাহার ভাইয়ের মুখেই মানায়। ভোঁতা যন্ত্রণা নিয়ে বিষাদ হেসে চিত্রা উত্তর দিলো,

“আমি তো সবসময় ভালো থাকি।”

“তা, ঘুমাও নি কেনো?”

বাহারের প্রশ্নে চিত্রার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো। বাহারকে বিব্রতবোধ করাতে বলে উঠলো,

“আপনার অপেক্ষায়।”

বাহার হাসলো। বাহার খুব সহজে হাসে না। আবার হয়তো হাসে কিন্তু চিত্রাদের বাড়ির মানুষদের সামনে তেমন হাসে না। মেয়েটা যে এমন যন্ত্রণার মাঝেও ঠাট্টা করছে, তা

বাহারের বেশ লাগলো। বাহারও উত্তরে বললো,

“বাহারের অপেক্ষায় থেকো না মেয়ে, কংক্রিটের হৃদয় তো, আবেগ ছোঁয় কম। অঘোষিত অপেক্ষাদের পরে মৃত্যু হবে। অথচ তুমি তো পুষ্প প্রেমী,কাঁটায় কেন এত ঝোঁক?”“মিষ্টতা নিতে নাহয় একটু আধটু কাঁটার ঘাঁ হলোই, এতে যদি

আস্ত একটা বাহার ভাই পাই, তাতে ক্ষতি কী?”

“বাহার কিন্তু পু*ড়িয়ে দিতেই জানে কেবল।”

“কতটা পু*ড়ায় বাহার? সিগারেটের মতন? নাকি তার চেয়েও বেশি?”

বাহ্, আজ মেয়েটা কথায় জেতার বুদ্ধি করেছে বোধহয়। বাহার চিত্রার অসুস্থতায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাওয়া

মুখটার দিকে তাকালো। খুব ক্ষীণ, স্থির কণ্ঠে বললো,

“রঙ্গনা যদি জ্বলতে আসে তবে কিঞ্চিৎ নাহয় কম পু*ড়াবো।”

চিত্রা ফিক করে সকল যন্ত্রণা ভুলে হেসে উঠলো। বাহার সেই মুখটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে চলে যেতে যেতে ধীর স্বরে গাইলো,“কথা হবে, দেখা হবে

প্রেমে প্রেমে মেলা হবে,

কাছে আসা-আসি আর হবে না।
চোখে চোখে কথা হবে
ঠোঁটে ঠোঁটে নাড়া হবে
ভালোবাসা-বাসি আর হবে না।”

চিত্রা যাওয়ার পানে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ। আপনমনেই প্রশ্ন তুললো, “সত্যিই হবে না, বাহার ভাই?”

উত্তর এলো না এ প্রশ্নের, কারণ মানুষটা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গিয়েছে। বয়ঃসন্ধির রঙ্গনার চোখ

ঝাপসা করে জল এলো। ঠোঁট ফুলিয়ে বললো,

“আমি ভালো নেই, বাহার ভাই। ভালো নেই আমি।”আরও একটা দিন এলো হাজারো আশংকা নিয়ে। চেরির অবস্থা খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে। চিত্রারও তেমন হুঁশ নেই। গতকালও মেয়েটা যতটুকু ভালো ছিলো আজ তার একাংশও ভালো নেই। সারাটাদিন সকলের

কেবল সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে ডাকতে গেলো। কোনো ভালো খবর যেন আসে সে আশায়।

বাহারকে সারাদিনও আর দেখা যায় নি। আসে নি হসপিটাল। নুরুল সওদাগর ইনভেস্টিগেশনে নেমে গিয়েছেন খুব কঠিন ভাবে।হুট করেই বিকেলে পাওয়া গেলো আরও একটা চাঞ্চল্যকর খবর। মহিন নাকি আজ ভোরেই সিলিং ফ্যানের সাথে

ঝু*লে গিয়েছে। পুলিশ যখন তার খোঁজে তার বাসায় গেলো তখন তাকে মৃ*ত অবস্থায় পাওয়া যায়। নুরুল সওদাগরের সন্দেহের খাতায় ছিলো কলেজের বখাটে ছেলেটা এবং মহিন। বখাটে ছেলেটা নাকি চিত্রার এমন ঘটনা শোনার পরই উধাও হয়ে গেছে, আর মহিন তো মৃ*তই। খুব সহজ সরল কেসটা হুট করেই জটিল হয়ে গেলো। মহিনের

মৃত্যুটা খু*ন নাকি আত্ম*হত্যা তা নিয়ে সাড়া পড়ে গেলো। সব গুছিয়ে থাকা জিনিস যেন হুট করেই এলোমেলো হয়ে গেলো।ভাদ্র মাসে প্রকৃতি বোধহয় একটু বেশিই উত্তপ্ত থাকে। বাহিরের প্রকৃতি রোদে পুড়ে যেন ছারখার হয়ে যাচ্ছে। হসপিটালের ভেতরে অবশ্য কৃত্রিম শীতলতার আবরণ। হসপিটাল টা বেশ শুনশান। কোনো অহেতুক শব্দ

নেই, কথাবার্তা নেই। সেই শুনশান পরিবেশে গা কাঁপানো উত্তেজনা নিয়ে একটি বিধ্বস্ত পরিবার দাঁড়িয়ে আছে। অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে তাদের পরিবারের দু দু'টো উড়ন্ত পাখি ডানা হারিয়ে নিশ্চুপ হয়ে আছে। তন্মধ্যেই তাদের কুটুম বাড়ির ছেলের এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনাও যেন ভীষণ অবাক এবং স্তব্ধ করেছে। নুরুল সওদাগর তার

ফর্মাল পোশাকটা নিয়েই দেয়ালের সাথে লাগানো চারপায়ার উপর চিন্তিত মুখে বসে আছে। তার যেন মনে হচ্ছে, যে রহস্যের গর্ত সে খুঁড়েছে তা এত সহজে সমাধান করা যাবে না। খুব গভীরে হয়তো যেতে হবে।

নিরবতার জাল কাটলো। আফজাল সওদাগর গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললো,“এখন তো আমাদের একটু

ও বাড়িতেও যাওয়া উচিত। অথচ মেয়ে দুটোরই জীবন-মরণ অবস্থা। কি যে করবো বুঝে উঠতে পারছি না।”

“ভাইজান, মহিনের লা*শ পোস্টমর্টেম করাতে নেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভবত আজ দেওয়া হবে না। কাল লা*শ আসবে। তাই আজ না গেলেও সমস্যা নেই। তাছাড়া চাঁদনী আর মাহতাব তো গিয়েছেই।”

নুরুল সওদাগরের কথা শেষ হতেই বার কয়েক মাথা নাড়ালো আফজাল সওদাগর। খুব মনযোগ দিয়ে কি যেন ভাবলেনও। কতক্ষণ নিশ্চুপ থেকে নুরুল সওদাগরকেই প্রশ্ন করলেন,“আচ্ছা, তুমিও তো গিয়েছিলে আজ মহিনদের বাড়িতে তাই না? ঠিক কী কী দেখেছিলে? বা হয়েছে?”

“হ্যাঁ আমি আর আমার কয়েকজন কনস্টেবল গিয়েছিলেম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। যেহেতু সেদিন একটা বিরাট কান্ড ঘটেছিলো, সেহেতু আমাদের সন্দেহের তালিকায় সবার আগে নামটা মহিনেরই ছিলো। আর যেহেতু চিত্রার কলেজের সামনে আরেকটা কান্ড ঘটেছে তাই দ্বিতীয় সন্দেহ করেছি ও ছেলেকে। কিন্তু ছেলের

কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছিলো যার ফলস্বরূপ সে পালিয়েছে। এখন আমরা এটা ভাবতে পারি যে, সে যেহেতু পালিয়েছে, আসল দোষী সে। কিন্তু তা না-ও হতে পারে।কারণ বাঙালিরা দোষ থেকে বাঁচতে গিয়ে অপরাধ না করেও অপরাধী হয়ে যায়। যেমন ধরেন ছেলেটা, সে হয়তো ভয়ে পালিয়েছে কিন্তু আমরা

চাইলেই তাকে অপরাধী হিসেবে গন্য করতে পারি। আবার হয়তো সে-ই অপরাধী। ছেলেটাকে হাতছাড়া করার পর নিশানা ছুঁড়লাম মহিনের দিকে। তাই আজই চলে গেলাম ওদের বাসায়। দেখি চাঁদনীর শাশুড়ি দরজা খুলেছে। মহিনের কথা জিজ্ঞেস করায় মহিলা প্রথম কতক্ষণ হৈচৈ করেছে পরে নিজেই মহিনের রুম দেখিয়ে দিয়ে বলছে মহিন

নাকি উঠে নি, এখনো ঘুমে। আমরা কয়েকবার মহিনকে ডাকলাম, সাড়াশব্দ না পেয়ে অবশেষে দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলাম। দরজা ভেঙে উদ্ধার করলাম মহিনের মৃ*ত দেহ যা ঝুলে ছিলো সিলিং ফ্যানের সাথে। মহিনের মা সাথে সাথে ই জ্ঞান হারান। আমরাও ভীষণ অবাক হলাম। কি ভেবেছি আর হলো কি।”চিত্রাদের পরিবারে উপস্থিত

প্রত্যেকটা সদস্য ধ্যান দিয়ে সবটা ঘটনা শুনলেন। নুরুল সওদাগরের কথা শেষ হতেই আনমনেই সবার বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। হাসিখুশি পরিবারটায় যেন হুট করেই দুর্যোগ নেমে এলো।

দীর্ঘ দু'ঘন্টার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে তন্মধ্যে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলো অভিজ্ঞ ডাক্তাররা। বিচলিত, শঙ্কিত প্রাণ গুলোর হৃদয়

মাঝের লুকায়িত ভীতি যেন আরও বাড়লো। তাদের অস্বাভাবিক ভাবে দৌড়াতে থাকা হৃদপিণ্ডকে শান্ত করে ডাক্তার বললেন,“আপনাদের বড় মেয়ের হাতের সার্জারী করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আশাকরা যায় কোনো একদিন সে আবার আগের মতন দু হাতে ভর দিয়ে দুনিয়া জয় করতে পারবেন।”

উপস্থিত প্রাণ গুলোতে পানি এলো। ঝলমলে হাসির চিলিক দেখা দিলো ঠোঁট জুড়ে। সৃষ্টিকর্তার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়ায় ভরিয়ে দিলো। এ যেন উৎসব মুখোর পরিবেশে রূপান্তরিত হলো।

সেই আনন্দকে ছাপিয়ে নুরুল সওদাগর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

“চেরির কী খবর? বাচ্চাটা ভালো আছে তো?”

উৎসবে আবার ভাঁটা পড়লো। সত্যিই তো, একজনের হালচাল শুনেই সবাই এত খুশি হয়ে গেলো, অথচ আরেকটা বাচ্চাও তো লড়াই করছে মৃত্যুর সাথে।নুরুল সওদাগরের প্রশ্নে মুখ ছোটো হয়ে এলো ধবধবে ফর্সা ডাক্তারের। মুখ কালো করে বললো,

“চেরির কোনো পজিটিভ খবর আমরা দিতে পারছি না। ছোটো

মানুষের চামড়া ভীষণ কোমল থাকে। আর সে চামড়া যদি এমন ভয়ানক একটা পানীয়ের স্বীকার হয়, তাহলে তো বুঝতেই পারছেন। সে যে এতক্ষণ অব্দি শ্বাস নিচ্ছে, সেটাই মীরাক্কেল। সবটাই সম্ভব হয়েছে এসিডের পর সে স্থানে পানি ঢালার কারণে। নাহয় বাচ্চাটার শ্বাসনালিও একবারে পুড়ে যেতো। আমি অবশ্য একটা সাজেশন দিতে পারি,

এ*সিডের তত উন্নত চিকিৎসা এখনও বাংলাদেশে প্রচলন হয় নি। আপনারা উন্নত কোনো রাষ্ট্রে যদি ওকে নিয়ে যেতে পারেন তবে হয়তো বাচ্চাটাকে আবার একটা জীবন দিতে পারবেন।”ডাক্তারের কথা থামতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো চেরির মা অবনী বেগম। মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন চাঁদনীর মা খাদিজা বেগমও। আফজাল

সওদাগর বুক চেপে পাথরের ন্যায় বসে রইলেন। সব কেমন যেন বিশ্রী রকমের এলোমেলো লাগছে। মিনমিন করে সে বললো,

“সব পাপের ফল, পাপের ফল।”আজ সারাটা দিন বাহারের ছায়ার দেখাও পায় নি কেউ। সে তার ব্যাক্তিগত কাজ, পড়াশোনা, টিউশন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলো। এ নিয়ে চিত্রা রানীর ভীষণ অভিমান

জমেছে। অথচ দিনরাত সে জপে যায় বাহারকে তার পছন্দ না। মেয়ে জাত সবসময় অতিরিক্ত বুঝদার হওয়ার পরও নিজেদের অনুভূতি সম্পর্কে খুব একটা অবগত তারা থাকে না। আবার কখনো কখনো অনুভূতির বিপরীতে কথা বলে নিজেদের প্রমাণ করতে গিয়ে আরও জড়িয়ে পরে অনুভূতির শিকলে। চিত্রাও তার বহির্ভূত নয়। তার উপর

আবার টিনএজার। বয়ঃসন্ধির অনুভূতি একটু বেশিই হয়। আকর্ষণ ক্ষমতা তাদের বেশি কাজ করে। চোখ তো নয় যেন রঙিন চশমা।রাত তখন দেড়টা। হসপিটালের করিডোর জনমানবহীন। চিত্রাদের পরিবারের বেশিরভাগ মানুষ বাসায় চলে গিয়েছে। কেবল অহি থেকে গেছে চেরির সাথে। আর তুহিন

এবং চিত্রার মা নিচে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

চিত্রার চোখে ঘুম নেই। সারাদিন শুয়ে থাকতে থাকতে পিঠ তার অবশ হয়ে আসছে যেন। অহি আপা কিছুক্ষণ পর পর এসে দেখে যাচ্ছে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আবার ছুটে যাচ্ছে চেরির কাছে। চেরির আম্মু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। আর

চিত্রার মাও তো দু’দিন যাবত এ হসপিটালেই পরে আছেন। তাই তাকে নিয়ে তার বড় ছেলে নিচে গিয়েছে একটু বিশ্রাম করানোর জন্য।চিত্রা যখন ঘুমানোর চেষ্টায় সবে চোখ বন্ধ করলো রুমে কারো বিচরণ অনুভব করলো। বন্ধ করে রাখা চোখের পাতা নিমিষেই খুলে ফেললো সে। তার সামনে অনাকাঙ্খিত সময়ে কাঙ্খিত

মানুষটাকে দেখে কিঞ্চিৎ ভড়কেও গেলো।

চিত্রাকে সজাগ দেখে ভ্রু কুঁচকালো বাহার। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“আজও ঘুমাও নি!”

“আজও যদি বলি, আপনি আসবেন বলে ঘুমাই নি।”বাহার হাসলো। পড়নের টি-শার্ট টা ঝাড়তে ঝাড়তে চিত্রার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠাট্টার স্বরে বললো,

“ইশ, তাহলে তো আসা উচিৎ হয় নি। তোমার ছোট্টো মনটাকে একটু ভেঙে দেওয়া উচিত ছিলো।”

“সারাদিনে যা ভেঙেছেন, তাও বা কম কিসে?”

চিত্রার ঠোঁট ফুলানো গাড়ো অভিমানী বাক্যে বাহার তেমন একটা পাত্তা দিলো না। বরং বেশ গা ছাড়া ভাবে বললো,“নিজ ইচ্ছায় পাগলও নিজের ক্ষতি করে না, অথচ তুমি নিজেকে

ভাঙার জন্য উঠে পরে লেগেছো। তার দায়ভার তো আর আমি নিবো না, তাই না?”

বাহারের কথায় কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলো চিত্রা। ভুল জায়গায় ভুল অনুভূতি ব্যাপ্ত করাও এক ধরণের লজ্জার বিষয়।

চিত্রার মুখের লজ্জার আভাস যেন বাহারের বুঝতে বাকি রইলো না। তাই বাহার কথা ঘুরিয়ে বললো,

“তা মেয়ে, আজ কেমন আছো?”

“ভালোই আছি। আপনি?”“তুমি জানো না মেয়ে, কাউকে এ প্রশ্নটা করা উচিৎ নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন হলো এটা। আর বেশিরভাগ মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিথ্যা বলে। একজনকে দিয়ে মিথ্যা বলানো টাও কিন্তু পাপ।”

বাহারের হেয়ালি পূর্ণ কথায় বিরক্ত হলো চিত্রা। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো,

“তো, আপনি কেনো করছেন? সেধে সেধে পাপ কামাতে আসছেন কেনো?”

“আমি সবসময়েরই পাপী বান্দা। পাপ করা যার নিয়ম। তুমি তো পবিত্র, তোমার কী পাপ করা সাজে?”

বাহারের কথা বলার ভঙ্গিতে মুখ বাঁকালো চিত্রা। বাহার উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। বুক হাত দিয়ে চিত্রাকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললো,“উফ্, এখানে লেগেছে মেয়ে।”

বাহারের ভঙ্গিতে চিত্রার বিষ্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। পরক্ষণেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। বাহার কিছুক্ষণ অপলক সে হাসির

দিকে তাকিয়ে রইলো। অতঃপর সিগারেট বের ঠোঁটের ভাজে চেপে ধরলো। বুকপকেট থেকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা বের করতে করতে বললো,

“মেয়ে জাতির যেন স্বভাবই এটা, হেসে দিয়ে পাহাড় ভাঙে। অথচ আমি নষ্ট পুরুষ।”

চিত্রা ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাতেই বাহার দরজার বাহিরে চলে গেলো।

চিত্রা কেবল তাকিয়ে রইলো হা করে। লোকটা কী যেন বলে, তা অর্ধেকই চিত্রার মাথার উপর দিয়ে যায়।নতুন একটা সকাল, আহাজারিতে পরিপূর্ণ। মহিনের কাটাছেঁড়া লাশটা পড়ে আছে তাদের বাড়ির সামনে রাস্তাটায়। মহিনের মা ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাচ্ছে। চিত্রার বড় চাচা, চাচী, তুহিন, বাহার সবাই ই এসেছে।

মহিনের জন্য সবারই খারাপ লাগছে।

নুরুল সওদাগরও ততক্ষণে উপস্থিত হয়েছেন, হাতে তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। রিপোর্টের মৃত্যুর কারণ দেখে সে হতভম্ব।প্রকৃতিতে তখন গভীর হয়ে আসা সন্ধ্যার বিচরণ। চারদিকের কৃত্রিম আলো সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সন্ধ্যা নিবারণের জন্য। হাহাকারে

হাহাকারে ভরে উঠা মানুষজন চুপচাপ, নিবিড় ভাবে স্মৃতি আঁকড়ে বিসর্জন দিচ্ছে অশ্রুকণা। সন্তান যেমনই হোক, বাবা-মায়ের কাছে তারা সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। সেই জলজ্যান্ত উপহার যখন বিদায় জানায়, তখন কোন বাবা-মা ই বা মানতে পারে সে বিদায়ের প্রতিধ্বনি! তেমনই মানতে পারে নি লতা বেগম। ছেলের মৃত দেহটা

দেখার পর পরই কেমন যেন নেতিয়ে গিয়ে ছিলেন।ছেলের শেষ বিদায় টাও তিনি দেখতে পারেন নি দু’চোখ মেলে। বিছানায় কেমন যেন ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিলেন। কারো সাথে কথা বলেন নি, চিৎকার চেঁচামেচি করেন নি। একদম চুপচাপ, স্থির হয়ে গেলেন পাহাড়ের মতন দীর্ঘদেহী মহিলাটা। চাঁদনীর স্বামী মাহতাবও ভাইয়ের মৃত্যু টা

মানতে পারে নি, তাও আবার খু*ন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যখন দেখা গেলো খু*ন এর কথা, তখন থেকেই প্রতিটি মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেলো। মহিনের লা*শটা কবর দিয়েই আফজাল সওদাগর নিজের মেয়েসহ, মেয়ের শাশুড়ি, স্বামী সবাইকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। মানুষ হারানোর শোক যে বড় শোক, তবে অদ্ভুত ভাবে এই

বড় শোকটাও সাধারণ মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যতদিন এ শোক স্থায়ী থাকে কোনো মানুষের গহীনে, ততদিন অন্তত সে মানুষটাকে আগলে রাখতে হয়। শোক জিইয়ে রেখে যদি কোনো মানুষ একাকীত্বে আবধ্য হয়ে যায় তাহলে সে মানুষ আর খুব বেশিদিন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে না।‘সওদাগর ভিলা’ বিশাল ডুপ্লেক্স বাড়িটার নাম।

যে বাড়ির প্রতিটা ইট,সিমেন্ট কেবল বহন করে হৈচৈ, রমরমা এক পরিবারের স্মৃতি। আজ সে বাড়ি শোকের নিকোষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত। সওদাগর বাড়ির সবচেয়ে ছোট বউ, অবনী, নিজের টানটান বিছানায় পা গুটিয়ে বসে আছেন। সামনে তার ছড়ানো ছিটানো কত রকমের স্মৃতির স্তূপ। চোখে তার বর্ণহীন কত অশ্রুকণা! ক্ষণে ক্ষণে

ছোট্ট চেরির ছোট্ট ছোট্ট জামাকাপড় গুলো বুকে জড়িয়ে ধরছে, কখনো বা চেরির ড্রয়িং খাতা জুড়ে বিশৃঙ্খল ভাবে এঁকে রাখা হাবিজাবি চিত্রকল্পে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বুকের সবটুকু স্নেহ ঢেলে। মনে পড়ে কত স্মৃতির কোলাহল! চেরি বুঝ হওয়ার পর সামনা-সামনি তার বাবাকে দেখেনি। ভিডিও কলের কল্যাণে তাও চেহারাটা চেনা। কত রাত এই

ছোট্টো চেরি বায়না ধরতো বাবার কোলে ঘুমানোর! কত রাত ভোর হয়ে যেতে অবনী বেগমের, মেয়ের অবুঝ বায়নার অতিষ্ঠতায়। মাঝে মাঝে দু-এক ঘা বসিয়ে দিতেন মেয়েটার পিঠে। আজ সেই স্মৃতি কেবল অভাগিনী মায়ের কান্না বাড়াচ্ছে। বড় মেয়ে তার বরাবরই চুপচাপ স্বভাবের, নিজের মনমতন চলে কিন্তু ছোট্টোটা যে খিলখিল

হাসি আর চঞ্চলতায় ভরিয়ে দিতো বাড়ির কোণা গুলো।অবনীর পাশের রুমটাতেই লতা বেগমকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। সুন্দর মতন দেখতে মহিলাটার শরীর বেশ গোলগাল, ভারী। মহিলার স্বামী মারা গিয়েছিল আজ থেকে বছর ছয় আগে। তারপর থেকেই পুরো সংসারে ছেলে দু'টোকে নিয়ে সে একা। স্বাধ করে তাই বড় ছেলের বিয়ে করিয়ে

ছিলেন। এইতো, ক’দিন আগেই বছর এক হলো। কিন্তু আজ হুট করে এই কর্কশ মহিলাটাকে নিশ্চুপ করে দিয়ে আদরের ছোটো ছেলেটাও বিদায় নিলো। সন্তানের শোক বোধহয় এত সহজে ভুলা যায় না। তাই হয়তো এত বিধ্বস্ততা মহিলার!চিত্রার মা বাড়ি নেই, হসপিটালেই তার অবস্থান। মাঝে একটু এসে গোসল করে শাড়ি

বদলে গিয়েছেন। বরাবরই সে অন্যান্যদের তুলনায় একটু শক্ত ধরণের, তাই সবাইকে নিয়তির বিধ্বস্ততা ছুঁতে পারলেও, তাকে পারে নি। পেশায় সে একজন কলেজ প্রফেসর। এজন্যই বোধহয় একটা দৃঢ়তা ভাব তার মাঝে সবসময় অবস্থিত।

আফজাল সওদাগরের স্ত্রী রোজা সওদাগর নিজের মেয়ের ঘরে বসে

আছেন। চাঁদনীরও তো এ শরীরে কম ধকল গেলো না, মেয়েটারও তো কারো সাথ প্রয়োজন। চিত্রার ফুপি আমেনা রহমানও তার ছেলে সমেত চাঁদনীর ঘরে বসে আছেন। আমেনা রহমান ডিভোর্সি নারী। স্বামীর ঘর থেকে এক বছরের সন্তান কোলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো সে। অতিরিক্ত সরল হওয়ার পরও তার জায়গা হয় নি

স্বামীর ঘরে। অতঃপর ভাইদের আশ্রয়ে ঠাঁই পেয়েছেন সে। অভাগিনীর খাতায় তার নামটাও নির্দ্বিধায় লেখা যায়। ভাইয়ের বউরা যতই ভালো হোক, মাঝে মাঝে কথা শুনাতে ভুল করে না। আসলে মানুষ জাত এমনই, সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করতে চায় না কেউই। হোক সেটা ভালো কিংবা খারাপ সুযোগ। তাতে কি আসে যায়?

সুযোগকে কাজে লাগানোটাই হলো আসল কাজ।

পুরো বাড়িতে সবাই যার যার মতন শোকে ডুবে আছেন।প্রতিটা মানুষের জীবনে কত না পাওয়ার গল্পই না থাকে! অথচ মানুষ বাঁচার জন্য তাল মিলিয়ে, দুঃখ ছাপিয়ে হেসে যায়। বাড়ির ছাঁদে, চিলেকোঠায় অবস্থানরত ছন্নছাড়া ছেলেটারও বোধহয় এমন কতশত ঘটনাই আছে

যা শোকের খাতায় বিশ্রী ভাবে লেপ্টানো! অথচ ছেলে বলেই শোক দেখানোর অধিকার তার নেই।

বাহার ভাই প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা কিংবা রাতে গোসল করেন। আজও নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় নি। গোসল করে এসেই পড়ার টেবিলে বসেছেন সে। বইয়ের সারির সবচেয়ে প্রথম বইটাই হাতে নিলেন। চাকরির বই। বইটা কতক্ষণ মেলে ধরলেন, পাতা

নেড়েচেড়ে দেখলেন। কিন্তু পড়াতে সে মন বসাতে পারলো না। ডান হাতের কনুইয়ের দিকে কেটে যাওয়া জায়গা টা তে যেন হুট করেই জ্বালা বাড়লো, সাথে জ্বালা বাড়লো বুকের পাঁজরে। হাতের বইটা বেশ শব্দ করেই ঘৃণে ধরা টেবিলটার উপরে রাখলো।বহুদিন পর আজ যেন তার স্মৃতিরাও কিঞ্চিৎ মন খারাপ ঘোষণা করে গেলো তার হৃদ মাঝারে। কিন্তু

বাহারদের তো মন খারাপ করতে নেই। কংক্রিটের হৃদয় কিনা! বাহার নিজের সাথে নিজেই কতক্ষণ ঠাট্টা করলো। মনখারাপ ভাবটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলো তাচ্ছিল্যের কষাঘাতে। কিন্তু আজ আর সে পারলো না বরাবরের মতন সে কাজটা করতে। নিজের প্রতি নিজেই বিরক্ত হলো। কাঠের চেয়ারটা পিছে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। টেবিলের নিচে থাকা

কালো ব্যাগটা বের করলো। ভাঙা, নড়বড়ে ছোট্টো একটা স্টিলের বাক্স থেকে এক জোড়া নূপুর বের করলো সে। কতক্ষণ, কত গুলো সময় সে তাকিয়ে রইলো নূপুর জোড়ার দিকে। ঘরের স্বল্পদামী হলুদ বাল্বের আলোয় বাহারের চোখের কোণে কি যেন উঁকি দিয়ে উঠলো মনে হয়! বাহার ভাই কি কাঁদছে তবে? বাহার ভাইরা তো কাঁদতে জানে না।নূপুর

দু’টো নেড়েচেড়ে দেখে বাহার। বুকের মাঝে জাপ্টে ধরে বিড়বিড় করে বলে,

“বেকারত্বের নৃশংসতায় বাহারদের নূপুর পড়ানোর ইচ্ছে গুলো পিষে যায় খুব বর্বর ভাবে। দারিদ্রতার অভিশাপ গুলো বাহারদের বানায় পাথর। অনুভূতির দাবানলে পুড়তে পুড়তে যে পাথর হয়ে উঠে অনুভূতি হীন। ভালো থাকিস, নূপুর পড়তে

না পেরে অভিমান করা অভিমানিনী। বাহার নিত্যান্তই হেরে গিয়েছিল অর্থের অভাবে।”

দমকা হাওয়া বাহারের ঘরের বেশ কমদামী, সস্তার অবগুণ্ঠন গুলো উড়িয়ে দিয়ে যায়। সাথে অটল বাহারের শরীরও শিরশির করে উঠে। একটা রাত কত মানুষের হাহাকারের গল্পই না লিখে যাচ্ছে! পরিপূর্ণতার এ পৃথিবীতে মানুষের

কত স্বপ্ন অমীমাংসিত রয়ে যায়। রাত ছাড়া এ খবর কী আর কেউ জানে!তন্মধ্যেই বাহার ঘরের দরজায় ঠকঠক শব্দ হয়। ধ্যান ভাঙে বাহারের, ততক্ষণে শোকেদের মৃত্যু হয়েছে। বাহার তড়িঘড়ি করে নূপুর জোড়া আবার স্বস্থানেই রেখে দেয়। নিজেকে আগের মতন স্বাভাবিক করে দিয়ে দরজা খুলে। দরজা

খুলতেই দেখে, অহির হাতে খাবারের প্লেট, মুখে ক্ষীণ হাসি।
বাহারকে দরজা খুলতে দেখেই অহির মুখের ক্ষীণ হাসি বিস্তৃতি লাভ করলো। বাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো,
“আপনি কাঁদছিলেন, বাহার ভাই!”প্রশ্নের সুরে অবাক ভাবটা একটু বেশিই ছিলো। অথচ বাহারকে বিব্রতবোধ করাতে পারে নি সে

প্রশ্ন। বাহার বরং বেশ স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিলো,

“কাঁদছিলাম নাকি! কই, আমার তো মনে পড়ছে না।”

অহি আড়চোখে তাকিয়ে মিনমিন করে বললো,

“আমায় ঘোল খাওয়াচ্ছেন, বাহার ভাই! অথচ আমি কিন্তু পুরোপুরি না হলেও কিঞ্চিৎ মানুষের মতিগতি বুঝতে পারি।”

“তা নিজের মতিগতি বুঝতে পারো তো!”

বাহারকে ভড়কে দিতে চেয়ে ভড়কে গেলো অহি নিজেই। আকস্মিক এই প্রশ্নটা যে সে আশা করে নি তার মুখের ভাবেই তা স্পষ্ট হলো। বাহার অহির ভড়কে যাওয়া মুখমন্ডলে দৃষ্টি দিলো। অহিকে অবাক করে দিয়ে আরেকটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন

ছুঁড়লো,“তুমি যেন কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট?”

অহির হাতের খাবারের প্লেট নড়ে উঠলো। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইলো বাহারের দিকে। মুখ-চোখ নিমিষেই শুকিয়ে গেলো মেয়েটার। আমতা-আমতা করে বললো,

“কেনো, বাহার ভাই?”

“আমার প্রশ্নের উত্তর কি এটা হলো!”

বাহারের জবাবে থম মেরে গেলো অহি। খুব কষ্টে মুখে হাসি বজায় রেখে ধীর কণ্ঠে বললো,

“বাংলা ডিপার্টমেন্ট।”“ওহ্ আচ্ছা, বাংলা ডিপার্টমেন্ট! তা, ব্রেইনফ্লুয়েন্স : দ্য সাইকোলজি অব মার্কেটিং, দ্য ম্যাজিক পাওয়ার অব সেলফ-ইমেজ সাইকোলজি,মাইন্ড রিডার ইত্যাদি

বইসমূহ কি বাংলা ডিপার্টমেন্টের! কই আগে তো জানতাম না। নাকি নতুন করে যুক্ত হলো!”

অহির মুখের ভয়ঙ্কর বিষ্ময়তা চোখ এড়ায় নি বাহারের। বাহার যে ইচ্ছেকৃত ভাবে অহিকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছে তাও বুঝতে বাকি রইলো না অহির। কথা ঘুরানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালানো শুরু করলো মানবী। কীভাবে কী বললে

বাহার ভাইয়ের মস্তিষ্কের তুখোরতার কাছে বাজিমাত করা যাবে, সে ভাবনাতেই মত্ত হলো অহি। এখন মনে হচ্ছে, যেচে যেচে বাহার ভাইয়ের ঘরে আসাই উচিৎ হয় নি তার।

বাহারও অহিকে সময় দিলো। তার বাজের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অহির দিকে। অহি ব্যান্ডেজ করা হাতটার উল্টো পিঠ দিয়ে গলায়

জমা শিশির বিন্দুর মতন ঘাম গুলো মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ সে এধার ওধার তাকিয়ে মেকি হাসি দিয়ে বললো,“আসলে বাহার ভাই, এই গুলো তো আমার বই না, ভার্সিটির এক বড় আপুর বই। আমার সাইকোলজি সাবজেক্ট টা বেশ লাগে তাই বড় আপুর থেকে বই গুলো নিয়ে ছিলাম।”

“আচ্ছা! তাই বলে এতগুলো বই? বাহ্, ইন্টারেস্ট থাকা ভালো। তা শুনলাম তোমার নাকি শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছে, তো ঝোঁক দেখি সাইকোলজির দিকে! ব্যাপার টা কেমন যেন না?”

“শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছে টা আমার না, আমার অভিভাবকদের।”

উত্তরটা বেশ শক্ত কণ্ঠেই দিলো অহি। অতঃপর হাতের খাবার গুলো

বাহারের টেবিলের উপর রেখে মাথা নত করেই বের হতে নিলেই পিছু ডাকলো বাহার, বেশ খোঁচা মেরেই বললো,“সেদিন আমাকে বলেছিলে না আমি আগাগোড়া পুরোটাই নকল মানুষ? আমি পুরোটা নকল মানুষ হলে, তুমিও পুরোটাই ভ্রম, অহি। তুমি অকল্পনীয় ভ্রম।”

অহি দাঁড়ালো, নরম চোখে তাকালো বাহারের দিকে। বিবশ হয়ে আচমকাই বলে উঠলো,

“ভ্রম আর নকলে মিলে গিয়ে ইতিহাস রটলে খারাপ হয় না, তাই না বাহার ভাই?”

বাহার উত্তর দিলো না। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না যেন। হেলতে দুলতে সে নিজের টেবিলের উপর বসলো। ভাতের

থালা থেকে খুব আয়েশে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে নিলো। অহি কেবল তাকিয়ে রইলো এক ধ্যানে। বাহার ভাই মানেই যেন এক আকাশ মুগ্ধতা।শোক পালনের আঁধার রাত্রির গভীরতায় যখন সবাই ঘুমে মগ্ন, নুরুল সওদাগর তখন নিজের মেয়ের কেবিনে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ-মুখ তার কাঠ কাঠ, শক্ত। সারাদিন কেইস নিয়ে ছুটাছুটি করে

এই মাত্রই হসপিটালে এসেছে সে। চিত্রা তখন আধো ঘুম, আধো জাগরণে। বাবাকে কেবিনের দরজায় দেখতেই আধো ঘুম কেটে গেলো তার।

মুনিয়া বেগম নিজের স্বামীকে দেখে ততটাও অবাক হলেন না, বরং স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,

“এখানে যে? এটা তো চেরির রুম না, এটা চিত্রার রুম।”খোঁচা মারার

জন্য ই যে কথাটা বলা সেটা বুঝতে বাকি রইলো না নুরুল সওদাগরের। কিন্তু সে স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন না, বরং চিত্রার দিকে তাকিয়ে অস্থির কণ্ঠে বললো,

“মহিনের মৃত্যুর আগে শেষ কলটা তোমার ফোন থেকে করা হয়েছিলো, চিত্রা।”রাত গভীর থেকে গভীর হলো, সাথে অনুভূতিদের ঝিমিয়ে থাকা অঘোষিত যুদ্ধ টা নিবিড় ভাবে

চলতেই থাকলো। ঘড়ির কাঁটায় তখন সময় একটা সাতচল্লিশ। চিত্রার কেবিনের ভেতর চিত্রা সহ আরও দু দু’টো মানুষও নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। নুরুল সওদাগরের কথা থামতেই বাহারের হুট করে আগমনে কথার স্রোত একটু ভিন্ন দিকে গেলেও অতঃপর তা আবার আগের জায়গাতেই এসে খুঁটি বাঁধলো। মুনিয়া বেগম স্বামীর দিকে বিষ্ময়

ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন কিয়ৎক্ষণ। অতঃপর খুব ধীরে, ছোটো কণ্ঠে বললেন,“কি বলছো, বুঝেশুনে বলছো তো?”

নুরুল সওদাগরের মুখ-চোখ তখনো কঠিন। কর্কশ কণ্ঠে সে জবাব দিলেন,

“প্রমাণ কথা বলছে, আমি না।”

মুনিয়া হতাশার শ্বাস ফেললেন। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থাকা চিত্রার

দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ক্ষীণ স্বরে স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন,

“চিত্রার জন্য এটা কি কোনো বিপদ ডেকে আনবে?”

“প্রমাণ যেহেতু চিত্রার বিরুদ্ধে তাই যেকোনো পদক্ষেপই নিতে হতে পারে আমাদের।”

“আপনার অযৌক্তিক প্রমাণকে একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলে যদি মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবেন, খুশি হবো। অন্তত

এতটুকু তো বুঝবো যে আপনারও ব্রেইন নামক কোনো বস্তু আছে যেটা যুক্তিও বুঝে।”

বাহারের কথায় তুমুল তাচ্ছিল্যের সুর। অথচ নুরুল সওদাগরের তাতে যেন কিছু যায় আসে নি। সে স্বাভাবিক ভাবেই বললো,

“আইন প্রমাণ চেনে।”“আর আপনি চেনেন মিথ্যা অহংকারে। কিসের আইন শেখাচ্ছেন আমাদের?

আপনার আইন কি এতই যুক্তি ছাড়া চালাচল করে যে, একটা মেয়ে যে রাতে অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছে সে মেয়ে কীভাবে আরেকজনকে খু*ন করার আগে-পিছে বা কোনো কিছুতে ছিলো?”

বাহারের প্রতিটি কথা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু নুরুল সওদাগরও দমে যাওয়ার পাত্র না। সে ইনিয়ে বিনিয়ে আরও

কিছু বলার চেষ্টা করতেই থামিয়ে দিলো মুনিয়া বেগম। মহিলাটা কেমন গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো,

“বড় আইনের কথা বলছো যে! অন্যদের বেলায় তোমার এত আইনের নিয়ম, নিজের বেলা আইন তোমার অন্ধ বুঝি! এ কেমন আইন!”এবার আর কোনো কথা বলার সুযোগ পেলেন না নুরুল সওদাগর বরং নিজের স্ত্রীর দিকে

ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন। এত গুলো বছর পর তার স্ত্রী যে তার দুর্বল জায়গায় হাত দিবে এটা যেন তার ধারণার বাহিরেই ছিলো। অবশ্য কথায় আছে না, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বিড়ালও সিংহ হয়ে উঠে আর মুনিয়া তো বুদ্ধিমতীই।

চিত্রা নিজের মা-বাবার কথা নীরব থেকে শুনে গেলো। এই ক্ষেত্রেই যেন তার তুমুল নীরবতা। বাবার

সামনে তার অনেক কিছু বলার থাকলেও বলা হয়ে উঠে না। কেনো এত সংশয়, দ্বিধা তা জানা নেই চিত্রার। সে কেবল এতটুকুই জানে, বাবা মানেই ধারালো তীর। যা খন্ড-বিখন্ড করে অষ্টাদশীর হৃদয়।

নুরুল সওদাগর যেন চোখ লুকিয়ে বাঁচার জন্য হুট করেই কেবিনের বাহিরে চলে গেলো। মুনিয়া বাঁকা হাসলো। যে মানুষ নিজেদের অতীত

ভুলে যায় অতিরিক্ত উড়বার জন্য তার ডানায় অতীতের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হয় নিজ দায়িত্বে। কিছু মানুষকে অতীত ভুলতে দেওয়া যাবে না।

বাবা যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো চিত্রা। কেমন ঝিমানো কণ্ঠে বললো,“আম্মু, আব্বু এমন করে কেনো আমার সাথে? আমার দোষ কোথায়?”

“তোমার দোষ আসলে না। দোষটা হলো গিয়ে আমার। আমি তোমার বাবার স্ত্রী হতে পেরেছি তবে প্রেমিকা না। তাই হয়তো কেবল স্ত্রীর কন্যাকে সে গ্রহণ করতে পারে নি।”

মায়ের কথায় ভ্রু কুঁচকালো চিত্রা। কথাটা যে তার বোধগম্য হয় নি সেটা স্ফূর্তিত হলো তার মুখমণ্ডলে। তবে বাহার বোধহয় আঁচ করলো

কিছুটা। তাই তো সে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লো,

“আপনার কথা’ই নাহয় মানলাম, আন্টি। স্ত্রীর সন্তান বলে চিত্রাকে আজ মানতে পারছে না চিত্রার বাবা। তবে তুহিনের ক্ষেত্রে তো মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা ভীষণ স্বাভাবিক। তখন স্ত্রী-প্রেমিকার ভেদাভেদ হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কেনো? এখানে অবশ্য ছেলে-মেয়ের বিভেদের

কথাও আমি বলবো না। কারণ মেয়ে অপছন্দ হলে চেরি আর অহির নিয়মের ক্ষেত্রেও একই হতো। হিসেবটা কেমন গোলমেলে না, আন্টি?”

বাহার ভীষণ চতুর ছেলে। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ হিমশিম খেলো মুনিয়া বেগম। কথা কাটানোর জন্য সে কেবিন ছেড়ে চেরিকে দেখার অজুহাতে বেরিয়ে

গেলো। বাহার হাসলো। সে জানতো এমন কিছুই হবে।কেবিন খালি হতেই বাহার এসে চিত্রার সামনে দাঁড়ালো। চিত্রারও ততক্ষণে দৃষ্টি গেলো বাহারের উপর। বাহারের শরীরে ডালিয়া রঙের টি-শার্ট যেটার বাহুর দিক দিয়ে ঘামে ভিজে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। উচ্চতা অনেক হলেও সুঠাম দেহী বলা যাবে না তাকে। বেশি ছিমছাম গড়ণের।

গায়ের রঙও তো আর তত ফর্সা নয়। একদম সাধারণ একজন পুরুষ। অথচ কতটা চুম্বকের মতন আকর্ষণ শক্তি লোকটার ভিতরে!

বাহার গলা পরিষ্কার করার মতন শব্দ করলো। অতঃপর বললো,

“নারী তুমি হও যদি দাস,
উপহাস হবে তোমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।”

হুট করে এই দু’লাইনের তাৎপর্য টুকু বোধগম্য হলো না চিত্রার। সে ভীষণ অবাক হলো। অবাক মিশ্রিত কণ্ঠেই বললো,“এটা কী ছিলো!”

“ধরতে পারো সাবধান বাণী। যা তোমার জন্য ছিলো। নিজের বাবাকে দেখে তুমি যখন মুখ চুপসে চুপ করে থাকো, দুনিয়ার সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাক্তি আমার কাছে তখন তোমাকে লাগে। তোমার প্রতি

বিরক্তে আমি কত রকমের ঢেঁকুর তুলি। তুমি এত বিরক্তিকর কেনো?”
বাহার ভাইয়ের মুখ-চোখ ভাঁজ করা কথার ধরণে তেতে উঠলো অষ্টাদশীর হৃদয়। অযাচিত আন্দোলন ঘোষণা করলো হৃদয় তোলপাড় করে। সে অসহ্য রকমের রাগ ঝেড়ে বললো,
“আমি বিরক্তকর? আমি? আপনি তো জলজ্যান্ত বিরক্তের কারখানা

আবার আসছে আমাকে বলতে। ভূতের মুখে রাম নাম।”“অথচ এই বিরক্তের কারখানাকে হৃদয় মাঝে পুষে রেখে প্রতিনিয়ত কতই না আনন্দ উৎসব করছো মেয়ে!”

চিত্রার কথা থেমে গেলো। আকাশচুম্বী রাগ ফুড়ুৎ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। লোকটা উচিৎ সময়ে এত উচিৎ কথা বলে কীভাবে? অথচ চিত্রা ঝগড়ার সময়ে সঠিক কথা টা

ভুলে যাওয়ার কারণে মাঝে মাঝেই ঝগড়ায় হেরে গিয়ে কেঁদে ফেলে।

“চুপ থাকলে তোমাকে খারাপ লাগে না, মেয়ে। তবে তোমার বাবার সামনে চুপ করে থাকাটা ভীষণ বাজে স্বভাব। বাবা-মাকে অবশ্যই সম্মান করা উচিৎ। তবে, যে মানুষ তোমাকে উঠতে-বসতে অসম্মান করে বুকের মাঝে আস্ত একটা রগরগে ঘাঁ তৈরী করে দিচ্ছে, তার

সামনে চুপ করে থাকাটা নেহাৎ ই পরাধীনতা। অথচ তোমার এখন মুক্ত হয়ে উড়ার সময়।”বাবাকে চিত্রা ভীষণ বেশিই ভালোবাসে, তাই হয়তো চেয়েও বাবার সামনে সে কঠিন কিছু বলতে পারে না। অথচ বাবা কত নির্দ্বিধায় না চিত্রাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে!

বাবার কথা মনে পড়লেই আকাশ-পাতাল আঁধার করে চিত্রার মন

খারাপ হয়। তাই কথা ঘুরানোর জন্য চিত্রা বললো,

“আচ্ছা বাহার ভাই, আপনার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছাড়বেন কবে?”

“যেদিন আর ভিতর পুড়বে না, সেদিন আর বাহিরও পুড়াবো না।”

“আপনারও তাহলে ভিতর পুড়ে?”

“কেনো মেয়ে, আমি কী মানুষ না? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই ভেতর

পুড়ে। কেউ প্রকাশ করে, আর কেউ গোপনে রাখে।”“বাহার ভাই, আপনি এত জটিল কেনো?”

“তুমি আমায় জটিল ভাবে গ্রহণ করেছো বলে।”

“জানেন বাহার ভাই, আপনি আমার কাছে ক্যাকটাস ফুলের মতন।”

“আর তুমি আমার কাছে অলকানন্দা কিংবা সন্ধ্যার রঙ্গনা।”

ইশ্, লোকটা যেন উত্তর তৈরী করেই এসেছে। এত বিব্রতকর কথা বলেও লোকটাকে বিব্রতবোধ করাতে না পেরে হতাশার শ্বাস ফেললো চিত্রা। হুট করেই তার মাথায় খেলে গেলো দুষ্টবুদ্ধি। কিটকিটে হেসে বললো,

“আপনি কি জানেন, অষ্টাদশী তার বুকের মাঝে আস্ত একটা বাহার ভাই পুষে রেখেছে।”

“ফুল প্রিয় অষ্টাদশীর কাঁটার প্রতি এত ঝোঁক বড়ই আশ্চর্যের। তুমি কি জানো মেয়ে,চলতি পথে যাদুকর ভালবাসা

প্রেমিক ডাকাতের মত

তোমাকে ছিনিয়ে নেবে

মৌসুমী বাতাসে উড়ে যাবে ভালবাসা

হৃদয়ের চোরা পথে

তুমি হারিয়ে যাবে

তুমি লুটপাট হয়ে যাবে

তুমি চৌচির হয়ে যাবে.....

গানটা শুনেছিলে মেয়ে? তুমি আমার মাঝে ডুবতে এসো না, হারিয়ে যাবে। কী লাভ নিজেকে হারানোর, নিষিদ্ধতে আসক্ততা কেনো, মেয়ে?”চিত্রা উত্তর দিলো না। এই বাহার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেও যেন বিশ্বযুদ্ধ জয় করার মতন আনন্দ পাওয়া যায়।

অনুভূতিরা মাঝে মাঝে এত মিষ্টি হয় কেনো?

বাহার পকেটে দু’হাত গুঁজে বের হতে নিলেই চিত্রা আনমনেই বলে উঠলো,

“আপনি আমার হুট করে বুকের বা’পাশ ব্যাথা, বাহার ভাই। আপনি আমার মন কেমনের রোগ। আপনি আমার বৃষ্টির দিনে ভিজে চুপচুপে সাদা শাড়ি। আপনি আমার শখ

বাগানের ক্যাকটাস ফুল। আপনি আমার সহজসরল অংকের স্যারের দেওয়া লাল কালিতে ফুটে উঠা কিঞ্চিৎ ভুল। আপনি খুব খারাপের বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু আপনি আমারই কেবল।”বাহার যেতে নিয়েও ফিরে তাকালো। হাসলো না, মুখ গম্ভীরও করলো না। কেবল ধীর কণ্ঠে বললো,

“আমি তোমার চায়ের কাপের নীল রাঙা বি*ষ। যা পান করলে তোমার মৃ*ত্যু নিশ্চিত, অথচ তুমি পান করতে মরিয়া। শুনো মেয়ে রঙ্গনা, প্রেম ভালো তবে তোমার প্রেমিক না।”ভাদ্র মাস শেষ। সময়টা ঠিক আশ্বিনের দ্বিতীয় দিন। দীর্ঘ নয় দিন পর চিত্রা পা রাখলো নিজের শখের বাড়িতে। রোগা-সোগা চোখ-মুখ। শরীর শুকিয়ে গেছে। গায়ের রঙটাও

কেমন হালকা মেটে রঙ ধরেছে। তবে এখন সে কিছুটা সুস্থ। স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটা চলা করতে পারছে। ইতিমধ্যে চেরিকে বাহিরের দেশে নেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় শেষের দিকে। চেরির কোনো উন্নতি দেখা দিচ্ছে না।চিত্রা বাড়িতে পা রাখতেই থম মেরে থাকা বাড়িটা উৎসবমুখর হয়ে উঠলো। কিঞ্চিৎ হৈচৈ, শোরগোল শোনা গেলো। কিন্তু

এরমধ্যেই ছাঁদ থেকে চিত্রাদের বাড়ির কাজের মেয়ে দোয়েলের চিৎকার ভেসে এলো। সবাই হুড়মুড় করে ছাঁদে যেতেই অবাকে হা হয়ে রইলো। চিত্রার রঙ্গনা, মৌসন্ধ্যা, পিচ ফুলসহ আরও অনেক গুলো ফুল গাছ মাটিতে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছেকৃত ভাবে কেউ এ কাজটা করেছে।সন্ধ্যার প্রকৃতি তখন বিষণ্ণ, সাথে বিষণ্ণ অষ্টাদশীর

হৃদয়। দুপুর হতে এ অব্দি সে কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে চোখ-মুখ প্রায় ফুলে যাওয়ার উপক্রম। তার জীবনের সবচেয়ে কোমল একটা অংশ হলো তার শখের বাগান। অথচ কেবল আজ না, প্রায় এ নিয়ে দুই বার তার সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। কে বা কারা এ কাজটা করে এটা বোধগম্য না কারোরই। কেবল চোখ মেলে দেখতে হয় শখ

বাগানের বিধ্বস্ততা। প্রথম যখন এই রকম ঘটনা ঘটলো তখন প্রকৃতিতে কেবল আষাঢ় মাস এসেছে। দিন রাত কেবল বর্ষণ ধারা আপন গতিতে ঝরে যায়।এমনই টানা দুই দিন বৃষ্টির পর ক্ষান্ত হলো প্রকৃতি। বাহার তখন ট্যুরে গিয়েছে। চিত্রারও শরীরে জ্বর। তাই আর বাগানের যত্ন নেওয়া হয় নি, অথচ দু'দিন পর প্রকৃতির ঝড়ের সাথে চিত্রার

শরীরের জ্বর কমতেই চিত্রা ছাঁদে গেলো, নিজের প্রিয় গাছ গুলোকে ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ছাঁদে উঠে সে হতভম্ব। বাগানের সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ গুলোর টব ভেঙে একাকার। বৃষ্টির পানিতে টবের পানি ধুয়েমুছে কাঁদায় মাখামাখি ছাঁদ। সেদিন চিত্রা পাগলের মতন কেঁদেছিল। সবাই বলেছে ঝড়ের কারণে হয়তো টব

গুলো পড়ে ভেঙে গিয়েছে, অথচ চিত্রা বিশ্বাস করে নি। মানে নি সে কথা। কারণ যে ফুলের টব গুলো ভেঙেছে সে গুলো নিচেই রাখা ছিলো।ওগুলো ঝড়ের বাতাসে পড়লে খুব বেশি হলে টব ফেঁটে যেতো, কিন্তু এমন বিশৃঙ্খল ভাবে ভাঙতো না। চিত্রার কান্না দেখে সেদিন বিকেলেই তুহিন অনেক গুলো ফুলের চারা এনে দিয়েছিল।

অতঃপর একটানা দু’দিন কান্নাকাটির পর চিত্রা সে ব্যাথা ভুলেছে। আজ আবার এত গুলো মাস পর একই ঘটনা ঘটলো। বাড়িতে এত গুলো মানুষ থাকা শর্তেও ফুলের টবের কি নির্মম অবস্থা!

ঘরের দরজায় তুমুল শব্দ হতেই ধ্যান ভাঙলো চিত্রার। চোখের অশ্রু ততক্ষণে বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে।

চিত্রা কাঠের দরজাটার দিকে দৃষ্টি দিলো। গভীর ভাবে বোঝার চেষ্টা করলো কে এসেছে। তন্মধ্যেই অহির ডাক ভেসে এলো,

“চিত্রা, দরজা খোল তো। দেখি, দরজা খোল।”অহি আপা হসপিটালেই ছিলেন সারাদিন, হয়তো এখন এসেছে। বাড়ির পরিস্থিতিও তো তত ভালো না, ঘরের দোর দিয়ে বসে থাকাটা

আদৌও মানানসই? চিত্রা জানে এ কাজটা বেমানান, তবুও সে কাজটা করেছে। প্রিয় কিছুর কিঞ্চিৎ ক্ষতিও যে ভেতরটা ভেঙে দেয়। হোক সেটা মানুষ কিংবা বস্তু।

চিত্রার ভাবনার মাঝেই বাহির থেকে অহির আবার ডাক ভেসে এলো,

“চিত্রা, খোল না দরজাটা।”

চিত্রা সারাদিনের অনশন ভাঙলো। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখার

প্রতিজ্ঞা টাও ঝিমিয়ে এলো। অলস শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ধীর গতিতে দরজা টা খুলে দিতেই মুখমন্ডলের সামনে দৃশ্যমান হলো অহি আপার নিষ্পাপ, সাধাসিধে চেহারাটা।চিত্রাকে দরজা খুলতে দেখেই বাড়ির সদস্যদের প্রাণে পানি এলো। একে একে চিত্রার মা, বড়মা ছুটে এলো। হুড়মুড় করে ঢুকে

পড়লো চিত্রার ঘরে। চিত্রা তখনও নিরুত্তর।

চিত্রার শ্যামলা রঙের কারণে অধিক কান্নার পরেও গালে লাল আভা দেখা দেয় নি। কিন্তু চোখ মুখে তখনও অশ্রুকনাদের আধিপত্য। চিত্রার মা মুনিয়া বেগম মেয়ের গালে হাত রাখলেন, খুব ধীর থেকে ধীর কণ্ঠে বললেন,

“কেঁদেছিস কেনো বোকা মেয়ে? তোর জন্য তোর তুহিন ভাইজান নাহয় আবারও চারাগাছ এনে দিবে। এমন কারণে কাঁদতে হয় নাকি?”মায়ের আদুরে আলাপে চিত্রা ঠোঁট ফুলালো, চোখ-মুখ আঁধার হয়ে এলো তার। এইতো, মনে হচ্ছে হয়তো এখনই কেঁদে দিবে। অহি হয়তো বুঝতে পারলো চিত্রার

অনুভূতির মতিগতি। তাই ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বললো,

“কাঁদিস না, কাঁদিস না, দাঁড়া। আমি তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি।”

চিত্রার কাঁদো কাঁদো চোখে-মুখে ভর করলো বিষ্ময়। অহি আপা তার জন্য কিছু এনেছে! অথচ অহি আপার আগে এসব ব্যাপারে কখনো হেলদোল দেখা যায় নি।চিত্রা যখন অধির আগ্রহে দরজার দিকে

তাকিয়ে রইলো অহি আপা মিনিট দুইয়ের মাঝেই চারটা ফুলের টব নিয়ে হাজির হলো। দু’টো টব দোয়েলের হাতে আর দু’টো তার নিজের হাতে। চিত্রা ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে আছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না তার সাথে হচ্ছে টা কি। এতটুকু বয়সে কী তারও মতিভ্রম হচ্ছে! নাহলে অহি আপার মতন মানুষ কিনা ফুলের টব এনেছে

নিজে যেচে, তাও আবার চিত্রার জন্য!

কেবল চিত্রা না, অবাক হলো উপস্থিত সবাই। অহি কখনোই বাড়িতে ঘটে চলা ঘটনার স্রোতে গা ভাসায় না। তাকে বরাবরই দেখা যাবে পড়ার টেবিলে কিংবা তার ঘরের বারান্দায়। অথচ আজ সে মেয়ে বোনের অশ্রু মুছাতে ফুলের টব এনেছে ভাবতেই সকলের

শরীরে কিঞ্চিৎ আনন্দের ধারা বয়ে গেলো।অহি সবার হতভম্ব মুখ খানার দিকে একবার চাইলো। মেঝো চাচী, বড়ো চাচী সকলের দৃষ্টিই তার দিকে নিবদ্ধ। এর কারণে সামান্য অস্বস্তিতে গা কাঁপলো অহির। সবার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বললো,

“আসলে বড় আপা দুপুরে কল দিয়ে বলেছিলো চিত্রার গাছ গুলো নাকি

ভেঙে গেছে। তাই ও নাকি দরজা আটকে বসে আছে, কান্নাকাটি করছে। তাই কয়েকটা চারাগাছ নার্সারি থেকে কিনে আনলাম। বাড়ির পরিস্থিতি এমনকি চিত্রার পরিস্থিতিও তত একটা ভালো নেই যে এসব নিতে পারবে। তাই নিয়ে এলাম।”সারাদিনের মন খারাপ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। চিত্রা বরাবরই অহি আপাকে পছন্দ করে

বেশি। অহি আপার দৃঢ়তা সম্পন্ন চালচলনটাই চিত্রার পছন্দের কারণ। কিন্তু অহি আপা গম্ভীর মুখো বলে তাদের ভাব এতটা জমে নি কখনোই। অথচ সেই অহি আপা ই আজ চিত্রার খুশির কথা ভাবছে। এটাই যেন চিত্রাকে রাজ্যের সুখ এনে দিলো।

চিত্রা ছুটে এলো অহির দিকে, খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো অহি

আপার ছোটোখাটো শরীরটা। বা’হাতটায় টান পড়তেই কেমন চিন চিনে ব্যাথা করে উঠলো। কিন্তু সে ব্যাথায় তোয়াক্কা করলো না চিত্রা। সব ব্যাথা ছাপিয়েই যেন আজ অহি আপার আগমন ঘটেছে।

চিত্রার পাগলামো দেখে উপস্থিত সবাই হাসলো। যাক, বাড়িটাতে এতদিনে প্রাণ ফিরলো। কেমন সতেজতায় ভরে গেলো চারপাশ।

আশ্বিন মাসে সচারাচর বৃষ্টির দেখা মেলে না। আকাশে কেবল তুলোর মতন মেঘেদের ছড়াছড়ি দেখা যায়। শরৎ এর নরম তুলতুলে আকাশ, আদুরে প্রকৃতি, সজীব গাছপালা দেখতেও ভালো লাগে। অথচ আজ আবহাওয়া শরৎ এর রূপে নেই। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে প্রকৃতি কিঞ্চিৎ সিক্ত। যে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে চিত্রার শরীরের ঢিলেঢালা জামাটাও।

জামার জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির ফোঁটার চিহ্ন পরিলক্ষিত। অথচ চিত্রার সেখানে ধ্যানই নেই। সে ফুলের টবে নতুন মাটি চেপে চেপে দিতে ব্যস্ত।“এই মেয়ে, শুনলাম আজ নাকি প্রচুর কেঁদেছো?”

হুট করে এমন ডাকে ভীত হলো চিত্রা। ডান হাতের মুঠোয় থাকা মাটি গুলোকে আরেকটু শক্ত করে চেপে ধরে কেঁপে উঠলো। কিন্তু কণ্ঠের

মালিককে চিনতে তার সামান্য অসুবিধা হলো না। সে অবাক উত্তর দিলো,

“বাহার ভাই, কোথায় ছিলেন কাল থেকে এ অব্দি?”

কালো টি-শার্ট টার গলার দিকটা টানতে টানতে বাহার উত্তর দিলো,

“পার্সোনাল কাজ।”

“কি কাজ, বাহার ভাই?”

চিত্রার প্রশ্নে বাহার ভ্রু কুঁচকালো, বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো,“পার্সোনাল কাজ মানে বুঝো না? যেখানে ব্যাক্তিগত শব্দটা উল্লেখ্য আছে সেখানে সেটার বিশ্লেষণ চাওয়া টা বেশ বোকামি। অথচ তোমায় আমি বুদ্ধিমতী ভাবি।”

বাহারের কথার ধরণে আবারও মনের কোণে মেঘ জমলো চিত্রার।

মুখটা অপমানে ছোটো হয়ে গেলো। সে বেশ শুকনো কণ্ঠে উত্তর দিলো,

“দুঃখীত।”

“তা আজ নাকি অনেক চারাগাছ পেয়েছো?”বাহার যে পরিস্থিতি ঘুরানোর চেষ্টা করলো তা বুঝতে বাকি রইলো না চিত্রার। সেও মাথা নাড়িয়ে বললো,

“হ্যাঁ বাহার ভাই, জানেন আমার সব সুন্দর ফুলের টব গুলো কে যেন ভেঙে ফেলেছে।”

“কে ভেঙেছে বলো তো? তোমার কাছের কেউ না তো?”

বাহারের প্রশ্নাত্মক বাক্যে অবাক হলো চিত্রা। তার কাছের কেউ ভেঙেছে মানে? বাহার ভাই কী বলতে চাইলো? তবে কী বাহার ভাই জানে, কে একাজ খানা করেছে?

ভাবুক চিত্রার মাথায় চিন্তারা দলা পাকিয়ে গেলো। হাঁসফাঁস করে উঠলো হৃদয় কোণ। অধৈর্য্য কণ্ঠে তাই সে জিজ্ঞেস করলো,“আমার কাছের কেউ? কিন্তু কেনো বাহার ভাই? আর কেই বা করেছে?”

চিত্রার প্রশ্নে বাহার ঠোঁট উল্টিয়ে বুঝালো যে এর উত্তর তার জানা নেই। হতাশার দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে

এলো চিত্রার বুক চিরে। মন খারাপ করে বললো,

“বাহার ভাই, রঙ্গন ফুলের গাছটাও ভেঙে গেছে।”

“অলকানন্দা তো আছে, তোমায় নাহয় অলকানন্দা বলবো। এবার বলো তো, নতুন চারাগাছ গুলো কোন কোন ফুলের?”“অলকানন্দা, হাসনাহেনা,সন্ধ্যা মালতী আর শ্বেত চন্দন।”

“বাহ্,অনেক তো। আর কিছু চাই?”
বাহারের প্রশ্নে চিত্রার দুষ্টবুদ্ধি গুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। টগবগ করে উঠলো ডানা ঝাপটিয়ে। চিত্রা বাহারের দিকে ঘুরে, বাহারকে পুরো পা থেকে মাথা অব্দি দেখে কুটিল হেসে বললো,
“হ্যাঁ চাই তো, আপনাকে চাই।”
বাহার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। খুব গভীর ভাবে

কি যেন ভাবলো অতঃপর আনমনে বললো,

“আমায় চেও না অলকানন্দা, আমায় চাইলে বড়জোর প্রাপ্তির খাতায় বিরাট এক শূণ্যতার হাহাকার মিলবে, আমায় মিলবে না।”বাহার দাঁড়ালো না আর। কাঁধের ব্যাগটা শক্ত করে ধরে নিজের ঘরে চলে গেলো। চিত্রা কেবল সে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

মানুষটাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে মানুষটা কোথায় উধাও হয়ে যায়!রাত দশটা। অনেক গুলো দিন পর সওদাগর বাড়িতে রাতের খাবারের সময় নক্ষত্রদের মেলা বসলো। বড় চাচী, বড় চাচা, মুনিয়া বেগম, নুরুল সওদাগর, তুহিন, চাঁদনী, মাহতাব,লতা বেগম, চিত্রার ফুপি, অহি, চিত্রা, দিশান, তৃষান সব খাবার টেবিলে অবস্থিত। মুনিয়া

বেগম তার বড় জা এবং চিত্রার ফুপি অবশ্য খাবার বেড়ে দিচ্ছে আর বাকিরা খাবার খাওয়ায় মগ্ন।

এর মাঝেই সিঁড়ি বেয়ে বাহারকে নিচে আসতে দেখে ডাক দিলো নুরুল সওদাগর,"এই ছেলে, দাঁড়াও। কথা আছে।"

যেহেতু তাদের মেইন দরজার বাহিরে ছাঁদের সিঁড়ি, সেহেতু সবাই বাহারকে তেমন খেয়াল করে নি,

নুরুল সওদাগরের ডাকেই সবার দৃষ্টি বাহারের দিকে গেলো। বাহারও হয়তো প্রস্তুত ছিলো না হুট করে ডাকের। তাও আবার নুরুল সওদাগর এমন অনাকাঙ্খিত সময় ডাকবে সেটা যেন ভাবনার বাহিরেই।

থমথমে পরিবেশে সকলের অবাক দৃষ্টির দিকে চোখ বোলালো নুরুল সওদাগর অতঃপর ভাত নাড়তে

নাড়তে, বেশ ধীর কণ্ঠে বললো,“ভেতরে এসো, অতদূর থাকলে কথা বলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবো না।”

“দূরের মানুষ দূরে থাকাই ভালো। আপনি বলুন, আমি শুনছি।”

বরাবরের মতনই বাহারের কাঠখোট্টা জবাবে বিরক্ত হলেন নুরুল সওদাগর। হাতে নেওয়া ভাতের লোকমা টা আবার থালায় রেখে

দিলো সে। কপাল কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“আমাদের সন্দেহের তালিকায় কিন্তু তুমিও আছো। তাই এমন কিছু করো না যেন সন্দেহ প্রখর হয়।”

“এটা তো স্বাভাবিক কথাই। যে লোক নিজের মেয়েকে সন্দেহের তালিকায় রাখতে পারে, সে যে আমাকেও রাখবে এটা আমি জানি। নতুন কোনো খবর থাকলে

বলেন।”এমন একটা খবর পাওয়ার পর, অন্য কেউ হলে ঘাম ছুটে যেতো হয়তো অথচ এ ছেলের কেমন গা ছাড়া ভাব। বিরক্তিতে তেঁতো হয়ে উঠলো নুরুল সওদাগরের অনুভূতি। সে আর কথা না দমিয়ে রেখে বেশ ধমকে বললো, “কাল তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তুমি কী জানো আজ অহিদের উপর এসিড নিক্ষেপ করা বাইকের ছেলে

দুটোরই লা*শ পাওয়া গেছে? কাল তুমি শহরে ছিলে না। আজ শহরের বাহিরে খুব পুরোনো একটা বাড়ি থেকে ছেলে দু'টোকে পাওয়া গিয়েছে। মহিন যেদিন খু*ন হলো সেদিনও তোমার খোঁজখবর ছিলো না। হিসেব গুলো কেমন একে একে মিলে যাচ্ছে খেয়াল করেছো?"অহির সবে মাত্র মুখে দেওয়া ভাতের লোকমাটা গলায় আটকে গেলো

নুরুল সওদাগরের কথা শুনে। নাকে-মুখে খাবার উঠে বাজে অবস্থা। নুরুল সওদাগরের বলা কথাটা সবাইকেই যেন অবাক করে তুললো। শেষমেশ কিনা লোকটা বাহারের দিকেও আঙুল তুললো?

সবাই যখন ব্যাতিব্যস্ত হয়ে অহির দিকে পানি তুলে দিলো বাহার তখন হো হো করে হেসে উঠলো। একটা ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে বললো,

“পুলিশদের কি কাজই এটা? অপরাধী না পেলে এরে ওরে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া? এ কেমন বিচার! যাই হোক, আপনার দরকারী কথা কি শেষ? আমি এবার যাই।”নুরুল সওদাগর ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইলো। এ ছেলের মনে প্রাণে কী একটুও ভয় নেই? এমন একটা কথা শোনার পরও একটা মানুষ এত স্বাভাবিক কী করে

থাকে? ভাবতেই হতাশার একটা শ্বাস বেরিয়ে এলো।

নুরুল সওদাগরের চুপ থাকা দেখে আফজাল সওদাগর বেশ শীতল কণ্ঠে বাহারকে বললো,

“যেহেতু আইনের চোখ তোমার দিকে পড়েছে একটু সাবধানে থেকো।”

“আচ্ছা! সাবধানে না থাকলে কী হবে? কেঁচো খুঁজতে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে আসবে নাকি?”

বাহারের কথার ধরণে সবাই হতভম্ব চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বাহার অবশ্য তার ধার ধারলো না বরং খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটতে হাঁটতে মেইন গেইট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেলো। রাতের রাস্তা আবার তার খুব প্রিয়।

নিশ্চুপ হয়ে সবাই কেবল বাহারের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। নিরবতাকে ভেঙে আফজাল সওদাগর কথাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন,“আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় নুরু, ঐ ছেলে দুটিকে কে মে*রেছে?”

“কোনো ক্লু পাচ্ছি না ভাইজান। যদি মহিন ওদের দিয়ে কাজটা করায় তাহলে মহিন তো মা*রাই গেছে,

ওদের খোঁজ জানলো কে? আর খুব সম্ভবত মহিনকে যে মেরেছে সেই একাজ করেছে।”

“তোমরা কী সত্যি সত্যি বাহারকে সন্দেহ করছো?”

“হ্যাঁ ভাইজান, সন্দেহের খাতায় তো সবার নামই রাখতে হয়। আর কেসটা এত জটিল হচ্ছে যে না রেখে উপায় নেই।”

আফজাল সওদাগর হতাশার একটা শ্বাস ফেললেন। কি যেন বলতে না পারায় ছটফট ভাব ফুটে উঠলো মুখে। কেউ খেয়াল করলো কি না কে জানে!মাঝে অতিবাহিত হলো আরও দিন দুই। আজ চেরিরা চলে যাবে দেশ ছেড়ে। রাত সাড়ে নয়টার ফ্লাইট। সওদাগর বাড়িতে ঘোর শোকের ছায়া। বাচ্চাটার জ্ঞান ফিরলে কেমন তাকিয়ে থাকে আবার

ঘুমের ঔষুধের জোরে ঘুমিয়ে যায়। কোনো কথা বলে না, কেমন জড় পদার্থ। অথচ এই মেয়ের হাসিতেই বাড়িতে মুক্তা ঝরতো।

বাড়ির ড্রয়িং রুমে সকলের নিস্তব্ধতা যেন হাহাকার করে উঠছে। অবনী বেগম কেবল ধীর স্বরে কেঁদে যাচ্ছেন। অবশেষে অনবরত কান্না থামানোর জন্য ধমক দিলেন মুনিয়া বেগম। শক্ত কণ্ঠে বললেন,

“এত কান্নাকাটি করছো যে, সেই ভিনদেশে গিয়ে শক্ত থাকবে কীভাবে? তোমার সাথে কিন্তু কেউ থাকবে না। এখন থেকেই তো শক্ত হতে হবে।”“আপনি আর সন্তানের মর্ম কী বুঝবেন! পরগাছা লাগিয়েছেন।”

বজ্রপাত হলেও যেন এমন ভয়ঙ্কর নিশ্চুপতা হতো না যতটা এই কথার প্রভাবে হয়েছে। অপ্রত্যাশিত কথাটা

যেন বাড়ির গহীনে রোপন করে রাখা অনেক বছরের ভিত্তিটাকে ক্ষাণিক নাড়িয়ে দিলো। উপস্থিত সবাই বিস্ফো*রিত নয়নে অবনীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কথাদের তীক্ষ্ণ আন্দোলনেই যেন চুপ করে গেলো সবাই। অনেকের কাছে বোধগম্য হলো না অবনী কি বলেছে, আবার অনেকে মানতে পারছে না অবনী এমন কিছু বলেছে।

আফজাল সওদাগরের স্ত্রী রোজা সওদাগর ভয়ঙ্কর এক ধমক দিয়ে উঠলেন ছোট জা'কে। চোখ রাঙিয়ে বললেন,

"আক্কেল জ্ঞান কী শোকে খেয়ে ফেলেছিস? কোথায় কাকে কী বলতে হবে তা কী ভুলেই গেলি? পুরোনো কাসুন্দি ঘাটলে কেবল গন্ধ ছাড়া কিছুই বের হবে না। অহির মা, তুই নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিস

না। তবে অতীতের অনেক কিছু বের হবে।”অবনী হয়তো নিজেও প্রস্তুত ছিলো না এমন একটা কথা বলার জন্য। অতিরিক্ত শোকে আর রাগে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। তখন তারা কী বলে করে তা নিজেরাও জানে না। তাই অতিরিক্ত রাগে বা শোকের বলা কথার আঘাতে মানুষ অনেক মানুষ হারায়।

অবনী নিজের ভুল বুঝতে পেরে থতমত খেয়ে গেলো। আমতা-আমতা কণ্ঠে মুনিয়া বেগমের উদ্দেশ্যে বললো,

“ছোটো আপা, আপনাকে আসলে ওভাবে কথাটা বলতে চাই নি। আসলে সন্তানের চিন্তায় মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। বুঝেনই তো।”“না অবনী, আমি আসলে বুঝি

না সেসব। পরগাছা লাগিয়েছি কিনা।”

মুনিয়া বেগমের খোঁচা মারা কথাটা ঠিক গায়ে লেগে গেলো অবনীর। মুখ ছোটো হয়ে এলো তার। বাড়ির ছোটো সদস্য, তুহিন, তৃষান,দিশান,চিত্রা, অহি কেবল দেখে গেলো এ নীরব যুদ্ধ। তারা হয়তো যুদ্ধের ভাষা কিছুই বুঝলো না, কিন্তু এতটুকু তারা ঠিকই জানে যে মুনিয়া

আর অবনী নামের নারী দু’জন সবসময় একে অপরের বিপরীতে শীতল একটা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অন্যান্য সময় হলে এ যুদ্ধের কোনো কিছুতেই তারা আগ্রহ প্রকাশ করতো না কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একদমই ভিন্ন। আজকে কথার ভাষা গুলো কেমন যেন বিষাক্ত, তিক্ত কিছু দ্বারা মোড়ানো।

এই শীতল যুদ্ধকে স্থগিত করতে রোজা সওদাগর গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন,“বাচ্চাদের সামনে তোদের কথা গুলো বেমানান, এতটুকু বোঝার ক্ষমতা তোদের থাকা উচিৎ।”

“বড়ো চাচী, ছোটো চাচী অমন কথা বললো কেনো? আম্মু কেনো বুঝবে না সন্তানের কষ্ট? আম্মুর আমরা

আছি না? এসব কেনো বললো ছোটো চাচী?”

ঠিক এ ভয়টাই পেয়েছিলো ঘরের বড় সদস্য রা। চিত্রার প্রশ্নে তাদের ভেতর ভয়ের দানা গুলো কেমন শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে গেলো। নুরুল সওদাগর ধমকে উঠলেন মেয়েকে,“এই তুমি বড়োদের মাঝে কথা বলছো কেন? তুমি কখনো ঠিক হবে না, তাই না?”

“বড়রা ছোটোদের মাঝে এমন অহেতুক কথা বলতে পারলে, ছোটোদেরও সে কথার বিশ্লেষণ চাওয়ার অধিকার আছে, আব্বু। আপনি ধমকটা সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন নি বলে আজ মানুষ এসব কথা বলার সুযোগ পেয়েছে।”

তুহিন সবসময়ই গম্ভীর ছেলে। কিন্তু সঠিক জায়গায় সঠিক কথা বলতে

সে ভুলে না। বোনকে প্রচুর ভালোবসে কিনা।

নুরুল সওদাগরের ধমকে চিত্রার চোখে জলেরা অবাধ্য হলো। টইটুম্বুর হয়ে ঘর বসালো চোখের ভেতরের আস্তরণে। ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না এলো। বাবা সবাইকে কত ভালোবাসে, অথচ তার বেলাতেই এসে এতটা নিষ্ঠুর হয়ে যায় কেনো!

তুহিনের কথা যে অবনী বেগমের তেমন ভালো লাগে নি তা অবনী বেগমের মুখ চোখের ভাব দেখেই বোঝা গেলো। সে মুখটাকে পাংশুটে বর্ণ করে তুহিনের উদ্দেশ্যে বললো,“ভুল মানুষ মাত্রই হয়, তুহিন। তাই বলে বড়দের এভাবে বলা উচিৎ না। তোমার মতন ছেলের কাছে অন্তত এসব আশা করা যায় না।”

“বড়রা যদি নিজেদের সীমাবদ্ধতা ভুলে যায় তবে এসব হবেই চাচী। আপনার জন্য এ বাড়ির ইতিহাস টা ভীষণ আঁধার। তাই আপনার এসব অসামঞ্জস্য কথা না বললেই খুশি হবো। সময়ে ভদ্র মানুষ কিন্তু আদব ভুলে বেয়াদব হয়ে যায়।”অবনী বেগম হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন তুহিনের দিকে। তুহিনের মতন ঠান্ডা ছেলে কিনা তাকে এসব

বলেছে? অপমানে, অপমানে শিউরে উঠলেন সে। নুরুল সওদাগরের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন,

“আপনার সন্তান আমার সাথে এমন আচরণ করছে, কিছু বলবেন?”

নুরুল সওদাগর বরাবরই ছেলের সাথে তর্কাতর্কিতে কম যান কারণ সে তার ছেলেকে জানে। ছেলে তার অনেক ভদ্র কিন্তু মা-বোনের প্রতি

বেশি পজিটিভ। সেখানে তার এই সত্তার উপর কেউ আঁচর কাটলে সে হিংস্র হয়ে যায়। তবুও নুরুল সওদাগর ডাক দিলেন ছেলেকে, রাশভারী কণ্ঠে বললেন,

“তুহিন, থামো। তোমার চাচী হন উনি। সম্মান দেও তাকে। বড়দের সাথে অভদ্রতা তোমায় শিখাই নি কিন্তু।”

তুহিন সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সোফার সামনে সেন্টার টেবিলের উপর থাকা ফুলদানী টা আঁছাড় মেরে ভেঙে ফেললো। হুট করেই শান্ত তুহিন রাগী হয়ে উঠলো। মুখ চোখে যেন অগ্নি বর্ষন হচ্ছে। গলার রগ টানটান হয়ে ফুলে গেছে। সে সিংহের মতন গর্জন দিয়ে উঠে বললো,“আপনি যা শিখিয়েছেন, তা সমাজে দেখালে আপনার মুখ থাকবে

তো? আর কত? বলবেন, আর কত? আপনাদের জন্য আমরা হীনমন্যতায় ভুগী। লজ্জা হয় না আপনাদের? আবার আমার বোনকে নিয়ে আপনি কথা বলেন। আপনার মুখে ওর নামটাও বেমানান।”

কথা শেষ করেই ধপাধপ পা ফেলে তুহিন নিজের রুমে চলে গেলো। হুট করেই ড্রয়িংরুমের এমন বিধ্বস্ততায় অবাক সবাই।

রোজা সওদাগর মুখ বাঁকিয়ে উঠলেন। বিরক্ত স্বরে বললেন,“অহির মা, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না, তুই তার প্রমাণ। তুহিনের মতন ঠান্ডা ছেলেটাকেও রাগিয়ে দিয়েছিস। তোর জন্য আমার ছোটো দেবরটা দেশমুখী হয় না। সংসার থাকতেও বৈরাগী সে। তোর জন্য অহি মেয়েটা আজ এমন নিস্তব্ধ। অথচ তুই মানুষ হইলি না।

সংসারটা খেলি। আমার সোনার সংসারে হাত দিয়েছিস।”অবনী আঁচল মুখে চেপে কেঁদে দিলো। আজ অনেকের অনেক কথায় যেনো কেমন ভয়ঙ্কর অতীতের আভাস দিলো। হতভম্ব মানুষ জন কেবল দেখে গেলো এই কান্ড। তাদেরকে আরেকটু অবাক করে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো বিধ্বস্ত বাহার। যার মাথা ফেটে র*ক্ত বেরিয়েছে, টি-

শার্টটাও ছিঁড়ে গিয়েছে। ডান হাতের কনুইয়ের দিকে ছিলে আছে।বিধ্বস্ত এই বাহারকে দেখার পর সবার ভেতর উত্তেজনারা পাখা ঝাপ্টানো শুরু করেছে ক্রমাগত। আজ বছর এক তো হতে চললো মানুষটাকে সবাই দেখছে, অথচ এমন রূপ কখনোই দেখা হয় নি। এ জন্য হয়তো অবাক ভাবটা বেশি।

বাহারকে দেখে সবার প্রথম মুনিয়া বেগমই দৌড়ে এলেন। ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,

“বাবা,কী হয়েছে তোমার? এত ব্যাথা পেয়েছো কীভাবে? ইশ, আসো, সোফায় এসে বসো।”

বাহার দ্বিমত পোষণ করলো না বরং বেশ বাধ্য ছেলের মতন সোফায় গিয়ে বসলো। সে সোফায় বসতেই সম্বিৎ ফিরে পেলো সবাই, অতঃপর

শুরু হলো হম্বিতম্বি। চিত্রা বাহারের বরাবর সোফাতেই বসে ছিলো। সে উঠে গেলো না, উৎকণ্ঠিত হলো না, কেবল নিশ্চুপ হয়ে দেখলো বাহারকে। এমন বাহারকে কখনো দেখে নি সে হয়তো আজ তাই মানতে পারছে না সে দশা।অহি ঠান্ডা শরবত এনে দিলো, চিত্রার ফুপি দুধের মাঝে হলুদ দিয়ে নিয়ে এলো, মুনিয়া বেগম তোয়ালে

ভিজিয়ে নিয়ে এলো। অথচ বাহার সটান সোজা হয়ে বসে রইলো। কোনো হেলদোল করলো না। ব্যাথার মুখ কুঁচকালো না। কিন্তু তার ক্ষত গুলো দেখলে যেকেউ বুঝবে ব্যাথার গভীরতাটা ঠিক কতটুকু। সবার এত অস্থিরতায় বাহার নিবিড় রইলো। নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করলো যেন সবটা। সাথে দু

একবার পলক ঝাপ্টে দেখে নিলো চিত্রাকেও।

সবার ব্যস্ততার মাঝে গম্ভীর নুরুল সওদাগরের কণ্ঠ ভেসে এলো, রাশভারী কণ্ঠে সে বললো,

“মারামারি করেছো? গুন্ডামী করার গুণটাও যে তোমার মাঝে আছে, জানা ছিলো না।”

এমন তীক্ষ্ণ কথার পরিবর্তে বাহার মলিন হাসলো। ক্ষীণ স্বরে

বললো,“বখাটের খাতায় যার নাম জ্বলজ্বল করে, তার বখাটে গুণ থাকবে না সেটা ভাবলেন কীভাবে?”

নুরুল সওদাগর হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু তাকে চুপ করিয়ে দিলো চিত্রা। খুব ভদ্রতার সাথে সে বললো,

“আব্বু, থামুন। ক্ষত যার এমনেতেই আছে তার ক্ষত বাড়ানোর কী প্রয়োজন? অনেক তো ক্ষত

করলেন। মাঝে মাঝে প্রলেপ লাগালেও পারেন।”চিত্রা নামের মেয়েটির মুখে যে এমন কথা উচ্চারিত হবে তা সবারই ভাবনার বাহিরে ছিলো। যার জন্য উপস্থিত সবাই হতবিহ্বল। দৃষ্টি চিত্রাতে নিবদ্ধ। আজ যেন একের পর এক চমকে তাজ্জব সওদাগর বাড়ি। হুট করেই বাড়ির মানুষ গুলো যেন বড্ড অপরিচিত হয়ে উঠেছে। এতটা

অপরিচিত তারা হয়তো কখনোই ছিলো না। উপস্থিত বিস্মিত সব চেহারার মাঝে কেবল একজনের মুখে চাপা হাসির রেখা দেখা দিলো। যে মানুষ চিত্রাকে ঘাত-প্রতিঘাতের বাণী শুনিয়েছিলো।পর পর ছেলে ও মেয়ের এমন উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিমায় নুরুল সওদাগরও যেন কথা বলতে ভুলে গেলেন। মেয়ের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নিরুত্তর। আশপাশ

হাতরে যখন ভাঁটা পড়লো শব্দ গুচ্ছের সমুদ্রে, তিনি নতজানু হয়ে প্রস্থান নিলেন। সে যেন দেখলেন, মিছে ক্ষমতার আস্ফালন এখন আর চলবে না। ভ্রমের কার্তুজ ভেঙে পড়ছে অনবরত।নুরুল সওদাগর চলে যেতেই সকলের ভেতর থাকা টান টান উত্তেজনারাও মিইয়ে এলো। বুক ভরে শ্বাস নিলো সবাই। তারা ভেবেছে এই হয়তো নুরুল

সওদাগরের বাজখাঁই গলা ফেঁটে পরবে। এই হয়তো ছোট্টো চিত্রা পিষে যাবে নুরুল সওদাগরের কথার তীক্ষ্ণতায়। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। রুদ্ধশ্বাস সময়ের পরিসমাপ্তি হলো। সবাই আবার ধ্যান দিলো বাহারের দিকে। ছেলেটাকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে! মুনিয়া বেগমের ভীষণ মায়া হলো। ছেলেটার চুল

গুলোতে হাত বুলিয়ে দিলো, ধীর কণ্ঠে শুধালো,

“বাবা, তোমায় যে বড় ক্লান্ত লাগছে! ঠিক কী হয়েছে, বাবা?”

বাহার সে প্রশ্নের উত্তর দিলো না। বরং কেমন কণ্ঠে যেন বললো,

“আমায় আগে একটু ভাত দিবেন আন্টি? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।”

কণ্ঠটা কেমন অসহায় শুনালো। কেবল পেটের ক্ষুধা না, মনে হলো

এ যেন কত বছরের না পাওয়ার হাহাকার। বাহারের কণ্ঠে আজ অসহায়ত্ব! খেতে চাওয়ার হাহাকার! মুনিয়া বেগম সাথে সাথে ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। প্লেট ভরে ভাত নিয়ে এলেন। তার জীবনে এমন নিঠুর আবদার যেন সে আর শুনে নি। ‘একটু ভাত দিবেন’ কথাটার মাঝে যেন কিছু একটা ছিলো যা

নাড়িয়ে দিলো সকলের অন্তরের অন্তস্তল।

ভাত আনতেই কোনো বাক্যব্যয় না করেই হাত ধুয়ে বাহার খাওয়া শুরু করলো। খুব মন দিয়ে সে খাবার খেলো। এতদিনের মাঝে কখনো বাহারকে এমন ভাবে খেতে দেখে নি কেউ। বরং হয়েছে উল্টোটা। কত সময় দেখা যেতো বাহারের পড়ার টেবিলে উন্মুক্ত রাখা খাবারের

থাল যার এক বিন্দু খাবার নড়চড় হয় নি। কত কত সময় বাহার খাবারের প্লেট ফিরিয়ে দিতো। খাবারের প্রতি তার বড্ড অনীহা। অথচ সে বাহার আজ তৃপ্তি করে খাচ্ছে।

মায়া হলো লতা বেগমেরও। কাঠখোট্টা মহিলাটাও আদুরে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,“বাবা, সারাদিন খাও নি তাই না?”

বাহার খেতে খেতেই খুব স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিলো,

“না আন্টি, আসলে পকেটে টাকা ছিলো না। মাস শেষ তো, টিউশনির টাকাও শেষ। বেকার মানুষের বেঁচে থাকাটাই তো যুদ্ধ আন্টি। সে যুদ্ধে আমাদের ভাত না খেয়ে কতগুলো দিন কাটানোর গল্প থাকে, ফুটপাতে রাত কাটানোর গল্প থাকে, প্রিয় মানুষ হারানোর গল্প থাকে, আপন

মানুষদের আবদার পূরণ করতে না পারার গল্প থাকে, সাথে গল্প থাকে আমাদের বখাটে হওয়ার। দারিদ্রতা এমন একটা রোগ যা মানুষকে বেহায়া করে দেয়। আর বেকারত্ব এমন একটা অভিশাপ, যা মানুষকে লজ্জাহীন করে দেয়। অথচ প্রতিনিয়ত আমাদের বাঁচতে হয় লজ্জায়, লজ্জায় হীনমন্যতায়। সিগারেটের ধোঁয়া দেখে মানুষ ঠাট্টা

করে বলে বেকারের বিলাসিতা, কেবল ঐ নিকোটিন জানে কত হাহাকার উড়িয়ে দেই আমারা সেই ধোঁয়ায়। মানুষ তো শা*লা বেঈমান, নিকোটিন অন্তত সেটা না।”

কথা শেষ, সাথে খাওয়া শেষ। সবাই কেবল নিরব শ্রোতা। বাহার ছেলেটা এত কথা বলতে জানে এটা কেউ জানতোই না। এক বাক্য থেকে দু বাক্যে কোনো কথা তার গিয়েছে

কিনা সন্দেহ। আর আজ সে ছেলে কিনা বেকারত্বের হাহাকার পাঠ করলো! অথচ এতদিন সবাই ভাবতো বাহার মানেই ভবঘুরে, ডোন্ট কেয়ার ভাবের ব্যাক্তি। ব্যাথা, আঘাত যাকে ছুঁতে পারে না।খাবার শেষ হতেই অহি প্লেট নিয়ে রান্নাঘরে রেখে এলো। বাহার হেলান দিয়ে বসলো সোফায়। মুনিয়া বেগমও বসলেন বাহারের সাথে।

বাহারের দিকে প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

“এবার বলো তো, ঠিক কী হয়েছে? তোমায় তো কখনো মারামারি করতে দেখি নি। তবে আজ!”

বাহার ছোট্টো শ্বাস ফেললো। ক্ষীণ স্বরে বললো,

“আমাদের ভার্সিটির মাঝে অতিরিক্ত রাজনীতির চর্চা। বর্তমানে যেই ছাত্রলীগ নেতা আছেন, তিনি বেশ

উশৃংখল। তারই উশৃংখল কাজে প্রতিবাদ করাতেই নেতার চামচারা ক্ষ্যাপে যায়। অতঃপর শুরু হয় ধস্তাধস্তি।”

সবাই আফসোসের দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বর্তমানে পড়াশোনার জায়গা গুলোও হয়তো ব্যবসায়ের জায়গা নাহয় রাজনীতি হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে কথা বললেই তোমার ধ্বংস নিশ্চিত। তবে কী বাহার পা

ফেললো সেই ধ্বংসের পথে?রাত সাড়ে আটটা। সওদাগর বাড়ির প্রায় সব সদস্য দাঁড়িয়ে আছে বিমানবন্দরে। আর কিছুক্ষণ পর তাদের বাড়ির ছোটো হাসির জাদুকরটা পথ ধরবে ঐ স্বচ্ছ আকাশ পানে। আবার সুস্থ হয়ে সে ফিরবে কিনা তা জানা নেই কারো। কেবল তারা বুকে এক রাশ আশা পুষে সৃষ্টিকর্তার নিকট করুন প্রার্থনা

তুলে দিয়েছে। বাচ্চাটা ফিরে আসুক। বাচ্চা টা বাঁচুক, হাসুক। আরেক দফা কান্নার রোল পরলো বিমানবন্দরে। এম্বুলেন্স থেকে ছোটো চেরির দেহটা যখন নামানো হয়, হাউমাউ করে উঠে সবাই। মেয়েটা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দু নয়ন ভরে দেখলো সে বাড়ির সদস্যদের। কত কিছু যেন বলার ছিলো বাচ্চাটার, অথচ ভাগ্যের

নির্মমতায় বলা হলো না কত কিছু। কেবল দেখে গেলো সবাইকে। বাচ্চাটার সুস্থ চোখটা দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। বাচ্চাটাও যেন বুঝলো তার অনিশ্চিত ভবিতব্যের কথা। বাচ্চার কান্না দেখে শক্ত, সামর্থ্য মানুষ গুলোও শক্ত রইলো না। কেমন পাংশুটে হয়ে এলো সকলের মুখশ্রী। সবচেয়ে বেশি চিৎকার শোনা গেলো চিত্রার।

চেরিকে ছোটো বেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করার কাজটা যেন অগোছালো চিত্রার উপরই ছিলো। আর ছোটো চেরির জানও যে এ চিত্রাতে নিবদ্ধ। চিত্রা আপা ছাড়া যেন তার গতি নেই। অথচ এই আপাকে ছেড়েই যেতে হবে দূরদেশ।চেরির ছোটো শরীর টাকে জড়িয়ে ধরলো চিত্রা। চেরি তখনো স্ট্রেচারে শোয়ানো। চিত্রা হাউমাউ

করে কাঁদলো। চেরিকে জড়িয়ে ধরে অনবরত বলে গেলো,

“চেরি সোনা, তাড়াতাড়ি ফিরবে কেমন? আপা তোমার জন্য পথ চেয়ে থাকবে। ফিরবে না পাখি? আপা তোমায় অনেক চকলেট দেবো। ভাত খাইয়ে দিবো। তাড়াতাড়ি চলে এসো কেমন?”আপার কান্না হয়তো সহ্য হলো না বাচ্চাটার। সে কেবল

ডানে-বামে ধীর গতিতে মাথা নাড়ালো। হয়তো কান্না না করার ইশারা করলো। একে একে পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের সাথে ভাব বিনিময় করলো সে। হয়তো এই শেষ যাওয়া, আবার এমনও হতে পারে হয়তো ফিরে আসবে সে। এক অনিশ্চত উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই বিদায় জানালো চেরিকে। প্লেন যতক্ষণ না আকাশ পথে উড়াল

দিলো ততক্ষণ সবাই বিমুখ হয়ে চেয়ে রইলো। কত মজা, আনন্দ আর হবে না। সওদাগর বাড়ির কোণায় কোণায় যেন শূণ্যতার আভাস।

চেরিদের প্লেন গন্তব্য ধরতেই গন্তব্য ধরলো মুনিয়া, চিত্রা, অহি, নুরুল, আফজাল সওদাগর, তুহিন। যেতে যেতে চিত্রা আবার পিছু ফিরে তাকালো, পিছুটান যে বড় টান।রাত

তখন এগারোটা। ঢাকা শহরের তুমুল জ্যাম পেরিয়ে অবশেষে নিজ বাড়ির গেইটের সামনে এসে দাঁড়ালো চিত্রাদের গাড়ি। ক্লান্ত দেহ, দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন তারা বেরিয়ে এলো, বাড়ির দারোয়ান চাচা হুড়মুড় করে ছুটে এলো। যেন এতক্ষণ সে তাদের অপেক্ষাতেই ছিলো।

নুরুল সওদাগর গাড়ির দরজা লাগিয়েই শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,“কী হয়েছে? আপনাকে এমন লাগছে যে!”

বৃদ্ধ দারোয়ান ফ্যালফ্যাল করে কেঁদে দিলো। বাচ্চাদের মতন অভিযোগ করে বললো,

“স্যার, বাহার বাবাকে পুলিশ নিয়ে গেছে একটু আগে।”সময় খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়। কত কাজ করবো

করবো করেও সময়ের এই দ্রুততায় আর করা হয় না। কেবল সময়ের স্রোত নিয়তিকে ভাসিয়ে যেথায় নিয়ে যায় আমরা নির্লিপ্ত ভাবে সেখানেই যাই।

গত কাল রাত পুরোটা বাহারের কেটেছে জেলে। তার এত এত বন্ধু হুট করেই যেন মরিচীকার মতন উধাও হয়ে গেলো। যাদের জন্য বাহার জান দিতে প্রস্তুত আজ

তারাই নিরুদ্দেশ। বিপদে পড়লেই তো মানুষ চেনা যায়।

অবশেষে আজ দুপুর দু'টোয় বাহারকে জেল থেকে ছাড়ানো গেলো। এর জন্য আফজাল সওদাগর আর তুহিন কম কাঠখড় পোড়ায় নি। কত ছুটোছুটির পর অবশেষে তারা কাজে সফল। বাহারকে জেল থেকে বের করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তুহিন।

রাজনীতির ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়া খুব বিরাট রকমের ঝামেলা। জীবন, ক্যারিয়ার সব ফেঁসে যাবে।জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সবাই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। ধকল তো আর কম গেলো না। শরীর যে ভীষণ ক্লান্ত। বিগত কত গুলো দিন ধরে সওদাগর বাড়িতে ঝড় চলছে। এ ঝড়ের শেষ কোথায়, কতটা নিঃশেষ করার পর, তা জানা নেই

কারো।সূর্যাস্তের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইতালির ভ্যাটিকান সিটিতে পা রাখে অবনী সাথে তার অসুস্থ মেয়ে চেরি। আশেপাশের প্রকৃতি, মানুষজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় সে। কি সুন্দর! অথচ এ সুন্দর তো সে চায় নি। পরিচিত দেশ ছেড়ে এই ভিনদেশে তো সে কখনো পাড়ি দিতে চায় নি। তবে আজ নিয়তির খেলায় ভাসতে ভসতে সে এতদূর

এসেছে! বুক চিরে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘশ্বাস। ব্যাগ থেকে অবনী ফোনটা বের করলো, পঞ্চম বারের মতন রিং লাগালো তার স্বামী আমজাদ সওদাগরের ফোনে। মানুষটা কেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে এমন সময়ে ফোন রিসিভ করছে না! অথচ এয়ারপোর্টে থেকে তাদের একসাথেই হসপিটালের উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা।অবশেষে পঞ্চম

বারের মতন ফোনটা রিসিভ না হয়েই কেটে যেতেই হতাশার শ্বাস ফেললো অবনী। মন খারাপের বিজ্ঞাপনে ভরে গেলো তার হৃদ মাঝার। এই অচেনা শহরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে। চেরির ঘুমন্ত, নিথর দেহটার দিকে তাকাতেই অসহায়ত্ব যেন পাহাড় ছুয়ে দিলো। জীবনে অনেক কাজ সে করেছে,

অনেক অন্যায় করেছে, অল্প বয়সের আবেগে ভেসে গিয়ে পুরো জীবনটা অবহেলার সমুদ্রে ঢেলে দিয়েছে কিন্তু আজকাল তো বয়স হয়েছে, বুঝও হয়েছে, মোটামুটি ভালো-মন্দ সে বুঝতে পারে। তাই তো এখন সন্তান গুলোকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা। কিন্তু সেই সন্তানদের উপরেই আজ বিপদ। এই অচেনা প্লাটফর্মে পরিচিত মুখটা দেখতে পাওয়ার

আকাঙ্খা নিয়ে সে গাড়িতে উঠে বসলো। এই গাড়ি এখানের অবস্থানরত হসপিটাল থেকে আনা হয়েছে। যেখানে চেরিকে ভর্তি করানো হবে। অবনী বেগমের হৃদয় তোলপাড় করে কান্না এলো। এত বছরের পাওয়া না পাওয়ার গল্পে ভারী হলো কান্নার সুর। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই বারো মাসের জীবনে তার দশ মাসই কেটেছে শূণ্যতার

হাহাকারে। এসব বিষাদের গল্পে তার কান্নার গতিবেগ বাড়ালো বৈ কমালো না। আমজাদ সওদাগর আসেন নি, এই কথা টা তাকে যত বেশি না কষ্ট দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে তাকে তার ভাবনা যে- আমজাদ সওদাগর হুট করে দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে গেছে।মানুষ বরাবরই কোমল প্রাণী। তারা চায় তাদের মন খারাপ, একাকীত্ব কেউ

বুঝুক। কিন্তু যখন তাদের এই চাওয়া টা পূরণ হবে না বুঝতে পারে তখন তাদের মনের ঘরে নামে ভীষণ শোক। অবনী বেগমও সেই মানুষের বাহিরের না। চৈত্রের অপ্রাপ্তি, বৈশাখের শূণ্যতা সব মনে করে বাড়াচ্ছে তার মন খারাপের খাতা। সন্তান প্রেমি,সহজ-সরল আমজাদ সওদাগরও বদলে যেতে পারেন তা অবনীর মানতে কষ্ট

হচ্ছে।মাথার উপর নিকোষ কালো আকাশ, হৃদয়ে ব্যাথার আন্দোলন, কণ্ঠে উন্মাদনা মাখানো গান,

“তীর ভাঙা ঢেউ আমি নীড় ভাঙা ঝড়,

উজান ভাটির দুনিয়াতে সবই হলো পর।”

কি হাহাকার সে গানে! কে জানে, কত গল্প মানুষের হৃদয়ে দাফন

দেওয়া থাকে, ক’জনই বা সেসবের খবর রাখে?

হাতের গিটারে অনবরত সুর তুলে যাচ্ছে, কখনো গেয়েছে বাহার বখাটে হওয়ার গল্প, কখনো সে সুর তুলেছে বিরহের। পর পর কত গুলো গানের পর থেমে গেলো তার হাত। বিরক্তির ঢেঁকুর তুলে অসহ্য অনুভূতিদেন ঝেরে ফেলতে চাইলো। চোখ টকটকে লাল তার, মুখে

অবহেলার চাপদাড়ি। হাতের গিটারটা ছাঁদের বেশ প্রশস্ত রেলিঙটার উপর রাখলো, পকেট থেকে তার অতি প্রিয় সাথী নিকোটিনকে বের করেই দুই ঠোঁটের মাঝে চেপে ধরলো। দিয়াশলাই জ্বালানোর মুহূর্তেই কেউ এসে ছোঁ মেরে টেনে নিলো ঠোঁটের ভাঁজে থাকা সিগারেট টা। বাহার অবাক এবং বিরক্ত হলো। প্রয়োজনের

সময় এমন অপ্রয়োজনীয় কাজ তার বরাবরই বিরক্ত করে। সিগারেট হলো তার একান্তই ব্যাক্তিগত সম্পদ যার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।

বাহার কপাল কুঁচকে সিগারেট ছোঁ মারা ব্যাক্তিটার দিকে তাকাতেই বিরক্তিতে চ উচ্চারণ করলো। অধৈর্য্য কণ্ঠে বললো,“এসব কেমন আচরণ তোমার?”

চিত্রা ততক্ষণে সিগারেটটা হাতে মুঠোয় ভরে নেয়। দুষ্টু হেসে বলে,
“এমন আচরণই করা উচিৎ আপনার সাথে। বখাটে পনা ছাড়েন তো এবার। আর কত বখাটে হবেন, এখন তো অন্তত থামুন।”
“কেনো? জেল খেটেছি বলে বখাটেপনা ছাড়তে বলছো? অথচ সভ্য সমাজে বখাটে না হলে পায়ে

পিষে যাবে তোমাদের মতন বড়লোকেরা।”

বাহারের তীক্ষ্ণ কথার ধারে হতভম্ব হয়ে গেলো চিত্রা। জেল থেকে এ যেন অন্য এক বাহারের আগমন। বাহার ভাই তো এমন ছিলো না। চিত্রা নিজেকে সামলে নিয়ে বোকা বোকা হেসে বললো,

“আরে না বাহার ভাই, আপনি ভুল বুজছেন। আমি তো কেবল এমনই

বলেছি। সিগারেট তো ক্ষতিকারক তাই।”

“মানুষের চেয়ে কমই ক্ষতিকারক। মানুষের সঙ্গই ছাড়তে পারলাম না আর এ তো আমার একাকীত্বের পরম বন্ধু, এরে ছাড়ি কীভাবে!”চিত্রা গোঁ ধরলো। আজ সে পণ করেছে বাহারকে আর সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে দিবে না। এখন তার যা করা লাগে সে করবে।

বাহারের বিরক্তির ভার তড়তড় করে বাড়লো। চিত্রাকে ভয়ঙ্কর রকমের ধমক দিতে গিয়েও আবার দিলো না। পকেট থেকে সে বিনাবাক্য ব্যয়ে আরও একটা সিগারেট বের করলো। যথারীতি সেই সিগারেট টাও চিত্রা ধপ করে টেনে নিয়ে গেলো। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো বাহারের। তার সবচেয়ে প্রিয় গিটার খানা সেই রাগ বশত ছুঁড়ে মারলো

ছাঁদের মেঝেতে। ঝনঝনানি শব্দে ভেঙে চুড়ে একাকার হয়ে গেলো গিটারটা। চিত্রা কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলো। জীবনে এমন অবাক সে যেন কখনো হয় নি। বাহার কেবল গিটার না, ভেঙে দিলো যেন স্বয়ং চিত্রাকে। কি নিষ্ঠুর! কি নির্মম! মনে হচ্ছে চিত্রার চিত্তের একেকটা ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছাঁদ জুড়ে।

চিত্রা অবাক ভরা চোখ মুখ নিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো,“বা, বাহার ভাই?”

বাহার যেন এই ডাকটার অপেক্ষায়ই ছিলো। ডাকটার সাথে সাথে সে খেঁকিয়ে উঠলো, ভয়ঙ্কর রকমের ধমকে বললো,

“একদম আমায় আটকাতে আসবে না, মেয়ে, জ্বালিয়ে দিবো। সাবধান করে ছিলাম না তোমায়? করে

ছিলাম কিনা বলো? তবুও আমার ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস কীভাবে হলো তোমার? দু একদিন হেসে কথা বলেছি বলে কী মাথা কিনে নিয়েছো? ভদ্রতা দেখিয়েছি, সেটা সহ্য হয় না তাই না? শা*লা শান্তি দিলো না এই মানুষ জাতি।”

কথা শেষ হতেই বাহার নিজের চিলেকোঠার ঘর খানাতে চলে গিয়ে সশব্দে দরজাটা আটকিয়ে ফেললো।

চিত্রা কেবল দেখলো সবটা। সে হয়তো সত্যিই অতি অধিকার ফলিয়ে ফেলেছে তাই বলে এমন আচরণ করবে বাহার? অষ্টাদশীর হৃদয় তোলপাড় করে অভিমান জমলো, চোখে টলমল করলো অভিমানের অশ্রু। ভাঙা, বিধ্বস্ত গিটার খানা দেখার পর বাঁধ মানলো না সে অশ্রুর কণা গুলো। অঝোর ধারায় ঝরে গেলো কেবল।বাহার

ভাই তার উপর চিৎকার করেছে এটা না যতটা কষ্ট দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে বাহার ভাই নিজেকে কষ্ট দিয়েছে সেটা ভেবে। গিটার টা তো বাহার ভাইয়ের প্রাণ ছিলো, সিগারেট আর গিটার সে কখনো হাত ছাড়া করে নি, যেন সাক্ষাৎ প্রাণ ভোমরা এখানে, অথচ সে গিটারের আজ বিধ্বস্ত অবস্থা! তাও কিনা বাহার ভাই নিজে

করেছে! অষ্টাদশীর কান্নায় ভিজে গেলো নেত্র যুগল। চিবুক বেয়ে গড়িয়ে গেলো সেই অশ্রু। বুক সমান কষ্ট নিয়ে অষ্টাদশী অভিমান করলো, বাহার ভাইয়ের দিকে সে আর ফিরে চাইবে না। পাষণ্ড পুরুষ বাহার ভাই, সর্বনাশা পুরুষ সে।হসপিটালের করিডোরে নতুন একটা দিনের আগমন। সূর্যের আলো হসপিটালের বাগানের বিভিন্ন রকমের রঙিন

ফুলের উপর ঝিলিক দিয়ে উঠছে। নতুন সকাল, নতুন আরেকটা দিন। অবনী বেগমের ক্লান্ত শরীরটাকে অবসাদের জন্য বসিয়েছে কাঠের সুন্দর বেঞ্চ খানায়। চোখ দুটো বন্ধ করে ক্ষাণিক ঝিমিয়ে নিলো সে। সূর্যের তেজ বাড়লো, শরীরের অবসাদ টা কিঞ্চিৎ কাটলো। সাথে সতেজ হলো মস্তিষ্ক। হঠাৎ পাশে কারো কড়া পারফিউমের ঘ্রাণ

পেতেই চোখ খুলে তাকালো সে। কাঙ্খিত মানুষটাকে এ সময়ে দেখে ভড়কেও গেলো কিছুটা। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“আমাজাদ!”

কোট,টাই পড়া ভদ্র লোক অবনীর পাশে এসে বসলো। নরম কণ্ঠে বললো,

“কেমন আছো, অবনী?”অবনীর অভিমান হলো। এই কি প্রথম অবনী

স্বামীর প্রতি অভিমানে মুখ ফুলালো? হ্যাঁ, এত বছরের বৈবাহিক জীবনে এই প্রথমই এটা হলো। চল্লিশ উর্ধ্বো অবনী অষ্টাদশী হয়ে উঠলে নিমিষেই, মুখ ফুলিয়ে বললো,

“এতক্ষণে সময় হলো তোমার? গোটা একটা বিকেল আর রাত পার করার পর তোমার আসতে মন চাইলো?”

আমজাদ মাথা ঝুঁকালেন, বেশ অপরাধী কণ্ঠে বললেন,

“একটা ঝামেলায় পড়ে গেছিলাম অবনী। নাহয় তোমায় অপেক্ষা করাতাম না। আমার চেরি কেমন আছে?”

চেরির কথা উঠতেই অবনীর কান্না এলো। লেপ্টে গেলো আমজাদের বুকের মাঝে। হাহাকার মাখানো কণ্ঠে বললো,

“আমাদের চেরি ভালো নেই, আমজাদ। ভালো নেই।”

আমজাদ হয়তো হুট করে অবনীর এত ঘনিষ্ঠতা আশা করে নি। সামান্য বিব্রতবোধ করলেন সে। অস্বস্তি মাখানো কণ্ঠে স্বান্তনা দিয়ে বললেন,“চিন্তা করো না, অবনী। ঠিক হয়ে যাবে সে। দেখি উঠো তো, মানুষ দেখছে।”

আমজাদের শেষের বাক্যে অবনীর বাঁধ ভাঙা কান্না থেমে গেলো। আকষ্মিক ভুল কিছু শুনে ফেলেছে এমন একটি ভাব ফুটে উঠলো তার মুখ-মন্ডলে। আমজাদ কিনা বলছে মানুষ দেখছে? আমজাদ! অথচ যখন তাদের নতুন বিয়ে হলো তখন আমজাদ সারাদিন অবনীর পিছে পিছে থাকতো। ভাবীরা ঠাট্টা করে বউ পাগলও বলতো ছেলেটাকে।

অবনী মাঝে মধ্যে কেমন ব্যবহার করতো কিন্তু লোকটা হাসি মুখে সব মেনে নিতো। কেমন বোকা বোকা ধাঁচের ছিলো। একদিন অবনীর শাশুড়ি অবনীকে কি একটা যেন রান্না করতে দিয়েছিলো, অবনীর ঠিক মনে নেই, আমজাদ সবার থেকে লুকিয়ে অবনীর রান্না নিজে করে দিয়েছিলো। কই গেলো সেই দিন, কই গেলো সেই বউ পাগল

আমজাদ? আজ যেন ভিন্ন পুরুষ সে। গত কয়েকবছর আমজাদ দেশে যায় নি, হয়তো তাই এ বদলটা চোখে লাগে নি। হুট করে একজন মানুষের এত বদল কীভাবে হলো!

প্রশ্নরা হাতছানি দিলো অবনীর হৃদয় জুড়ে। অবনী ক্রন্দনরত ভাঙা কণ্ঠ নিয়ে বললো,

“তুমি বদলে গেছো, আমজাদ। বদলে গেছো।”ঘর বন্ধি,

বিবশ,বিষণ্ণতায় গোটা একটা দিন গেলো। চিত্রা চুপ চাপ থম মারা। কারো সাথে কোনো কথা বলে নি গতকাল রাতের পর থেকে। গতকাল সারা রাত সে কেঁদেছে, কেঁদে কেটে চোখ-মুখ ফুলিয়েছে। গত এক বছর বাহার ভাইকে তার অসহ্য অসহ্য লাগে বলে সবার গোপনে হৃদয় মাঝে পুষে রেখেছিলো। সে আজ বুজছে, এই

বাহার ভাইকে ছাড়া তার গোটা দুনিয়া অসহ্য কিন্তু বাহার ভাই অসহ্য না।

সময়টা ঠিক সন্ধ্যার পরের ভাগ। এসময়ে বাড়িতে হৈচৈ থাকে কম। যে যার মতন ব্যস্ত থাকে। তুহিন ভাইজান বোধহয় বাহিরে এখনো। দিশান আর তৃষান ভাই রাও বোধহয় পড়ছে। অহি আপারও পড়ার সময়। বড়রা হয়তো ঝিমুচ্ছে

কিংবা কথা বলছে। পুরো বাড়ি একদম নিবিড়। একদম শীতল। চিত্রা দরজা খুলেছে সারাদিন পর এখন। বাড়ির মানুষ তাকে তেমন একটা ডাকেও নি আজ। ভেবেছে শরীর তো এমনেতে অসুস্থ, ঘুমাক নাহয়। কেউ কি আর মনের খোঁজ রাখে!আঁধার ঘরে অন্য কারো উপস্থিতি অনুভব করতেই চমকে উঠে চিত্রা। এসময় কে আসতে

পারে তার ঘরে ভাবতেই বারান্দার দরজায় উঁচা লম্বা পুরুষালীর অবয়ব ভেসে উঠলো। চিত্রা অবাক কণ্ঠে বললো,

“আ,আব্বু!”

নুরুল সওদাগর এগিয়ে এলেন মেয়ের দিকে। রেলিং এ ঠেস দিয়ে দৃষ্টি রাখলেন রাস্তায়, মানুষজন দেখা যাচ্ছে বারান্দা থেকে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কত সজীব

দেখা যাচ্ছে রাস্তা টা! নুরুল সওদাগর ছোট্টো শ্বাস ফেললেন। রাস্তায় দৃষ্টি রেখেই বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,“রাস্তা থেকে তো রিক্সা, গাড়ির হর্ণের শব্দ আসে তাই না. তোমার রুমটা নাহয় বদলে ফেলো। অসুবিধা হয় না?”

চিত্রা অবাক হলো। বাবার সাথে এমন কথা বলার সম্পর্ক তার নেই। তাহলে আজ বাবা অন্য সুর গাইছে

যে? নতুন কোনো বার্তার আগমন তাহলে ভেসে বেড়াচ্ছে পরিবেশে?“ওরে পাখি বলিস তারে,
কত ব্যাথা রাখি গোপন করে,
কখনো ব্যাথারা মুখ থুবড়ে পড়ে,
কখনো বা অশ্রু হয়ে ঝড়ে”
নীল রঙের কালি দিয়ে লিখা ছোটো দু’লাইনের কথা গুলো, কত সুন্দর! কত ব্যাথার! চিত্রা বার কয়েক পড়লো লেখা গুলো, বেশ মনে

ধরেছে। সে যখন এসএসসি দেয়, তখন এখানে সেখানে এলোমেলো, অবুঝ মনে কত কথা ই লিখে রাখতো, কত কবিতাই যত্নে গড়তো। টিনেজার সময়টাই তো এমন। বয়ঃসন্ধিতে এসে ছেলে-মেয়ে কিছুটা কাব্যিক হয়ে যায়। তাদের অতি রঙচঙে আবেগ ঝরে পড়ে কাব্যের পাতায়। চিত্রাও তাদের থেকে আলাদা না। অথচ সেদিন যে

কথা টা লিখেছিলো একান্তই ফুরফুরে মনের আবেশ অনুভব করার জন্য আজ সে লিখাটাই জীবনের চরম ব্যর্থতা মনে করাচ্ছে। সময় পাল্টাতে ঠিক কতটুকু সময় লাগে? এক সেকেন্ড বা তারও কিছুটা কম। বা'চোখের কাজল ঘেটে মুক্তোর মতন একবিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে চিত্রার চোখের কোণে থেকে। আহা, কান্নারা এত অবাধ্য কেন!

সময়টা আগস্টের সতেরো তারিখ, শুক্রবার। বেলা এখন ঠিক অপরাহ্ন। চিত্রার শরীরে নীল রঙের শাড়ি জড়ানো। চোখে গাড়ো কাজলের প্রলেপ। অভিমানীনির প্রগাঢ় অভিমান ঢাকতে যেন সক্ষম সেই কাজল। হয়তো নয়নের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনুভূতিদের লুকানোর জন্য এ ব্যবস্থা। শ্যামলা শরীরে গাড়ো নীল রঙটা ঠিক খারাপ লাগছে

না। চলনসই থেকেও আরও দু’ধাপ বেশি ভালো লাগছে। পিঠ অব্দি চুল গুলো বাতাসে উড়ছে তার। আজকে বিশেষ দিন তার জীবনে, তাই এত সাজগোজ। জীবন তো কিছুর জন্য থেমে থাকে না, সে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় অনেক দূর। যদি এগিয়ে যাওয়া টা খুব দ্রুত হয় তবুও বোধহয় খারাপ হবে না। অপেক্ষিত সময়ের অবসান ঘটলো।

বাহিরের ঘর থেকে চিত্রার ডাক ভেসে এলো। এইতো চিত্রার ডাক পড়েছে। নতুন কিছুর শুরু হওয়ার আহ্বান এসেছে। চিত্রা বিছানায় বসে রইলো। বুকের মাঝে যন্ত্রণাদের বিক্ষোভ মি*ছিল। তাদের যেন প্রতিবাদ, বুকের মাঝে ঠাঁই দেওয়া মানুষটাকে ছাড়া আর কাউকে সহ্য করবে না চিত্রার জীবনে। কখনোই না।

চিত্রা শ্বাস নিলো, অনুভব করলো এই চারপাশে বাহার ভাইয়েরই কেবল অস্তিত্ব। এই যে আলমারির ভেতর রাখা বাহার ভাইয়ের শুভ্র রঙের টি-শার্ট, বইয়ের টেবিলের উপর বাহার ভাইয়ের নোটস, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের ভেতরে বাহার ভাইযের কতশত ফেলে দেওয়া আধখাওয়া সিগারেট, এই যে হৃদয় মাঝে পুষে রাখা আস্ত একটা বাহার

ভাই। সব জায়গাতেই তো মানুষ টা। তবে তাকে ভুলার জন্য এত আয়োজন কেনো! এই আয়োজনের স্বার্থকতা কোথায়?

ভাবনার মাঝে চিত্রার ঘরে প্রবেশ করলো তার মা, মুনিয়া বেগম। চোখে চিকন গ্লাসের চশমা, শরীরে কালো শাড়ি, মুখে চিকচিক করা ঘামের বিন্দুকণা। সে এসেই ব্যাস্ত ভাঙিতে বললো,“চিতু,তুমি সাজগোজ

করেছো কেনো? বাবার সাথে পা*গল হয়েছো? সেখানে তুমি যাবে না। নিজের এত বড় ক্ষতি করার জন্য উঠেপড়ে কেনো লেগেছো? আর তোমার বয়সই বা কত? এ বয়সে কিসের বিয়ে! কোনো বিয়ে টিয়ে হবে না।”

মায়ের ব্যস্ততা মেশানো কথার পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিলো না চিত্রা। কেবল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলো অনিমেষ। মা ‘টা এত সুন্দর কেনো? ভাইয়াও মায়ের মতন সুন্দর। তাদের দেখলেই কেমন চোখে শান্তি শান্তি লাগে। ভালো লাগায় ছেয়ে যায় হৃদয় জমিন।

মেয়ের কোনো হেলদোল না দেখে বিরক্ত হলো মুনিয়া বেগম। বিরক্তিকর কণ্ঠে বললো,“তোমায় কি বলেছি শুনেছো? বিয়ের আশা বাদ দাও। তোমার বাবার তালে নাচা বন্ধ

করো। এতটুকু একটা জীবন তোমার।”

“বিয়ে তো করতেই হবে, আম্মু। সমাজের চিরপরিচিত প্রথা অনুসারে মেয়েদের তো আজীবন বাবার ঘরে থাকার নিয়ম নেই। যেতেই যেহেতু হবে তবে আগেই যাই। পরে তো মায়া আরও বেড়ে যাবে, আম্মু।”

মুনিয়া মেয়ের কথায় হতভম্ব হয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন,

“চিত্রা! কি বলছো এসব!”

“ভুল বলেছি আম্মু? তোমরা কী আর আমায় চিরদিন রেখে দিবে, বলো? একদিন তো হস্তান্তর করা হবে আমাকে, তবে আজ কেনো নয়! জীবনটা আমার এই একেক জনের হাতে কেবল হস্তান্তরিত হয়েই যাবে। পড়ে পাওয়া কিনা।”

“চিত্রা!”মুনিয়া বেগমের কণ্ঠে চরম বিষ্ময়। সে বিষ্ময়ের স্রোতে যেন

কথারই খেই হারিয়ে ফেললো। সারাদিন দুষ্টুমিতে মত্ত থাকা চিত্রার আজ কথা গুলোর ওজন বেশি। এত ভারী কথা যে আশা করেন নি মুনিয়া বেগম। তাহলে আজ মেয়েটাকে এত অপরিচিত লাগছে কেনো? কেমন অপরিচিত একটা অবয়ব মেয়েটার মাঝে!

মুনিয়া বেগম হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু তন্মধ্যেই নুরুল

সওদাগরের আগমনে কথার নদীতে ভাঁটা পড়লো।

নুরুল সওদাগরের মুখে বরাবরের চেয়ে আজ হাসির রেখা বেশ গভীর। চোখে মুখে কেমন যেন একটা রাজ্যের শান্তি। শান্তিটা ঠিক কিসের? সবচেয়ে অপছন্দের মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে না, এটাই কী কারণ তবে?

মুনিয়া বেগম নিজের স্বামীর দিকে তাকালেন। তাচ্ছিল্য করে বলে উঠলেন,“আমার মেয়ের ধ্বংস না ডেকে আনলেও পারতে।”

নুরুল সওদাগর হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না স্ত্রীর এহেন কথায়। তাই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

“কি বলছো এসব! চিত্রা আমারও মেয়ে, ভুলে যেও না।”

বাবার একটা কথায় চিত্রার ভিতরের যত না পাওয়ার হাহাকার ছিলো, সব মিইয়ে গেলো। জীবনের আঠেরোটা বছর সে কেবল অপেক্ষা করেছিলো বাবার মুখ থেকে এ কথাটা শোনার জন্য। আজ মনে হচ্ছে বেঁচে থাকাটা স্বার্থক। বাবার আদর পাওয়ার জন্য চিত্রা এমন কয়েকটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নাহয় মাথা পেতে নিবে, তবুও তো তার বাবার ভালোবাসা

পাবে। এই ঢের।“আচ্ছা! চিত্রা তোমার মেয়ে? কবে থেকে তাকে মেয়ে মানা শুরু করলে? তোমার জাত যাবে না?”

স্ত্রীর বিদ্রুপের হাসি দেখে গা জ্বলে উঠলো নুরুল সওদাগরের। সে বেশ খানিকটা জোরেই বললো,

“মুনা, সাবধানে কথা বলো। বাড়ি ভর্তি মেহমান, নাটক টা বন্ধ করো।

আমি চিত্রার খারাপ চাইবো না নিশ্চয়।”

“ভালো কেনো চাইতো আসছো? আমার মেয়ের ভালোটা তোমার না চাইলেও হবে। যাদের ভালো এত বছর চেয়ে আসছো, তাদেরটাই চাও। নাকি তাদের ভালোর জন্যই আমার মেয়ের এ সর্বনাশ করছো! কোনটা?”মুনিয়া বেগমের কথা শেষ হতেই তার ডান গালে সশব্দে চ*ড়

বসালো নুরুল সওদাগর। এই ঘটনা টা মুনিয়া আর চিত্রা দুজনের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিলো। মুনিয়া বেগম তাই নিস্চুপ হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তন্মধ্যেই অহি এলো, চিত্রাকে ধরে নিয়ে গেলো পাত্রপক্ষের সামনে। চিত্রা কেবল পাথরের ন্যায় হেঁটে গেলো। এ জীবনে হুট করেই তার চাওয়া-পাওয়া গুলো হাওয়ায় মিলিয়ে

গেলো। কেবল মনে হলো, বিফল এই বেঁচে থাকা।সময়টা ঠিক মধ্যরাত, ভিনদেশের মাটিতে পা রেখেছে অবনী আজ পাঁচদিন হতে চললো। বাড়ির সবাই তাদের নিয়ম করে খোঁজ নিচ্ছে, কিন্তু তবুও অবনী কোথাও নিজেকে একা ফিল করে। এই একা অনুভব করাটা একাকীত্ব না বোধহয়, আমজাদের মাঝে পুরোনো আমজাদকে খুঁজে না

পাওয়াটাই এই একা অনুভব হওয়ার কারণ। মানুষ সচারাচর যাকে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত, তাকে সেভাবেই দেখতে চায়। মানুষেরও যে বদল আসতে পারে, তা যেন আমরা ভাবতে পারি না বা কোথাও একটা মানতে পারি না।

হীম শীতল কেবিনের সাদা রঙের আরামকেদারাটাই বসে বসে ঝিমুচ্ছে অবনী। রাত সাড়ে তিনটা বাজছে

অথচ তার ঘুম আসছে না। চেরির শরীরের বেশ উন্নতি দেখা দিচ্ছে, এতদূর আসাটা সার্থক। কিন্তু তবুও মনে কোথাও শান্তি নেই।অবনী বেগম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কতক্ষণ এপাশ-ওপাশ হাতড়ে নিজের ফোনটা হাতে নিলো। কল লাগালো আমজাদ সওদাগরের ফোনে। আমজাদ সওদাগর প্রতিদিনই এসে মেয়েকে দেখে যান

অথচ থাকেন না, এমনকি অবনী বেগমকেও যেতে বলে না আমজাদ সওদাগরের বাসায়। বিষয়টা ভীষণ অদ্ভুত হলেও অবনী এতদিন মাথা ঘামায় নি, অথচ আজ মাঝরাতে তার এ কথা খানা মাথায এলো। গত পাঁচদিন যাবত অবনী হসপিটালেই আছেন। আমজাদ তাকে বাড়িতে গিয়ে বিশ্রামও নিতে বলে নি।প্রথম বার কলটা বাজতে

বাজতেই কেটে গেলো। অবনী মুখ-চোখ কুঁচকালো। তার হঠাৎ করেই সর্বাঙ্গে অস্বস্তি ছেয়ে গেলো। তার মনে হলো তার অজান্তেই হয়তো ভীষণ অদ্ভুত কিছু হচ্ছে এই ভিনদেশে, যা খুব সস্তা আবরণে ঢেকে আছে। অবনী বেগম ঘুমন্ত চেরির দিকে তাকিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন। এই মাঝরাতেই সে সিদ্ধান্ত নিলেন আমজাদ

সওদাগরের বাসায় যাওয়ার। যতটুকু জানে সে, হসপিটাল থেকে বাসার দুরত্ব মাত্র আধাঘন্টা। বাড়ির ঠিকানাটাও তার জানা আছে। এই মাঝ রাত্রিরে যেকোনো মূল্যেই তার সংশয় অস্বস্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। তার মন যে মিছে ভয়ের আতঙ্কে তোলপাড় হচ্ছে, তা এই মুহূর্তেই মিটাতে হবে।

হসপিটালের নার্সকে চেরির কাছে রেখেই এই ভিনদেশের অপরিচিত রাস্তায় পা চালালো বাঙালি এই নারী। বাঙালি স্ত্রীদের আলাদা একটা শক্তি আছে। তারা সন্তান আর স্বামীর ক্ষেত্রে অদ্ভুত শক্তি,সাহস পেয়ে যায়।সোফায় বসে থাকা বেশ সুন্দর দেখতে ছেলেটাই চিত্রাকে দেখতে এসেছে। নুরুল সওদাগরের ডিপার্টমেন্টেরই একজনের ছেলে

সে। নাম নওশাদ। ছেলেটাকে নির্দ্বিধায় সুপুরুষ বলা যাবে। ফর্সা শরীর, উচ্চতাও যথেষ্ট, সুস্বাস্থ্য। কি ভীষণ সুন্দর! কালো রঙের পাঞ্জাবি টা বেশ মানিয়েছে শরীরে।

ছেলেটার মা-বাবাও ছেলেটার সাথে এসেছে। বেশ সুশীল পরিবারই মনে হলো। বেশ হেসে হেসে কথা বললো। এক দেখায় তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে সেটাও বলেছে। চিত্রা

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কেবল ঠাঁই বসে রইলো। ড্রয়িং রুম জুড়ে সবাই যার যার মতন দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে। চাঁদনীর হাসবেন্ড মাহাতাবও আছে। শুক্রবার যেহেতু, তার অফিসও বন্ধ।ছেলের বাড়ির থেকে প্রস্তাব দিলো তারা আজই আংটি পড়িয়ে যেতে চায়। নুরুল সওদাগরের মুখের হাসিটা বিস্তৃতি লাভ করলো, অথচ সবাই তখনো

হতভম্ব, আহম্মক বনে আছে। তারা যেন কিছুই বুঝতে পারলো না। বাবা-মেয়ের এমন পরিবর্তন যেন সবাইকেই ভাবাচ্ছে। কি এমন হয়ে গেলো, যে এত বড় সিদ্ধান্ত নিতেও তারা দু'বার ভাবছে না!

বাড়ির সবচেয়ে বড় সদস্য আফজাল সওদাগর সেখানে উপস্থিত নেই। সকালে নুরুল সওদাগর যখন চিত্রাকে দেখতে আসার প্রস্তাবটা

জানিয়েছে, তখনই দুই ভাইয়ের এক রকমের কথা কাটাকাটি হয়েছে। এ প্রথম আফজাল সওদাগরের কথাকে গুরুত্ব দিলো না তার ছোটো ভাই। সেই কষ্টে দোর দিলেন সে। যা ইচ্ছে করুক গিয়ে সবাই। তুহিনও বেশ চিৎকার চেঁচামেচি করেছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে চিত্রা থামিয়ে দিয়েছে তার ভাইকে। বাবা নাকি তার ভালোর জন্য ই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তুহিনও রাগে, ক্ষোভে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

পাত্রের মা হাত জোর করে বেশ বিনীত স্বরে বললেন,“ভাই সাহেব, আপনাদের মেয়েকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। মায়া মায়া মুখ। আপানারা দেখুন, আমরা চাচ্ছি আজই একটা পাকা ব্যবস্থা করে যেতে।”

নুরুল সওদাগর তো আনন্দে আত্মহারা। সবাই বেশ ভয়ে আছে এই ভেবে যে নুরুল সওদাগর না আবার হ্যাঁ করে দেয়। ভাবসাবও ঠিক তেমন মনে হচ্ছে।

কথা ঘুরালো মাহাতাব। বেশ বুদ্ধির সাথে হাসি মুখে উত্তর দিলো,

“আন্টি, বিয়েটা তো আর এক কথায় হয় না। আপনারা খাবার খান, আমাদেরও তো পারিবারিক

আলোচনা আছে। আমরা তা সেড়ে নেই, তাছাড়া তো মেয়েরও তো একটা মতামত আছে তাই না?”

ভদ্রমহিলাও সম্মতির সুরে বললেন,“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। আপানারা আলোচনা করুন। আমদের সমস্যা নেই।”

মহিলার কথায় সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেললো। নুরুল সওদাগর যেন

ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছেন। যে কোনো মূল্যে তাকে থামাতে হবে। সবাই যখন নিজ নিজ বাক বিতণ্ডায় ব্যস্ত, চিত্রা তখন পথ ধরলো ছাঁদের দিকে। বাহার ভাইয়ের উপর অভিমান আর বাবার ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্খায় সে অনলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, তবুও কী বাহার ভাই তাকে আটকাবে না? বলবে না থেকে যেতে? বাহার ভাই বললে

চিত্রা হাসতে হাসতে সব ভুলে যাবে, এমনকি বাবার ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্খাও।সচারাচর আশ্বিন মাসে ঝড়ের আভাস পাওয়া যায় না। পেঁজা তুলোর দলেরা ছুটে যায় আকাশ ঘেষে। কেমন হাওয়ায় মিঠাইয়ের মতন দেখতে লাগে! আদুরে, তুলতুলে। অথচ আজ আকাশে হাওয়ায় মিঠাইয়ের মতন তুলা নেই। আকাশে আজ ধ্বংসাত্মক

রূপ। চিত্রার হৃদয়ের ভয়ানক বিধ্বস্ততা বোধহয় ছেয়ে গেছে আকাশেও।

নিচে পারিবারিক বাকবিতন্ডা চলছে। চিত্রা বেশ কায়দা করেই ছাঁদে চলে এলো। বাহার ভাইকে এক নজর দেখার অসুখে ধরেছে তাকে। যেকোনো মূল্যেই হোক এই অসুখ তাড়াতাড়ি সাড়াতে হবে।নীল শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে। ছাঁদে

উঠতেই এক অন্যরকম দৃশ্য চোখে পড়লো চিত্রার। বাহার ভাই ছাঁদের কবুতর দুটোকে খাবার খাওয়াচ্ছেন। কবুতর দুটো ও চিত্রার। কবুতর দুটোকে ঠিক পালে না সে। সবসময় ছেড়ে রাখে। যখন ইচ্ছে হয় তারা ফিরে আসে, খাবার খায়, চিত্রার সামনে উড়ে বেড়ায় আবার নিজেদের মনমতন চলে যায়। বাহার ভাই কখনো এদের এতো আদর

যত্ন করে নি, আর আজ কিনা খাবার খাওয়াচ্ছে!

চিত্রা ধীর পায়ে বাহারের সাথে এসে দাঁড়ালো। খুব মনযোগ দিয়ে দেখলো লোকটাকে। নিচে তাকে দেখতে আসা নওশাদ নামের ছেলেটা বাহার ভাই থেকেও বেশি সুন্দর। উচ্চতায় একটু কম তবে বেশ সুন্দর, ভদ্র, সুশীল, সরকারি চাকরি করে। অন্যদিকে বাহার ভাই প্রচুর অ*ভদ্র,

অসামাজিক, বেকার। বাহার ভাইয়ের এত এত নেগেটিভিটি তবুও যেন বাহার ভাইয়ের তুলনা কারো সাথে হবে না। তবুও বাহার ভাই অনবদ্য।“আরে চিত্রা যে, তা এই অসময়ে ছাঁদে?”

বাহারের কথায় ধ্যান ভাঙলো চিত্রার। মানুষটা কত স্বাভাবিক ভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করলো! অথচ মানুষটার সাথে তার নিরব একটা

মান-অভিমান চলছে। যেই মান-অভিমানের জন্য আজ চিত্রা এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ যেন কিছুই হয় নি এমন একটা ভাব লোকটার কথায়।

“কথা টথা না বলার ব্রত করলে নাকি? বেশ ভালো তো। কথা না বললে মানুষ তোমাকে সিরিয়াসলি নিবে। একটা পাত্তা পাবে বুঝলে! তোমার বাপ তো এমনেই দাম দেয়

না, এখন যদি কথা না বলার কারণে একটু পাত্তা পাও তাহলে খারাপ হবে না।”

বাহারের ঠাট্টা মারা কথায় ক্ষাণিক রেগে গেলো চিত্রা। রাগী কণ্ঠে বললো,

“আমার বাবাকে নিয়ে একদম এসব বলবেন না।”

“আচ্ছা বলবো না।”বাহার খুব সহজ ভাবে যেন মেনে গেলো চিত্রার

কথাটা। চিত্রার রাগ আবার হারিয়ে গেলো। মানুষটা এমন কেন? এমন না হলে কী খুব বড় ক্ষতি হয়ে যেতো!

মান-অভিমান কিনারে রেখে চিত্রা ধীর কণ্ঠে বললো,

“বাহার ভাই, আমি নীল শাড়ি পড়েছি। কিছু বললেন না তো।”

বাহার কবুতরকে খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে একবার হালকা করে

তাকালো চিত্রার দিকে। তারপর আবার নিজের কাজ করতে করতে বললো,

“বেশ ভালো তো। তা তোমার শরীরে নীল শাড়িটা তেমন মানাচ্ছে না। তুমি বরং সাদা শাড়ি পড়তে। মেঘের মতন লাগবে।”বাহারের কথায় চিত্রার অভিমানেরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। চোখ-মুখ টলমল করে উঠলো। বাহার ভাই এভাবে বলতে

পারলো! অথচ অষ্টাদশী বুঝে নি, বাহার ভাই তার গোপন একটা ইচ্ছের কথা কেমন করে জানিয়ে দিলো। বুঝলে অভিমানের জায়গায় ভালো লাগার সৃষ্টি হতো যে!

বাহার আর চিত্রাকে সিক্ত করতে আকাশ চিরে বেরিয়ে এলো বৃষ্টির ফোঁটারা। হুট করেই তার আগমনে তাজ্জব মানব-মানবী। ভিজে একাকার দু'জনে।

তন্মধ্যেই চিত্রা বলে উঠলো,“বাহার ভাই, আজ আমাকে দেখতে আসছে, ওরা আজই আংটি পড়িয়ে যেতে চায়।”

“ওহ্ তাই নাকি! বাহ্ দারুণ খবর দিলে তো। মিষ্টি খাওয়াবে না?”

চিত্রা অবাক হলো বাহারের উত্তরে। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“আপনি জানতেন না এটা?”

“না তো। তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার আমি আর কেমন করে জানবো!”

উত্তর টা বেশ স্বাভাবিক ভাবে দিলেও চিত্রার মন মানতে চাইলো না। সে দিবানিশি যে ছেলেটার জন্য পুড়ে, সে ছেলেটা নাকি তার এত বড় খবরটাই জানতো না! এ কেমন মানুষ!

চিত্রার অশ্রু রা ততক্ষণে বৃষ্টির পানিতে মিলেমিশে একাকার। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে বললো,

“আপনি কি কিছু বলবেন না, বাহার ভাই!”“হ্যাঁ বলবো তো। নতুন জীবনের জন্য তোমাকে শুভেচ্ছা। তুমি তো বাবার ভালোবাসার কাঙালি, তোমার যেন সেই ভালোবাসা মিলে। নিজের বাবার

কাছ থেকে না হোক, জীবন সঙ্গীর বাবার থেকেই নাহয় পেলে।”

বাহার ভাইয়ের উত্তরে চিত্রা ব্যাথিত নয়নে চাইলো। মানুষটার কি ব্যাথা হচ্ছে না বুকে! তবে তার কেনো র*ক্তক্ষরণ হচ্ছে! ভালোবাসা এত যন্ত্রণা কেনো! বাহার ভাইরা এত অবুঝ কেনো!

“যাও চিত্রা, নিচে যাও। তোমার সুপুরুষ হবু বর হয়তো অপেক্ষা

করছে। সুন্দর মানুষের আশেপাশে থাকলে তোমারই লাভ। সুন্দর মানুষ দেখলে চোখে একটু প্রশান্তি মিলে বুঝলে। আমরা তো শা*লা পুড়ে ছাই।”

“অথচ এই ছাইকেই আমার চাই।”চিত্রার এত আবেগীয় কথাটাকেও বাহার বরাবরের মতন হেসে উড়িয়ে দিলো। গা ছাড়া ভাবে বললো,

“শুনো মেয়ে, বয়ঃসন্ধির আবেগ কেটে গেলে, বাহারও কেটে যাবে। এ বয়সে ঠোঁট পুড়ে যাওয়া, উন্মাদ, বখাটেদেরই বেশি ভালো লাগে। কিন্তু যখন বাস্তবতা বুঝবে তখন এই ভালো লাগা বড়জোড় তোমার হাসির কারণ ছাড়া কিছুই না। যাও নিচে তোমার অপেক্ষা করছে সবাই।”

চিত্রার কান্নার স্রোত বাড়লো। দু’কদম বাহারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কেবল উচ্চারণ করলো, “বাহার ভাই...”

বাহার থামিয়ে দিলো চিত্রাকে। গম্ভীর স্বরে বললো,“যাও রঙ্গনা, বখাটে বাহার তোমার না। জীবনে বাঁচতে হলে সুশীল সঙ্গী দরকার। বাহাররা কেবল মনের ফ্যান্টাসি।”

চিত্রার কত কথা বলতে গিয়ে বলা হলো না। আবার কত অনুভূতি না চাইতেও বলে দিলো। বাহার ভাই তবুও নির্বাক! তবে তাই হোক, বাহার ভাইয়ের নাহয় না-ই হলো চিত্রা।

ভিজে শাড়ি, ভগ্ন হৃদয় নিয়ে চিত্রা যখন পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে, বাহার দু'হাত মেলে আকাশ পানে তাকিয়ে বললো,"শুনছো গো মেঘ,

বাহার আর গিটার ছুঁয়ে দেখবে না। অষ্টাদশীর হৃদয়ে বাহার আর এক্কা-দোক্কা খেলবে না। বাহার যে খুব নির্মম ভাবে সেই দু'টো জিনিসই ভেঙে দিয়েছে। বাহারের আর কেউ নেই মেঘ, না গিটার আর না অষ্টাদশী।"

চোখ বন্ধ করে আপনমনে গেয়ে উঠলো রঙ্গনার বাহার ভাই,

"ভালোবাসা হয় যদি পাঠশালা,

প্রেমের আরেক নাম, কাঁটার জ্বালা কাঁটার জ্বালা।”নিরব, নির্জন কালো আকাশে পূর্ণিমার মেলা আজ। কি সুন্দর আকাশ! মেঘেরা ছুটে যাচ্ছে দলবেঁধে। খোলা রাস্তায় ফিনফিনে বাতাস। ঠিক চল্লিশ মিনিটের মাথায় অবনী বেগম তার কাঙ্খিত জায়গায় এসে পৌঁছালেন। বুকের মাঝে কেমন থেকে থেকে কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে! মাঝে মাঝে তো মনে হচ্ছে

শ্বাসই বন্ধ হয়ে যাবে। এমনটা তো হওয়ার কথা ছিলো না। অবনী বেগমের বাইশ বছরের সাংসারিক জীবনে সে আমজাদকে কখনোই স্বামী হিসেবে মন থেকে মানতে পারে নি। তবে আজ কেনো হারানোর ভয়? হয়তো মায়া। এতবছর একটা মানুষের সাথে থাকলে মায়া পড়ে যায়। যে মায়ার টানেও মনে হয় মানুষটা থেকে

যাক। এই মায়া আর অভ্যাসের কারণে কত মানুষ কত মানুষকে ছাড়তে পারে না। অবনী ধীর পায়ে চারপাশের বাড়ি গুলোতে চোখ বুলায়। অবশেষে কাঙ্খিত বাড়িটা পাওয়া গেলো বড় একটা অচেনা গাছের ডানদিকে।অবনী বেগম ধীর পায়ে হেঁটে গেলেন বাড়িটার সামনে। বাড়ির গেইটের সামনে একটা লাইট জ্বলছে। লাইটের আলোয় বাড়ির

মালিকের নাম জ্বলজ্বল করছে। অবনী বেগমের পা সেখানেই থেমে গেলো। ইংরেজিতে বড় বড় অক্ষরে লিখা “মিসেস জেছি ফ্রাংকিং”। অবনীর হৃদপিণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ দ্রুতই চলছে। ঠিক এ মুহূর্তে এসে অবনী বেগমের মনে হলো তার বোধহয় বাড়িটার ভেতর যাওয়া উচিৎ হবে না। ভিনদেশে যা লুকিয়ে আছে তা ভিনদেশেই নাহয় লুকিয়ে

থাক। বয়স তো অনেক হলো, আর ক’দিনই বা বাঁচবে! কি দরকার হাহাকার নিয়ে বাঁচার? এরচেয়ে জীবন যেমন চলছে, তেমনই নাহয় চললো। অপ্রত্যাশিত কিছু নাহয় আড়ালেই রইলো। জেনে গেলেই তো দূরত্ব বাড়বে। আমজাদ সওদাগর তো তাকে কম ভালোবাসা দেন নি। সে-ই ভালোবাসা আগলে রাখতে পারলো না বরং প্রতিহিংসার

অনলে দগ্ধ করতে চেয়েছিল বার বার সেই সওদাগর পরিবারকে। কিন্তু কখন যেন আষ্টেপৃষ্টে সে পরিবারের মায়ায় পরে গেলো, টেরই পেলো না। অথচ অসময়ে মায়া বেড়ে কি লাভ! হারানোর পর মায়া কেবল বিলাসিতা হয়ে রয়।অবনী বেগম আঁধার রাস্তায় আবার পা বাড়ায়। হসপিটালে ফিরে যাওয়ার অত ব্যস্ততা নেই, ধীর পায়েই যাওয়া

যাবে। চারপাশে ততক্ষণে ভোরের আলোও ফুটে যাচ্ছে। নীলাভ আকাশ, শীতল প্রকৃতি। অবনী বেগম হাঁটতে হাঁটতে ডুব দিলেন অতীতে। আজকের এই শক্তপোক্ত অবনী বেগম এমন কখনোই ছিলেন না। অজপাড়াগাঁ এর এক সহজ সরল মেয়ে ছিলো সে। বাবা আর সে ছিলো তাদের ছোট্টো কুটিরের সদস্য। অবনী বেগমের বয়স তখন

কত হবে? পনেরো কিংবা ষোলো। গ্রাম ঘুরে বেড়ানো উড়নচণ্ডী ছিলো সে। এ পাড়া ও পাড়া, এ গ্রাম ও গ্রাম করেই তো জীবন কাটছিলো বেশ। পড়াশোনাও করতো না। তখন পড়াশোনার ততটা মূল্য ছিলো না, তাও আবার মেয়েদের। তার উপর অজপাড়াগাঁ। পঞ্চম শ্রেণীতে থাকাকালীন সমাপ্তি ঘটিয়ে ছিলো পড়াশোনার। দেখতেও বেশ ছিলো।

বাবা ছিলো দিনমজুর, সারাদিন খেটেখুটে যা রোজগার করতো, তা দিয়ে বাবা-মেয়ের সংসার দিব্যি চলতো।একদিন সময়টা ঠিক গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, উত্তপ্ত দুপুরে গরমের তীব্রতায় জান যায় যায় অবস্থা সকলের। কি গরম! অথচ অবনী বেগম সেই দুপুরেও বেশ আরামে পাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরে একটা চকচকে হলুদ রঙের থ্রি-পিস।

গোসল করায় চুল গুলো খোলা যা বাতাসে দোল খেয়ে যাচ্ছে। গলায় একটা তাবিজ। শুকনো, সরু দেহখানা নিয়ে সে জারুল গাছের তলায় বসে কামরাঙ্গা খাচ্ছে বেশ আয়েশ করে। সাথে তার বন্ধু বান্ধবের দল। হুট করেই সেখানে পুলিশের জীপ গাড়ি এসে থামলো। এলাকায় তখন ডাকাতের প্রকোপ বেড়েছে বিধায় নতুন অনেক বড়

বড় পুলিশ অফিসারের পোস্টিং হয়েছিলো সেথায়।পুলিশের গাড়ি দেখতেই অবনীর বন্ধুবান্ধব সব ছুটে পালালো। আকষ্মিক ঘটনায় তাজ্জব অবনী বেগম। অবনী বেগমের ছোটোবেলা থেকেই একটা সমস্যা ছিলো, আকষ্মিক কোনো কিছু সে নিতে পারতো না। মাঝে মাঝে সে উদ্ভট কথাও বলে ফেলতো উত্তেজিত হয়ে। সেদিনও ঠিক এমনটা ঘটলো।

পুলিশ দেখে সব ছেলেমেয়ে যখন পালিয়ে গেলো অবনী তখনও ঠাঁই বসে আছে। তখন ছেলেমেয়ে পুলিশকে বাঘ ভাল্লুকের মতন ভয় পেতো। যেন কি ভয়ঙ্কর প্রাণী এই পুলিশ।

জীপ গাড়ি থেকে তখন বেশ সুঠাম দেহী, শ্যামলা বর্ণের একজন গম্ভীর মতন পুরুষ নেমে এলো। নেমেই সে অবনীর কাছে চলো এলো।

অবনীর হাতে কামরাঙ্গা, চোখে বিষ্ময়।

লোকটি অবনী বেগমের কাছে এসে ভরাট স্বরে প্রশ্ন করলেন,“এই যে নারী, গাছতলায় কি শুনি? ভরদুপুরে এমন জঙ্গলে কি করছেন?”

অবনী বেগম এর আগে কখনো অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে যায় নি। সেদিন হঠাৎ অপরিচিত পুরুষটিকে সামনে দেখে ভয়ে,

অস্বস্তিতে তার চোখ টলমল করে উঠলো। ঠোঁট উল্টে ফেললো। কেঁদে দিবে দিবে ভাব।

অবনীর লম্বাটে মুখ খানায় কালো মেঘের আনাগোনা দেখে ভড়কে গেলো পুলিশের পোশাকে থাকা গম্ভীর মানবটা। ব্যাতিব্যস্ত কণ্ঠে বললো,“এই যে জারুলকন্যা, কেঁদো না কেঁদো না। ভয় পাচ্ছো? আমি তোমায় বকি নি তো।”

জারুলকন্যা নাম শুনতেই অবনী বেগমের কান্না থেমে গেলো। সেই প্রথম, সেই প্রথম অবনী বেগমের মনে কোনো পুরুষের আদল ভেসে উঠলো। সেই প্রথম অবনী বেগম কিছু ভিন্ন অনুভূতির সাথে পরিচিত হলেন।

হঠাৎ গাড়ির হর্ণে ধ্যান ভাঙে অবনীর। অতীত ভাবতে ভাবতে আকাশের নীলাভ রঙ সরে গিয়ে

সাদা সাদা মেঘে ভরে গেছে। দিনের আলো ও ফুটে গেছে। অবনী বেগম হসপিটালের সামনে চলে এসেছে! টেরই পেলো না? অতীত এমনই মধুময় জিনিস যা ভুলিয়ে দেয় বর্তমান। তাই তো মানুষ সদা আফসোসের গান গেয় অতীত নিয়ে। আজ শনিবার। সওদাগর বাড়িতে তুমুল নিরবতা। হৈচৈ নেই কোনোরকমের। তৃষান আর দিশান

আজ হোস্টেলে চলে গিয়েছে। অহি ভার্সিটিতে, চিত্রা নিজের কলেজে। ছেলেরা যার যার কাজে। তুহিন গতকাল রাগ করে যে বাহিরে গেলো আর ফিরে আসে নি। তুহিনের রাগ বরারবরই অনেক বেশি। খুব সহজে না রাগলেও, রাগ উঠলে আর হুঁশ থাকে না।চঞ্চল বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেলো। খাবার টেবিলের হৈচৈ আর হয় না, টিভির

চ্যানেল নিয়ে ভাই-বোনদের আর মিছে মিছে তুমুল ঝগড়া হয় না, মাছের বড় টুকরোটা কে খাবে তা নিয়ে আরেক দফা বাকবিতন্ডাও আর হয় নি। কেমন বাড়িটার প্রতিটি কোণায় হাহাকার লেপ্টানো।

আফজাল সওদাগর তার নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। কপালে হাত রেখে, চোখ দু'টি বন্ধ। রোজা সওদাগর কপালের ঘাম মুছতে

মুছতে ঘরে প্রবেশ করতেই তার চোখ যায় স্বামীর নিস্তব্ধ দেহটার দিকে। রোজা বেগমের বড্ড মায়া হয় স্বামীর জন্য। স্বামীর জন্য এই রোজা সওদাগর কত কিছুই না করেছে? কত অন্যায় না মেনে নিয়েছে, কেবল স্বামীর মুখের হাসি দেখার জন্য। অথচ আজ সেই স্বামীই কিনা নিশ্চুপ! এ পরিবারটাকে সবসময় এক আঁচলের ছায়াতলে সে

রাখতে চেয়েছিলেন, তবুও আজ কোথাও যেন ভাঙার সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। একটা নারীর সংসারের চেয়ে বড় আর যে কিছু নেই। স্বামীকে এক ধ্যানে মগ্ন হতে দেখে রোজা সওদাগর স্বামীর পায়ের কাছটায় এসে বসলেন। ধীর কণ্ঠে শুধালেন,

“আপনি কী জেগে আছেন?”

আফজাল সওদাগরের ধ্যান ভাঙলো। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন করলেন না। যেমন আছে তেমন থেকেই বললেন, “হ্যাঁ, জেগে আছি। কিছু বলবে?”

“আপনার কি মন খারাপ?”

“মন খারাপ হওয়া টা স্বাভাবিক না, রোজা? যে ভাইদের জন্য এতকিছু করলাম আজ তারাই দাম দিচ্ছে না। এরচেয়ে কষ্ট আর আছে বলো? মা-বাবা যখন মারা গেলেন, দুটো ভাই,

একটা বোনের বটগাছ হয়ে দাঁড়ালাম আমি। অথচ আজ আমিই মূল্যহীন।”রোজা সওদাগরের খারাপ লাগলো। তার স্বামী প্রীতি বেশি। স্বামীর কষ্ট সে মানতে পারে না কখনোই।

রোজা সওদাগর আশ্বাসের স্বরে বললেন,

“আপনি চিন্তা করবেন না। নুরুল আজকাল কেমন হয়ে গেছে। বয়স

বাড়ছে তো। আর আপনি তো চিত্রার বিয়ের কথা আটকাতে চেয়েছিলেন, তা আটকেছে। আপাতত দেখে গেছে। পরে কথা আগানো হবে বলা হয়েছে। আর মন খারাপ করবেন না।”

আফজাল সওদাগর ধপ করে উঠে বসলেন। চোখ তার কেমন হলদেটে ভাব। সে তার স্ত্রীর হাত দুটো মুঠ

করে ধরলো। কেমন অসহায় কণ্ঠে বললো,

“পাপের ভার নিয়ে বেঁচে থাকা অনেক কষ্টের, বিবি। তুমি আমারে অভিশাপ দিছিলা তাই না? তাইতো আজ এ অবস্থা আমার।”স্বামীর কথায় আৎকে উঠলো রোজা। তওবা করে বললেন,

“কি বলেন আপনি! আপনারে অভিশাপ দেওয়ার আগে আমার

জিহ্বা খঁসে পড়ুক। আর আপনি যা পাপ বলছেন তা আদৌও পাপ না। আপনি তো জানেন আর আমার আল্লাহও জানে সেটা। আপনি এসব ভাববেন না।”

আফজাল সওদাগর অনবরত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,

“এটা পাপই বিবি। আমি তোমাদের ঠকিয়েছি। নিজের স্বার্থে আরেকজনকে ঠকিয়েছি। ওদের

মৃত্যুও তো আমায় অভিশাপ দিয়েছে।”

স্বামীর কথায় ভড়কে গেলে রোজা সওদাগর। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, “কাদের মৃত্যু?”

আফজাল সওদাগর উত্তর দিলেন না। আফসোসের অশ্রু গড়িয়ে গেলো তার গাল বেয়ে।গরমে ঘেমে-নেয়ে একাকার চিত্রা। সাদা কলেজ ইউনিফর্ম টা লেপ্টে গেছে শরীরে।

চুলের মাঝে দুই বেণী। পিঠে বইয়ের ভারী ব্যাগ। গতকাল তার দেখাদেখিটা সে অব্দিই সীমাবদ্ধ ছিলো। মাহাতাব দুলাভাই এর কারণে তা বেশি দূর অব্দি আগায় নি। আবার নওশাদ নামের লোকটাও বলেছে সময় নেওয়া উচিৎ দুই পক্ষের।

চিত্রার মনে কেমন যেন অশান্তি। বিরক্তিতে শরীরের প্রতিটা অঙ্গ

জ্বালা দিয়ে উঠছে। জীবনটা তার এত অসহ্য ছিলো না কখনো। আগে তার বাবা তাকে পছন্দ করতো না। সে জানতো না বাবা কেনো তাকে অপছন্দ করতো কিন্তু যখন সে জানলো বাবার অপছন্দের কারণ তখন থেকে চিত্রা নিজেই আর নিজেকে পছন্দ করছে না। জীবনটা হঠাৎ ই বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো।“এই চিত্রা, দাঁড়া।”

পথে মধ্যে চির পরিচিত কণ্ঠ শুনে দাঁড়ালো চিত্রা। পিছে ঘুরতেই চোখে পড়লো অহি আপার লাল টুকটুকে মুখটা। গরমে লাল হয়ে গেছে। চিত্রা কিঞ্চিৎ হাসলো অহি আপাকে দেখে। অহি ততক্ষণে চিত্রার কাছে চলে এসেছে।

“আপা, তোমার ক্লাস শেষ?”

“না রে, ভালো লাগছে না। যা গরম। বাসায় গিয়ে ঘুম দিবো। তোর ক্লাস শেষ?”

“হ্যাঁ আপা।”

“তো চল, একসাথে বাসায় যাই। ফুচকা খাবি, চিত্রা?”

অহি আপার প্রস্তাবে অবাক হলো চিত্রা। অহি কখনোই বাহিরের খাবার পছন্দ করে না। আর আজ সে কিনা, ফুচকার কথা বলছে!চিত্রার

অবাক বিস্মিত মুখ খানা দেখে ফিচলে হাসলো অহি। বাঁকা হেসে বললো,

“কিরে, খাবি না?”

চিত্রা দ্রুত মাথা নাড়ালো, যার অর্থ সে খাবে। অহি মিষ্টি হেসে চিত্রাকে নিয়ে পাশের একটা পার্কে গিয়ে বসলো। পাশের থাকা ফুচকার দোকানটা থেকে দু প্লেট ফুচকা দিতে বললো।

চিত্রা তখনো অবাক। অহি চিত্রার অবাক ভাবটাকে তেমন পাত্তা না দিয়ে আশেপাশে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে হুট করে বলে উঠলো,“একটা সিক্রেট শুনবি চিত্রা?”

চিত্রা তখন তার ব্যাগের ভেতর থেকে পানির বোতল টা বের করেছে। অহির কথায় ভ্রু কুঁচকে বললো,

“কি সিক্রেট, আপা?”

অহি বিবশ কণ্ঠে বললো,

“তোর ফুল গাছের টব গুলো আমি ভেঙেছি।”চিত্রার মুখে রাজ্যের বিস্ময়। অহি আপা তার ফুলের টব ভেঙেছে সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। অহি আপা হলো গিয়ে নরম মানুষ, তার দ্বারা এই শক্ত কাজ সম্ভব!

অহির দৃষ্টি তখনও পার্কের আশপাশ বুলাতে ব্যস্ত। চিত্রার বিস্ময়মাখা মুখ পানে সে একবারও ফিরে তাকায় নি। চোখের সাথে চোখ মিললেই যেন সে কত কথা বলতে পারবে না। তাই তো আজ চোখে চোখ মেলানো বারণ। এতদিনের জমানো কথার প্রজাপতিদের আজ উড়িয়ে দিতে হবে। কথা জমিয়ে রাখলে মনের উপর অত্যাচার চালানো হয়।

অথচ অহি নিজের মনের উপর সে অত্যাচার করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আজ নাহয় অত্যাচারের সমাপ্তি ঘটুক।

ছোট্টো একটা শ্বাস ফেললো অহি। ধীর কণ্ঠে বললো,“ভাবিস না তোর উপর হিংসে থেকে করেছি সেসব। তোর উপর হিংসে করার কিছু নেই। বরং মায়া করার মতন বহু কিছু

আছে। তবে আমার মায়া কম। কাক পক্ষীতে ছিঁড়ে খেয়েছে মায়া।”

অহি আপার কথার আগা মাথা কিছুই বুঝে নি চিত্রা। কেবল ফ্যালফ্যাল নয়নে চাইলো। কথা বলার শক্তিও যেন সে হারিয়েছে। অহি আপা কী বলছে, অহি আপা কি জানে?

“আপা, তুমি ঠিক আছো?”

চিত্রার প্রশ্নে আকাশ ছোঁয়া বিস্ময়। অহি কিঞ্চিৎ হাসলো। মাথা নাড়িয়ে বললো,“আছি ঠিক। তোকে আজ কিছু কথা বলবো চিত্রা। অনেক গুলো বছর এ কথা কাউকে বলা হয় নি। এই লজ্জা, এই আঁধারিয়া জীবনের গল্প কাউকে জানানো হয় নি। আজ তুই শুনিস সে গল্প। অহি আপার মৃত্যুর গল্প শুনে নিস খুব যতনে। কেউ তো আর জানলো না

এই অহির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মনের কথা।”

চিত্রা কেবল অপলক তাকিয়ে রইলো অহির দিকে। আপাকে আজ ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কেমন অপরিচিত একটা আদল ভেসে উঠছে। এটা কি সত্যিই অহি আপা?

“আরে সওদাগর বাড়ির নক্ষত্রমালা যে, তা তোমরা এখানে?”

পুরুষালী কণ্ঠে দুই বোনের কথার খেই হারালো। দু’জনই তাকালো তাদের ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটার দিকে। এলোমেলো চুল, টি-শার্ট এঁটে সেঁটে থাকা শরীর, কাঁধে ব্যাগ আর ক্লান্ত মুখশ্রীর বাহারের দিকে।

চিত্রা এবং অহি দু’জনই অবাক হলো বাহার ভাইকে দেখে। এসময়ে এখানে বাহার ভাইকে আশা করে নি

তারা। বসা থেকে দু’জনই উঠে দাঁড়ালো। অহি অবাক কণ্ঠে বললো,“বাহার ভাই আপনি?”

“হ্যাঁ আমি। তা তোমরা দু’জন এখানে কি করছো? তোমাদের তো এসব জায়গায় তেমন দেখা যায় না।”

“আসলে চিত্রা ফুচকা পছন্দ করে তো তাই এসেছিলাম ফুচকা খাওয়াতে।”

অহির উত্তর শুনে চিত্রা গোল গোল চোখে তাকালো অহির দিকে। অহি আপা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে জানে, এটাও চিত্রার জানা ছিলো না। আজ একের পর এক চমক দিচ্ছে অহি আপা।

বাহার এগিয়ে এসে ধপ করে বেঞ্চটাতে বসে পড়লো। আড়মোড়া ভেঙে বললো,“তা বেশ ভালো তো। তোমাদের মধ্যে এত মহব্বত তো

ঠিক দেখা যায় না, একবারে ধূমকেতুর মতন।”

কথা শেষ করেই হা হা করে উদ্ভট ভাবে হেসে দিলো বাহার ভাই। বাহার ভাইয়ের অদ্ভুত হাসির সাথে তাল মেলালো অহিও। অথচ এমন একটা বিদঘুটে ঠাট্টা অন্য কেউ করলে অহি আপা তাকে এখানেই উচিৎ জবাব দিয়ে দিতো।

চিত্রা কেবল দেখে গেলো অহি আপা আর বাহার ভাইয়ের কান্ড। তন্মধ্যেই ফুচকার প্লেট হাজির হলো। অহি নিজের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দোকানদারকে দিয়ে এসে বাহারের সামনে দাঁড়ালো। বেশ ব্যস্ত কণ্ঠে বললো,

“আপনি কী এখন বাড়ি যাবেন, বাহার ভাই?

“হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।”“তাহলে চিত্রাকেও সাথে নিয়ে যাবেন প্লিজ। আসলে আমার একটা দরকারী কাজ আছে তো, এখনই যেতে হবে।”

অহির অনুরোধে বাহার ভাই একবার চিত্রার দিকে তাকালো। চিত্রা এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিলো বিধায় দু’জনেরই চোখে চেখে পড়লো। বাহার সাথে সাথেই চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। এতে ছোটো হয়ে

এলো চিত্রার মন। কারণ সে জানে, বাহার ভাই কখনোই রাজি হবে না। কিন্তু চিত্রাকে অবাক করে দিয়ে বাহার বললো,

“কোলে করে নিবো নাকি কাঁধে করে?”

বাহারের উদ্ভট কথার ভঙ্গিতে আবার হেসে ফেললো অহি। মুখ চেপে বললো,

“আপাতত রিক্সা করে নিলেই হবে।”

চিত্রা মুখ ফুলালো। আড় চোখে অহির দিকে তাকিয়ে বললো,“আপা, তোমার না এখন বাড়ি যাওয়ার কথা? তাহলে এখন আবার কোথায় যাবে তুমি?”

অহি চিত্রার কাছে গেলো, চিত্রার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললো,

“দরকারী কাজে যাবো। টাকাটা রাখ, রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিস। বাহার ভাইয়ের কাছে মনে হয় টাকা নেই।”

চিত্রা কেবল আহাম্মকের মতন মাথা দুলালো। অহি ততক্ষণে ঝড়ের গতিতে তাদের সামনে থেকে চলে গেলো। যেন তার কাজটা কত জরুরী। এখন না গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।কোলাহল পূর্ণ

রাস্তায় একদম একা হেঁটে যাচ্ছে অহি। তার কোনো গন্তব্য নেই, না আছে নির্দিষ্ট কাজ। কেবল বাহার আর চিত্রাকে একটু একা ছাড়ার জন্য ই এ মিছে অজুহাত। আর কেউ জানুক আর না জানুক, সে তো জানে, বাহার ভাইয়ের গিটারের করুণ সুরের কথা। মাঝ রাত্তিরে বাহার ভাইয়ের দীর্ঘশ্বাসের কথা। সেখানে যদি চিত্রা এসব দূর করার

চাবিকাঠি হয় তাহলে তো আর মন্দ হয় না। সবাইকে কি আর এক জনমে পাওয়া হয়? বাহার ভাই নাহয় অহির একজীবনের অপ্রাপ্তি হয়ে রইলো।

“এই-যে মিস, শুনেন প্লিজ, সিঙেল আছেন কী?”অহির ধ্যান ভাঙলো, মনে হলো তাকে উদ্দেশ্য করেই যেন কেউ গানটা গাইলো। পথচারীর কয়েকজন আড় চোখে চাইলো। অহি

ঘুরে পেছনে তাকাতেই খুব স্বল্প পরিচিত মুখটা ভেসে উঠলো। অহি অবাক কণ্ঠে বললো,

“আপনি! গানটা কী আপনি গাইলেন?”

সুন্দর দেখতে সুঠাম দেহী পুরুষ টা মুচকি হাসলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,

“হ্যাঁ মিস. আমিই গাইলাম।”

অহির চোখে-মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“আপনি কী আমায় চিনতে পারেন নি?”

ভদ্র লোক এগিয়ে এলো, মিষ্টি হাসি দিয়ে বললো,

“চিনবো না কেনো? গত পরশুই তো দেখলাম আপনাকে। কালো জামা পড়নে, গোল গোল চশমায়, মিষ্টি দেখতে মেয়েটা।”লোকটার কথার

ধাঁচ পছন্দ হলো না অহির। এমন একটা ছেলের জন্য কিনা চাচা চিত্রার বিয়ে ঠিক করেছে? ছেলেটা কেমন গায়ে পড়া গোছের।

অহির চোখ-মুখ কুঁচকানোর ভঙ্গিমা দেখেই নওশাদ হয়তো কিছু আন্দাজ করলো। তাই তো বেশ ঠাট্টার স্বরে বললো,

“আপনি কী আমায় চরম অভদ্র ভাবছেন, মিস?”

অহি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বেশ ভদ্র ভাবে বললো,

“দেখুন মিস্টার, আপনার সাথে আমাদের পরিবারের একটা সুন্দর সম্পর্কের কথা হচ্ছে, তাই আপনার কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করছি না।”

“সুন্দর সম্পর্কে ঠাট্টা করা কি নিষিদ্ধ? চলুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।”

নওশাদ ছেলেটাকে অভদ্র কখনোই মনে হয় না। বেশ ভদ্রই মনে হয়, তবুও তার অহেতুক ঠাট্টা টা অহির পছন্দ হয় নি। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সে পা মেলালো। অহিকে হাঁটতে দেখে মিষ্টি হাসলো নওশাদ। ক্ষীণ স্বরে বললো,

“আপনাকে নিয়ে হাঁটা হবে মোর শত আলোকবর্ষ পথ।”রিক্সার হুড উঠানো, গতি মাধ্যম, চলছে

অনবরত। পাশাপাশি বসে আছে চিত্রা আর বাহার ভাই। চুপচাপ, স্তব্ধ। অন্য সময় হলে চিত্রাই কত কথার ঝুড়ি নিয়ে বসতো, কিন্তু আজ তার মনে ভীষণ শোক। কথা বলা যাবে না, আর এ পাষণ্ড পুরুষের সাথে তো আরও আগে কথা বলবে না সে।

রাস্তার দুই সারিতে কৃষ্ণচূড়া গাছের মেলা। কি সুন্দর লাল টুকটুকে ফুল

হাসছে অনবরত। রিক্সার ক্রিং ক্রিং শব্দ।

নিরবতা ভাঙলো বাহার। বরাবরের মতন গা ছাড়া ভাবে বললো,

“তা রঙ্গনা, মিষ্টি তো খাওয়ালে না।”

চিত্রা অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো। লোকটা তাকে খুঁচিয়ে কী মজা পায়? হৃদয়ের জ্বালা বাড়িয়ে কি তৃপ্তি মেলে লোকটার?ছোটো একটা শ্বাস ফেলে সে। বুকের ভেতর ভারী ভারী হয়ে

উঠে কষ্টরা। লোকটার সাথে কথা ই বলবে না সে।

“অভিমান জমিয়ে রেখে লাভ কী? আমরা বাঁচবোই বা কতদিন?”

বাহার ভাইয়ের গম্ভীর স্বর কাঁপন ধরালো চিত্রার চিত্তে। হুট করে তাকাতেই দু’জনের চোখে চোখ পড়লো। সময়টা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মধুর হলো। নিশ্বাসের গতি

বেড়ে গেলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। লজ্জারা খেলা করলো সর্বাঙ্গে।

চিত্রা চোখ সরিয়ে নিলো। বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে করতে বললো,

“অভিমান অভিযোগ নেই আমার।”

“না থাকাটাই স্বাভাবিক। পর মানুষের প্রতি অভিমান রাখতে নেই, রঙ্গনা।”

বাহারের কণ্ঠে তুমুল গম্ভীরতা। কথার এমন তীক্ষ্ণতায় অভিমান করলো অষ্টাদশীর হৃদয়। ঠোঁট ফুলিয়ে টলমল করে উঠলো চক্ষুদ্বয়। বাহার ছোট্টো ধমক দিলো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো,“এই মেয়ে, কথায় কথায় কান্না করার স্বভাব বদলাও। কান্নাকে সস্তা বানিয়ো না, নিজের সবটা সত্তাকে সবচেয়ে মূল্যবান

রাখার চেষ্টা করবে। হোক কান্না কিংবা হাসি।”

“আমি আপনার সাথে রাগ করেছি, বাহার ভাই।”

“তো রাগ করেই থাকো। আমি কী তোমার রাগ ভাঙাতে এসেছি?”

বাহারের গা ছাড়া ভাবে চিত্রা গাল ফুলিয়ে বসে রইলো। বাহার ভাই পকেট থেকে সিগারেট বের করে জ্বালাতে জ্বালাতে বললো,

“তোমায় জ্বালাতে এত সুখ লাগে কেনো? কোন দিন যেন যেচে জ্বলতে এসে ছাই হয়ে যাও।”

“আপনি জ্বালালে, ছাই হতেও রাজি।”

“শুনো রঙ্গনা, অনুভূতির এমন প্রকাশ্যে বর্ণনা আমার পছন্দ না। অনুভূতি গোপনে রাখতে হয়, তবেই না মূল্যবান হবে।”বাহারের কথায় অপমানিত হলো চিত্রা সাথে

তাজ্জবও বনে গেলো। ততক্ষণে রিক্সা এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। চিত্রা ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে বললো,

“আর অনুভূতি মেলে ধরবো না, বাহার ভাই। সবাই তো সবটার মূল্য দিতে জানেনা, আমি ভুলেই গেছিলাম।”

চিত্রার তীক্ষ্ণ কথাতেও হেলদোল হলো না বাহারের। সে বরং বেশ গা ছাড়া ভাবেই বললো,

“এই যে মেয়ে রঙ্গনা, তোমার মুখে অভিমান মানায়, অভিযোগ না।”

চিত্রা ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। বাহার ছোটো একটা শ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার ভেসে গেলো তার সাথে। আজ টিউশনিটাও চলে গেছে। এমন মানুষের প্রেমে

মত্ত হওয়া মানায়? যার বাঁচা মরারই ঠিক নেই।
আফসোস গুলো সে হাওয়ায় মিলিয়ে গান ধরে,
“জীবন দিলা কাঞ্চা বাঁশের খাঁচারই মতো,
যত্ন নেওয়ার আগে তাহা, ভাঙে অবিরত দয়াল,
ভাঙে অবিরত।”আজ সারাদিন দেখা মেলে নি মুনিয়া বেগমের। প্রথমে

সবাই ভেবেছিলো রাগ করে হয়তো দোর দিয়েছেন, কিন্তু যখন দরজার সামনে পর্দা সরালো তখন দেখা গেলো দরজা বাহির থেকে আটকানো। দরজা খুলে ভেতরে যেতেই শূণ্য রুমখানি জানিয়ে দিলো মুনিয়া বেগম নেই। বিছানার কিনারায় সাদা চিরকুট।তুলোর মতন মেঘ গুচ্ছ বিচরণ করছে আকাশে। মিঠে বাতাস, কোমল লাল বর্ণা

আকাশ। প্রকৃতিটা কবির ভাষায় কবিতার যোগ্য, প্রেমিকার প্রেম জাগরণের মতন, বিষাদে আচ্ছাদিত মানুষের মনে উৎফুল্লতা আনার মতন।

ছাদে মন খারাপে আবিষ্ট চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। সময়টা ঠিক দিনের তৃতীয় ধাপ- অপরাহ্ন। মুনিয়া বেগম বাড়ি ছেড়েছেন আজ দু'টো দিন হতে চললো। গতকাল থেকে এ

অব্দি তার কোনো খোঁজ নেই। চিঠিতে সে চরম অভিযোগের স্বরে লিখে গেছে তার চলে যাওয়ার কথা। চিত্রাই যে সে অভিযোগের কারণ তা লিখতেও বাদ রাখেন নি সে।চিত্রা তার বা'হাতে গুঁজে রাখা মায়ের চিরকুট টা নিজের অক্ষি দ্বয়ের সামনে মেলে ধরলো। যেখানে কি সুন্দর করে গোটা গোটা অক্ষরে লিখা,

প্রিয় চিত্রাঙ্গণা,

চিঠির শুরুতে আমার এক আকাশ ভালোবাসা নিও। তোমায় আমি কতটা ভালোবাসি তা নিশ্চয় তোমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে না, তাই না? তোমার প্রতি আমার এক অগাধ মায়া আছে, কেনো জানো? তোমায় যেদিন দু'হাতের মাঝে পেয়ে চোখ ভরে দেখলাম, সেদিন মনে হলো আমার মাকে দেখছি। সেই দু

দিনের শিশুটা কি মায়া লাগালো আমায় কে জানে, এরপর থেকে আমি আমার মা হারানোর শোক ভুলে গেলাম। তোমার পুরো না তোফা চিত্রাঙ্গণা। তোমার নামের আগে পরে কোনো পরিচয় নেই কেনো বলো তো?কারণ আমি তোমায় এমন বানাতে চেয়ে ছিলাম যেন তুমিই তোমার পরিচয় হও। শখ করে রেখেছিলাম তোফা। মানে,

উপহার। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহার তুমি আমার। অথচ আজ তুমি আমার সব ভালোবাসা ভুলে, বাবার মোহে পরে ভুল সিদ্ধান্তে ডুব দিয়েছো। আমি তোমার এমন ক্ষতি দেখতে পারবো না। আমি এ ও জানি, তোমার বাবা হয়তো খুব বাজে ভাবে পিষে ফেলেছে তোমার মন গোপন কোনো কথার আস্তরণে তাই তোমার ও

সিদ্ধান্ত। কিন্তু মা, তুমি পিষে যাওয়া টা দেখলে আর আমায় দেখলে না তা যে মানতে পারবো না। তুমি নাহয় তোমার বাবার কথায় জলাঞ্জলি দেও তোমার জীবন, আমি তা দেখতে পারবো না। ভালো থেকো।

ইতি

তোমার তথাকথিত 'মা'।"চিঠির শেষে সম্বোধনটাই যেন চিত্রাকে

র*ক্তা*ক্ত করতে যথেষ্ট। মা কতটা কষ্ট পেলে নিজেকে এভাবে সম্বোধন করেছে! কিন্তু সেও বা কী করবে? বাবা সেদিন রাতে তাকে তার জীবনের এমন ভয়াবহতার কথা জানিয়েছে যা সে মানতে পারে নি। এমন একটা অপ্রত্যাশিত অতীত সে ভাবতে পারে নি। ঘৃণায় ভরে গিয়েছিলো তার দেহ। পৃথিবীর সব যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচা যায় কিন্তু নিজেকে

ঘৃণা করে আদৌও বাঁচা যায়? অথচ বিধির বিধান, আত্মহত্যা মহাপাপ। যেখানে জীবনটাই পাপের ফসল সেখানে মহাপাপটাও কেমন হাস্যকর।

অশ্রুরা গোপনে ঝরে গেলো মুক্তোর মতন। তাদের কেমন বিবর্ণতা!

“আরে আমাদের চিতাবাঘ, করে কি একা একা?”

পেছন থেকে কারো কণ্ঠ ভেসে আসতেই চিত্রা চোখের অশ্রু মুছে ফেললো। দুর্বলতা আড়ালেই রাখতে হবে, জেনে গেলেই তো জ্বালিয়ে দিবে মানুষ।চাঁদনীও ততক্ষণে তার ভারী পেট নিয়ে অহির সাহায্যে চিত্রার কাছে এসে দাঁড়ালো। অহি আপাকে কত সুন্দর লাগে আজকাল! মাতৃত্বের সৌন্দর্যতা পৃথিবীর সব সুন্দরকে হার মানায়। কি সুন্দর!

চাঁদনীর মিষ্টি হাসির পরিবর্তে চিত্রাও হাসলো। কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে বললো,

“চাঁদ আপা গো, তোমায় এত সুন্দর কেনো লাগে?”

চাঁদনী গাল টেনে দিলো চিত্রার। মিষ্টি হেসে বললো,

“সত্যিই সুন্দর লাগে নাকি রে? কই তোর দুলাভাই আদর-টাদর করে যে না এখন। মুটিয়ে গেছি কিনা।”

চাঁদনী আপার কথার ধরণে ফিক করে হেসে উঠলো চিত্রা। হাসতে হাসতে বললো,

“ছি আপা, শরম পাচ্ছো না তুমি?”“শরম কেনো পাবো রে? সত্যি কথা বলতে কিসের শরম? শুনেছি দিনে চৌদ্দ বার সত্যি কথা বলা যায়। আমি তো মাত্র একবার বললাম, তাও তোরা সহ্য করতে পারছিস না?”

চিত্রা আর অহি সশব্দে আবার হেসে উঠলো। চাঁদনী আপা যে চিত্রাকে হাসানোর জন্যই এসব বলেছে তা আর বুজতে বাকি নেই কারো। তাল মিলিয়ে নাহয় হাসা যাক। এই মানুষ গুলো তো ভালোবেসেছে অনেক।

হাসতে হাসতে কখন যেন আনমনেই চোখ থেকে গাড়িয়ে পড়লো অশ্রুকণা রা। আনমনেই, না চাইতেও শব্দ করে কেঁদে উঠলো

চিত্রা। সে যে ব্যাথা লুকানোর মতন অত কঠিন আজও হতে পারে নি। আজও তার হৃদয়কে কংক্রিট ছুঁয়ে দিতে পারে নি।চাঁদনী এবং অহি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অহি এই প্রথম চিত্রাকে জড়িয়ে ধরলো। আদুরে স্বরে বললো,

“কাঁদিস না চিত্রা, চাচী ফিরে আসবে।”

আদুরে আলাপে কান্নারা আহ্লাদ পেয়ে বসলো। গা ছিটকে বেরিয়ে এলো তারা। কিছু কিছু সময় আমাদের অনুভূতিরা বড্ড অবাধ্য হয়।দেখতে দেখতে ভ্যাটিকান সিটিতে আজ কতদিনের বসবাস অবনী বেগমের। চেরিও এখন বেশ সুস্থ। এত দ্রুত তার সুস্থতা কল্পনার বাহিরে ছিলো। মেয়েটাও হয়তো বুঝেছে তার মায়ের এ দেশে ভীষণ

কষ্ট হচ্ছে। একাকীত্বের হাহাকার তার মাকেও কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। মেয়ের মাথায় অনবরত হাত বুলিয়ে যাচ্ছে অবনী বেগম। আর কয়েকদিন পরই দেশের মাটিতে হয়তো ফিরে যেতে পারবে তারা। হয়তো দুঃখ ভুলে আবার বাঁচতে পারবে সে। হয়তো আবারও হাসি-খুশি একটা জীবন পাবে তারা। জীবনে অবনী বেগমের চাওয়ার আর

কি ছিলো? একটু সুখ, একটু ভালো থাকতে চাওয়ার ইচ্ছে ছাড়া? কিন্তু হঠাৎ জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে যায় সেই অপরিচিত পুরুষের আগমনে। এরপর কত-শত দিন গেলো, অবনী বেগম কেবল বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে ছিলেন। অহি যখন হলো তখন তার বয়স আঠারো-উনিশ হবে। সে মানতে পারে নি অহিকে প্রথম প্রথম। সবার অমতে মেয়েটাকে

হোস্টেলে রাখে। কিন্তু যখন মা হওয়ার মর্ম বুঝলো ততদিনে মেয়েটা তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কাছাকাছি এনেও সে দুরত্ব মেটাতে পারে নি সে।অবনীর ভাবনার মাঝে কেবিনের দরজা খুলে প্রবেশ করলো আমজাদ। পরনে তার বেশ ফর্মাল পোশাক। প্রতিদিন সে মেয়েকে এসে দেখে যায়। স্ত্রীর

সাথে খুব কমই কথা হয় তার। না পারতে বলে আর কি।

আমজাদকে দেখেও তেমন একটা হেলদোল দেখালো না অবনী। আগের জায়গায় বসে রইলো নীরব হয়ে। আমজাদ কেবিনে প্রবেশ করেই শার্টের বোতাম দু'টো খুলে দিলো। সরাসরি অফিস থেকে এসেছে বোধহয়। ফোনটা চেরির বেডে রেখে সে কেবিনের সাথে

লাগোয়া ওয়াশরুমে গেলো বোধহয় হাত-মুখ ধোয়ার জন্য। আমজাদের বয়স পয়তাল্লিশের এপার-ওপার হবে। এখনো দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। যখন তাদের বিয়ে হয় তখনও আমজাদ এতটা বোধহয় সুপুরুষ ছিলো না। কেমন বোকা বোকা। সাধে কি আর মানুষ বউ পাগল বলতো! অথচ আজ সে আমজাদ গম্ভীর, শীতল।হঠাৎ নিস্তব্ধ

এই কেবিনটাকে শব্দে ভরিয়ে দিতে উচ্চশব্দে বেজে উঠলো আমজাদ সওদাগরের ফোন। অবনী বেগম তাকাবে না তাকাবে না করেও কৌতুহল নিয়ে তাকালো ফোনের স্ক্রিনে, যেখানে জ্বলজ্বল করছে সেই মধ্য রাতের হৃদয় ঝলসে দেওয়া নাম টা 'জেসি'।

অবনী বেগম সাথে সাথে শ্বাসটা বন্ধ করে নিলেন। এ বয়সে এসে সঙ্গী

হারানোর তীব্র ব্যাথা সে নিতে চায় না। অথচ সে যতই দূরে যাচ্ছে সেসবের থেকে, ততই যেন তাকে এসব জাপ্টে ধরছে। বার বার একই যন্ত্রণা যে কতটা ভয়ঙ্কর তা ব্যাখ্যা করার মতো না।

ফোনটা বাজতে বাজতে কেটে যেতেই ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো আমজাদ। অবনীর ঘামে চুপচুপ হওয়া মুখমন্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ

হলো তার। অবনীর কাছে এসেই সে অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,

“এমন শীতল রুমেও ঘামছো কেনো, অবু? তোমার কী শরীর খারাপ করছে?”

অবনী বেগম নিজেকে যথেষ্ট সংযত করার চেষ্টা চালালেন। অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষমও হলো সে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন নিজের মুখমণ্ডল

টা। অতঃপর বেশ ধীর কণ্ঠে বললো,“ঠিক আছি আমি।”

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না আমজাদ সওদাগর। স্ত্রীর পাশে এসে কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষাও করলেন সে। তাপমাত্রা স্বাভাবিক দেখে কপাল কুঁচকালেন। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,

“জ্বরও তো উঠে নি। তবে এমন অসুস্থ লাগছে কেনো তোমাকে?”

“আজও আমার অসুস্থতা তোমায় ছুঁতে পারে, আমজাদ?”

অবনীর চল্লিশতম বয়সের কণ্ঠে পঞ্চদশীর ছোঁয়া। কি প্রগাঢ় অভিমানে ছাপ! আমজাদ কি বুঝতে পারলো সে অভিমান!

তন্মধ্যেই আবারও সশব্দে বেজে উঠলো আমজাদের ফোন। ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে সে খুব ধীরে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

অবনী বেগম শ্বাস ফেললেন। তাচ্ছিল্য করে বললেন,

“কিছু মানুষের কখনো নিজিস্ব ঠিকানা হয় না। ভবঘুরে হয় সে মানুষ। আমিও তেমন কূলহীন।”কোচিং এর নাম করে বেশ রাত হলো চিত্রা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা ছাড়া বাড়িটাতে তার এক মুহূর্ত ভালো লাগে না। কেমন পানসে লাগে সব! পৃথিবীটা হুট

করে কেমন তেতো তেতো ঠেকছে। মা-ই বুঝি পৃথিবীর মধু!

কাঁধে ব্যাগ। ছোটো চুল গুলো এক পাশে বেণীগাঁথা। শরীরে বেশ সাদামাটা জামা। ছাঁই রাঙা। এধার ও ধার কেবল উদ্দেশ্য বিহীন ঘুরে বেড়ানো।

“আরে, রঙ্গনা রাস্তায় কি করে?”

চিত্রা থামলো। একা রাস্তায় একাকীত্ব কাটানোর মানুষ এলো।

সে ধীর গতিতে পাশ ফিরে চাইতেই বাহারের হাস্যোজ্জ্বল মুখটা দৃষ্টিগোচর হলো। বাহার ভাই সচারাচর হাসেন না, অথচ আজ কি সুন্দর হাসির ঝিলিক মুখ জুড়ে।

চিত্রা থামলো। ধীর কণ্ঠে বললো,“আপনি এ রাস্তায় যে, বাহার ভাই?”

বাহার চিত্রার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললো,

“হ্যাঁ, কাজে এসেছিলাম। তা তুমি এখানে কেনো?”

“এমনেই, কোচিং করতে এসেছিলাম।”

“তোমার কোচিং এর রাস্তা এটা তো না। ঘুরছিলে একা একা?”

বাহারের দৃষ্টি তখনো চিত্রার মুখমন্ডল জুড়ে। চোখে অবাধ প্রশ্নদের ছড়াছড়ি।

চিত্রা ধীর কণ্ঠে বললো,

“ভালো লাগছিলো না, বাহার ভাই। আম্মু যে কোথায় গেলো।”

“চিন্তা করো না, ফিরে আসবেন। তোমার মিছে জেদের জন্য উনি বোধহয় অনেক কষ্ট পেয়েছে। অহেতুক কাজ টা না করলেও পারতে।”চিত্রার খুব গোপনে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কোমল কণ্ঠে বললো,

“আমি কি করতে চেয়েছিলাম নিজের সর্বনাশ! বাবা’র আকুতি, আমার অতীত নিয়ে তাচ্ছিল্য আমি মেনে নিতে পারি নি, বাহার ভাই।”

বাহার দাঁড়ালো। চিত্রার মুখে তাকালো। কিছু একটা ভেবে সে ফুটপাতের কিনারায় এসে বসলো। হলুদ আলোয় রাস্তাটা কেমন মোহনীয় লাগলো! চিত্রাও বাহারের পাশে এসে বসলো। বহুদিনের শখ

তার, বাহার ভাইয়ের পাশে বসে রাতের রাস্তা দেখবে, সোডিয়ামের কৃত্রিম আলোয় নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করবে। তবে কি খুব দ্রুতই এসে পড়লো সে দিন খানা? পাশের টং দোকান থেকে বাহার গরম গরম দু'কাপ চা নিয়ে এলো। চিত্রার দিকে চা এগিয়ে দিয়ে নরম কণ্ঠে বললো,

“এবার বলো তো, হুট করে বিয়ের মতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কী? কি হয়েছিলো?”

চিত্রা চায়ের কাপটা হাতে নিলো। চোখ জুড়ে নেমে এলো তার সে দিন রাতের কথা,

সেদিন নুরুল সওদাগরের এমন পরিবর্তনে অবাক হয়েছিলো চিত্রা। বাবা হঠাৎ এত স্নেহ ঢেলে দিচ্ছে ভেবে চোখ-মুখ টলমল করে উঠে

তার। নুরুল সওদাগরের দৃষ্টি তখনো বাড়ির সামনের রাস্তায়। সে রাস্তায় মানুষ-জনের আনাগোনা দেখতে দেখতে হুট করে চিত্রাকে বললো,”চা বানাতে পারো?”

চিত্রা তখনো কিংকর্তব্যবিমুঢ়। বাবার হুট করে বলা উঠে প্রশ্নে সে হতভম্ব। নুরুল সওদাগর মেয়েকে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

আবার প্রশ্ন ছুঁড়লো, “পারো চা বানাতে?”

চিত্রা চা বানাতে পারে না কিন্তু তবুও বাবার প্রশ্নে উপর-নীচ মাথা নাড়ালো। ধীর কণ্ঠে বললো, “হ্যাঁ আব্বু,পারি।”

“তাহলে দুকাপ চা নিয়ে এসো চট জলদি। আমি অপেক্ষা করছি।”বাবার বলতে দেরি অথচ চিত্রার ছুটে যেতে দেরি নেই। চা না

বানাতে পারা চিত্রাও সেদিন হাত পুড়িয়ে চা বানালো। আধাঘন্টার মাঝে সে চা নিয়ে ঘরে পৌঁছালো। তখনও বাবা আগের মতন ঠাঁই বসে আছেন। চিত্রা চা এগিয়ে দিতেই নুরুল সওদাগর বেশ হাসি মুখে চা নিয়ে নিলেন। চিত্রাকেও অপর চায়ের কাপটা মুখে দেওয়ার ইশারা করলেন।

পোড়া হাত নিয়েই চিত্রা চায়ের কাপ মুখে তুললো। নুরুল সওদাগর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির দৃষ্টি ফেলেন। চমৎকার এক হাসি দিয়ে বলেন, “বাহ্, চা তো বেশ বানাতে পারো।”চিত্রা কেবল অস্বস্তি নিয়ে ক্ষীণ হাসি দিলো। নুরুল সওদাগর চায়ের কাপটা পিরিচের উপর রেখেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেমন বিবশ কণ্ঠে বললেন, “তোমায় আজ

কিছু কথা বলি, চিত্রা? তোমার তো উচিত নিজের জন্ম পরিচয় জানা, তাই না?”

চিত্রা বাবার কথায় অবাক হলো। হৃদপিণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় দ্রুত লাফাচ্ছে যেন। বাবা কি তার জীবনের চির সত্যি কথাটা আজ বলবে?

নুরুল সওদাগর তন্মধ্যেই বলা শুরু করলেন,“তোমায় অপছন্দ করার

সবচেয়ে বড় কারণ কি জানো? তুমি আমার মেয়ে না।”

বাবার মুখে এমন একটা কথা শুনে ঘুরে উঠেছিলো চিত্রার পৃথিবী। বিস্ফো*রিত নয়নে সে বাবার দিকে তাকায়। নুরুল সওদাগর সে দৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়েই বললেন,

“হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তুমি এই সওদাগর বাড়ির কেউ না।”

চিত্রা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। অনড় তার দৃষ্টি, ভাষারা তখন স্তব্ধ। নুরুল সওদাগর তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন চিত্রার উপর থেকে, তা রাস্তায় নিবদ্ধ করে বললেন,“তুমি আমার মেয়ে না, এটা তোমাকে অপছন্দ করার বড় কারণ হলেও, তার চেয়ে বড় কারণ হলো তুমি একজন নিষিদ্ধ পল্লির মায়ের মেয়ে।”

চিত্রা ততক্ষণে হতভম্ব। পায়ের নিচের মাটিটাও যেন খুঁজে পেলো না। কি শব্দ উচ্চারণ করলো বাবা? রাতটা যেন হুট করেই প্রয়োজনের তুলনায় নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। চিত্রা অপলক তাকিয়ে ছিলো তার বাবার দিকে। সে ভেবেছে বাবা হয়তো মজা করছে, পরমুহূর্তেই বাবা হয়তো হো হো করে হেসে উঠে বলবে, ‘কেমন ঢপ

দিলুম, বলো তো?’- কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। বাবার মুখটা গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হলো। গাম্ভীর্যের সেই আবরণ যেন ছেয়ে গেলো প্রকৃতির মাঝেও। সোডিয়ামের মোহনীয় সেই হলুদ বর্ণ আলোটার মাঝেও কেমন অবিশ্বাস্যের উজ্জ্বলতা। চিত্রা বাবার দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকটা সময় নীরব থেকে অবিশ্বাস্যকর কণ্ঠে বললো,

“আব্বু, কি বলছেন এসব?”নুরুল সওদাগর খুব গোপনে শ্বাস ফেললেন। সে আর বেশিক্ষণ চিত্রার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলে না। বারান্দার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বেশ রুক্ষ কণ্ঠে বললেন,

“সত্যিই বলছি সব। তুমি তখন দু’দিনের শিশু। নিষিদ্ধ পল্লির মহিলাদের সন্তান জন্ম দেওয়া নিষেধ। কিন্তু যদি সেই সন্তান মেয়ে

হয় তাহলে তারা ধুমধাম করেই বরণ করে নেয় সেই সন্তানকে কারণ ভবিষ্যতে তাদের ব্যবসার লাভজনক মূলধন সেটা। তোমাকে যে জন্ম দিয়েছে, তোমার জন্মদাত্রী, সে চায় নি তার মতন এমন দোযখ তোমার ভাগ্যে জুটুক। তুমি জন্ম নিবে বলে তাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয়। তখন তোমার তুহিন ভাইজান ও অসুস্থ তাই আমরা সে

হসপিটালে গিয়েছিলাম। তোমার জন্মদাত্রী হুট করেই তোমার মায়ের কোলে তোমাকে তুলে দিয়ে আকুতি মিনতি করে উঠলো। তার জীবনের ভয়ঙ্কর বর্ণনাও দিলো। তোমার মায়েরও শিশুদের প্রতি সহমর্মিতা বেশি ছিলো, তাই নিয়ে এলো তোমায়। এ বাড়ির কোনো মানুষ জানেনা তুমি কার মেয়ে। কেবল আমি আর তোমার মা জানি তোমার

জন্মপরিচয়।”চিত্রার নয়নে ঘেঁষে ততক্ষণে ঝরে পড়েছে কত অশ্রুকণা! ঘৃণায় ভরে উঠেছে আঙিনা। এক মুহূর্তে মিছে হয়ে গেলো তার এই জনম। কি নোংরা! কি বিচ্ছিরি অতীত! মনে হলো সে যেন কোনো নর্দমার কীট। সমাজের এক নোংরা মানুষ। আব্বু যে তাকে পছন্দ করতেন না, সেটাই তার

প্রাপ্য। এত ভালোবাসা তো কভু তার প্রাপ্য ছিলো না।

নুরুল সওদাগর চায়ের কাপটা বারান্দার চওড়া গ্রিলটার উপর রাখলো। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে নিলো তার মুখমন্ডল। মুখ মোছার নাম করে কিছু অশ্রুকণাও বোধহয় মুছে নিলেন। কে জানে, আঁধারের কোল ঘেষে যাওয়া গল্পের কথা!

পকেটের রুমাল পকেটে রেখে নুরুল সওদাগর গলা পরিষ্কার করে বললেন,“তুমি তো জানলে তোমার অতীত। এখন একটা কথা রাখবে?”
চিত্রার কণ্ঠে তখনও কান্নার ছাপ। তবুও সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো,
“জি আব্বু, বলেন।”
“তুমি বিয়ে করে ফেলো চিত্রা। মনে করো না তোমায় অপছন্দ করি বলে

সেটা বলছি। তুমি আমার দায়িত্বে ছিলে, আমি তোমার ভালো একটা ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে চাই। আজ আছি কাল না ও থাকতে পারি। তোমার দায় ভার তখন কে নিবে? এ বাড়ির সবাই হয়তো তোমায় ভালোবাসে, কিন্তু আমরা না থাকলে তারা হয়তো ফিরেও চাইবে না, কারণ তোমার সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক নেই।”চিত্রার অবুঝ মন পরপর

ধাক্কায় তখন নিস্তব্ধ। রাতের দীর্ঘশ্বাস গুলো তখন বুকের ভেতর জমে জমে পাহাড় সমান হয়ে গেছে। এই পাহাড়ের ভীষণ ওজন নিতে পারছে না চিত্রা। কেমন দমবন্ধ হয়ে এসেছিল সেদিন। আবেগের বশেই কিংবা নিজের প্রতি ঘৃণা থেকে সে রাজি হয়ে গেলো বাবার প্রস্তাবে। হয়তো ঋণ শুধরানোর অপচেষ্টা টাও ছিলো।

সেদিনের কথা থামতেই বিরাট এক বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো চিত্রা। সেদিন কাঁদলেও, আজ কাঁদছে না চিত্রা। হুট করে কি সে পাথর হয়ে গেলো?

বাহার তখনও নির্জীব। চোখের দৃষ্টি রাজপথে। হাতের চায়ের কাপের গরম গরম চা, এখন শরবত প্রায়। ভিতরের তরতাজা অনুভূতিও কেমন নিস্তেজ।বাহারের নীরবতা ভয়

জাগালো চিত্রার মনে। বাহার ভাই বুঝি আজ চির বিচ্ছেদ ঘোষণা করবে! ঘৃণার থুথু বুঝি তার উপর ছুঁড়ে মারবে বাহার ভাই! মারুক নাহয়। সে সহ্য করে নিবে। ঘৃণাটা তো আর তার দোষে পাবে না, অদৃষ্টের পরিহাস। তবে আক্ষেপ কিসের! আফসোস কিসের? নিজের ভাগ্য যদি সে নিজে গড়তো, তাহলে কি আর থু থু ফেলতে পারতো

কেউ! না অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রচিত করতো! তবুও যদি মানুষ তাকেই দোষী ভাবে, তবে মেনে নাহয় নিবে সে দোষ।

চিত্রার মনের ভুল ভাবনার কার্তুজকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলো বাহার। হাতের চায়ের কাপটা পাশেই ছুঁড়ে ফেলে বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে,“তোমার কি সেসব শুনে নিজের উপর ঘৃণা জন্মেছিলো, রঙ্গনা!”

এমন পরিস্থিতি বাহারের এই প্রশ্নটা চিত্রা আশা করে নি। জীবনে তো আশা ছাড়াই কত কিছু হয়! ছোটো কণ্ঠে চিত্রা উত্তর দিলো,

“করাটা স্বাভাবিক না, বাহার ভাই?”

বাহার হাসলো। চিত্রার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলো। এই প্রথম বোধহয় বাহার চিত্রাকে ছুঁয়ে দিলো তাও স্নেহের হাতে। কোনো

লোভ, লালসা বিহীন। অতঃপর মিষ্টি করে বললো,

“অস্বাভাবিক সেটা। তুমি নিজেকে কেনো ঘৃনা করবে রঙ্গনা? তোমার বরং বুক ফুলিয়ে একটা ভীষণ স্বচ্ছ শ্বাস নেওয়া উচিৎ। তোমার জন্মদাত্রী, সে কোথা থেকে আসছে, কিবা তার পরিচয় সব ভুলে যাও, মনে রেখো সে কিন্তু মায়ের দায়িত্ব পালন করতে পিছ পা হন নি। এই

যে সে তোমায় অন্য কারো কাছে দিয়ে ছিলো, তোমার কি মনে হয় তার উপর কম ঝড় গেছে এর জন্য? তাকে কি না কি সহ্য করতে হয়েছে তোমার ধরণা নেই। একটা কথা শুনেছো? জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হলো আসল। তোমার সাফল্য যখন আকাশ ছুঁয়ে দিবে, তোমার জন্ম পরিচয় তখন মরিচীকা।”

চিত্রা কেবল মনযোগ সহকারে শুনলো এই ছন্নছাড়া লোকটার কথা। মানুষটা কতটা গুছানো কেউ বুঝবে তার বাহ্যিক আবরণ দেখে?চিত্রা লম্বা এক নিঃশ্বাস নিলো। শুদ্ধতম হাসি দিয়ে বললো,

“চলুন বাহার ভাই, ফেরা যাক।”

বাহারও ঘাঁড় কাত করে উঠে দাঁড়ালো। একটা রিক্সা ডাক দিয়ে বসিয়ে দিলো চিত্রাকে।

বাহারকে উঠতে না দেখে অবাক হলো চিত্রা। কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করলো,

“আপনি যাবেন না?”

“তুমি যাও, আমি হেঁটে আসবো।”

বাহারের উত্তরে কুঁচকানো কপাল আরও কুঁচকালো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“আমার সাথেই চলুন। হেঁটে আসার কি দরকার? আজ আমি আপনাকে

বাড়ি অব্দি নাহয় নিয়ে গেলাম। কোনো একদিন আপনি পুরো শহর ঘুরাবেন।”চিত্রার কথায় বিশেষ হেলদোল দেখালো না বাহার। পকেটে দু’হাত গুঁজে কোঁকড়ানো চুল গুলো দুলিয়ে বললো,

“আমি হিমু নই রঙ্গনা। আর না তুমি রূপা। আমরা আমাদের মতনই। আমি এক দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষে যাওয়া মানব আর তুমি বাস্তবতার

বেড়া কলে ঝলসে যাওয়া নারী। আমাদের গন্তব্য এক হলেও হয়তো পৌঁছানোর পদ্ধতি ভিন্ন। তাতে ক্ষতি কী? শেষ অব্দি যদি সন্ধি হয়, রাস্তা তবে ব্যাপার নয়।”চিত্রার দিক থেকে নজর সরিয়ে বাহার একবারে হাঁটা ধরলো সোজা। চিত্রা কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেই বাহারের দিকে। লোকটা যদি একটু পিছু ফিরে তাকায় সে আশায়। কিন্তু তা

আর হলো কই? লোকটা তো আর তাকালো না। সবসময়ই চিত্রার আশা ভেঙে দিতে লোকটা প্রস্তুত। চিত্রা ছোটো শ্বাস ফেললো। থাক, সবার গল্পের বিবরণ এক হলেই সমস্যা। থাক না, বাহার রঙ্গনার গল্প কিছুটা অন্যরকম। ক্ষতি তো আর নেই।আজ অষ্টম তম দিনে পদার্পণ করলো মুনিয়া বেগম ছাড়া সওদাগর বাড়ির লোকজন। তুহিন ভাইজান

খুঁজছে, নুরুল সওদাগর খুঁজছে তবে মুনিয়া বেগমের দেখা নেই। কেমন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো মানুষটা। মানুষটার বাবার বাড়িতে কেউ নেই যে সেখানে যাবে। আপন বলতে এই স্বামীর বাড়িই ছিলো। উনার কলিগদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চললো কিন্তু কেউ খোঁজ দিতে পারলো না মুনিয়া বেগমের। চিত্রারও চোখ-মুখ ভীষণ শুকনো। মা

তাকে যতটা যত্ন করতো, অতটা যত্ন আর কেইবা করবে? মুখে ছোটো ছোটো ব্রণ, চোখের নিচে কালো আস্তরণ। মেয়েটার মায়া মায়া মুখ খানার দিকে তাকালো কেমন হাহাকার করে উঠে বুক।

অন্যদিকে অহির মেজাজ আজকাল কিঞ্চিৎ ভালো। নওশাদ ছেলেটা প্রচুর জ্বালালেও বেশ সম্মান দেয় তাকে। অনেক বেশি সময়ও দেয়।

হুটহাট রাস্তায় কোথা থেকে যেন এসর হাজির হয়ে যায়। ঝগড়া করতে মন্দ লাগে না।

খাবার টেবিলে দুপুরের খাবারের তোরজোর চলছে। অহি,চাঁদনী,অনয়,মাহাতাব, আফজাল সওদাগর, লতা বেগম সবাই ই খেতে বসেছে। রোজা সওদাগর এবং তার ননদ খাবার বেরে দিচ্ছেন। কাজের মেয়ে দোয়েল

রান্নাঘর থেকে খাবার এনে দিচ্ছে। আজ খাবার টেবিলে ঘটলো অন্যরকম ঘটনা। সবাই যখন খেতে ব্যস্ত দোয়েল তখন মাছের তরকারিটার বাটি টেবিলে এনে রাখলো। চিত্রার হঠাৎ ই দৃষ্টি আটকালো মাছের বাটিতে থাকা বড় মাথাটার দিকে। বয়সে ততটা ছোটো না হলেও চিত্রার আবদার গুলো বেশ

ছোটোদের মতন। হুটহাট বলে বসে না ভেবেই কত আবদারের কথা।

যেমন আজই মাছের মাথাটা দেখে নিষ্প্রাণ চিত্রা ঝলমলে হাসি দিয়ে বলে উঠলো,

“বড় চাচীম্মা, আমায় কিন্তু মাথা দিবে আজ।”সবাই চিত্রার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। যাক, মেয়েটা নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। আর বরাবরই চিত্রার

জন্য বড় মাছের মাথাটা রাখা হয়। সে আবার বেশ মাছ প্রেমী। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রোজা সওদাগর মাছের মাথাটা চাঁদনীর প্লেটে উঠিয়ে দিলো। চাঁদনী চিত্রার পাশে বসেই খাবার খাচ্ছিলো।

রোজা সওদাগরের এমন কান্ডে উপস্থিত সবাই হতভম্ব। চাঁদনী নিজেও অবাক হয়ে গেলো। রোজা সওদাগর সবাইকে তার দিকে এমন

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বোকা বোকা হেসে চিত্রাকে আদুরে স্বরে বললো,
“তোর আপার তো একটু বেশি পুষ্টি লাগবো, ক? হের তো অহন দুইজনের খাওয়া খাইতে হইবো তাই না? আমি তোরে বড় টুকরাটা দিবো। মাথাটা তোর আপা খাক, কেমন?”চিত্রার হুট করেই কান্না চলে এলো কিন্তু সে প্রকাশ করলো

না। এটা হওয়া টা তো স্বাভাবিক। সবাই কি আর মায়ের মতন হয়? চিত্রা খাবারটা কোনো মতে গিলে নিয়ে মাথা নাড়িয়ে কৃত্রিম হাসি দিয়ে বললো,

“না না চাচীম্মা, তুমি আপারেই দেও। আমি দেখছো কেমন বে*ক্ক*লের মতন আবদার করলাম। এখন তো বড় আপারই ভালো

খাবার প্রয়োজন। তুমি ঠিক করেছো।”

কথার নিচে চাপা পরলো চিত্রার প্রগাঢ় অভিমান। চাঁদনী আপা তার প্লেট থেকে মাথাটা উঠিয়ে চিত্রার প্লেটে দিতে দিতে বললো,“আম্মা, আপনিও না! আমাকে কখনো খেতে দেখেছেন মাথা? সবসময় তো চিতাবাঘই খায়। মেয়েটার পছন্দ। আপনিও না অদ্ভুত।”

“হ হ, খাবি কেমনে তোরা, তোদের চাচী তো চিত্রাকেই সবসময় দিতো। চিত্রা খাবে বলে কি তোরা খেতে পারবি না? সবারই তো হক আছে।” রোজা সওদাগরের উত্তরটা কেমন মুখ ঝামটি মারলো। রসকষহীন কণ্ঠ। চিত্রা বড় আপার হাতটা ধরে ফেললো,খুব কষ্টে কান্না গিলে বললো,

“আপা দিও না গো, কারো হক মেরে খেতে পারবো না আমি।”খাবার টেবিলে নিস্তব্ধ নিরবতা। সবাই কেমন ফ্যালফ্যাল, আহাম্মক হয়ে তাকিয়ে রইলো। চিত্রা এক মনে আলু ভাজা টুকু দিয়েই পরের ভাত টুকু মাখিয়ে নিলো। রোজা সওদাগর তাকে মাছ আর সাধলো না বরং বড় টুকরো টা সে তার মেয়ে জামাইয়ের থালায়

উঠিয়ে দিলো। সবাই চোখ মেলে দেখলো এই স্বার্থপরতা। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। চিত্রা আর দু লোকমা ভাত গিলে কোনো মতে উঠে দাঁড়ালো। আর খাওয়া যে সম্ভব হচ্ছে না। এই খাবার যেন বিষের চেয়ে বিষাক্ত মনে হলো। মাহাতাবও আর মাছ ছুঁয়ে দেখলো না। শাশুড়ির একচোখা কাহিনীর নিরব প্রতিবাদ

করে সেও চুপ করে খাবার পাত থেকে উঠে গেলো।

মেয়ে জামাইকে উঠে যেতে দেখে রোজা সওদাগর গদোগদো কণ্ঠে ডাক দিতেই তাচ্ছিল্য হাসি দিলো মাহাতাব। বেশ তাচ্ছিল্য কণ্ঠে বললো,“যা খাওয়ালেন, পেট ভরে গেছে। আপনার মেয়েকে নাহয় আমার ভাগের মাছটাও দিয়ে দেন।

আমার হকের জিনিসের প্রতি তত টান নেই।”

মাছ পাতে তুললো না অহিও। অপমানে গা শিরশির করে উঠলো রোজা সওদাগরের। সে মুখ বাঁকিয়ে বললো,

“ঘরের চেয়ে পরের টান বেশি এ বাড়ির মানুষের।”চিত্রা তখন কেবল টেবিল ছেড়ে কিছুদূর গিয়েছে। বড় চাচীর কথায় ডুকরে উঠলো সে।

ছুটে গেলো ঘরে। মা ছাড়া দুনিয়া কেমন আঁধার হয়ে গেলো তার! এতদিনের নিয়ম ভেঙে আপন মানুষের বদলে অষ্টাদশী ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ। এ বাড়িতে কেমন যেন বদলের সুর দেখা দিয়েছে। আর যে সুখের দিন নেই চিত্রার, তা বুঝতে তার বাকি রইলো না।রাতের কালো আকাশে যেন বিরহের ছাপ। তারাদের নিশ্চুপতা রাতকে করেছে

আরও গম্ভীর। চিত্রা ছাঁদের গাছ গুলোতে সযত্নে পানি ঢালছে। সচারাচর রাতে গাছে কেউ পানি ঢালে না কিন্তু মন খারাপ দূর করার জন্য, সচারাচরের কাজ গুলো থেকে বেরিয়ে অন্য রকম কিছুই করা উচিৎ।

চিলেকোঠার ঘর থেকে বাহার ভাইয়ের গুনগুনিয়ে গাওয়া গানের শব্দ আসছে। চিত্রা দীর্ঘশ্বাস

ফেললো। হাসতে খেলতে থাকা জীবনটার কি নিদারুণ পরিবর্তন হয়ে গেলো এই এক মাসের মাঝে! সময় বদলাতে সত্যিই সময় লাগে না।“শুনলাম তোমার নাকি হক মেরে খাওয়ার সময় ফুরিয়েছে?”

শক্ত, গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠে থমকালো চিত্রা। গম্ভীর কণ্ঠ হলেও কণ্ঠের মাঝে ঠাট্টার সুর। চিত্রা তপ্ত শ্বাস ফেললো, ক্লান্ত কণ্ঠে বললো,

“বাহার ভাই, ভাঙা মানুষকে আর না ভাঙলেও তো পারেন। আমি ক্লান্ত।” চিত্রার কথায় বাহারের তেমন পরিবর্তন দেখা দিলো না। তবে উচ্চস্বরে হাসির শব্দ ভেসে এলো। চিত্রা সেই শব্দ শুনে হতাশার এক শ্বাস ফেললো। এহেন সময়ে এমন উদ্ভট উচ্চারণ বাহারের থেকেই আশা করা যায়। মানুষটা তো বরাবরই এমন, রাগ করে আর লাভ

কি!চিত্রাকে চুপ থাকতে দেখেও হেলদোল দেখালো না বাহার। বরং বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো,

“বুঝলে মেয়ে, এ জীবনে এত দ্রুত ক্লান্ত হলে চলবে না। তোমার তো সবে বাস্তবতা শুরু। যত্নে গড়া ননীর পুতুলের ন্যায় শরীরটাকে এখন বহু ঘাত-প্রতিঘাতের লড়াই চালাতে হবে। তৈরী তো!”

“এসিড তো কেবল হাত পুড়িয়ে ছিলো। বা’হাতটা এখন প্রায় অকেজো, কে জানতো বাস্তবতা নামক এসিড আমায় পু*ড়াবে!”চিত্রার কথায় চরম বিধ্বস্ততার আভাস। দীর্ঘশ্বাসের হাহাকারে নিস্তব্ধতা ভয়ঙ্কর হলো। বাহার ছাঁদের রেলিঙের উপর উঠে বসলো। লোকটার কি কোনো

ভয়ডর নেই! এমন গা-ছাড়া ভাব নিয়ে কীভাবে থাকতে পারে মানুষ?

“তোমার আম্মু কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয় তোমার?”

“আমি তো জানিনা। বুঝ হওয়ার পর আম্মুকে কোথাও যেতে দেখি নি তার কলেজ ছাড়া। কীভাবে বুঝবো বলুন?”

“চিন্তা করো না, ফিরে আসবে সে।”

“আপন মানুষের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন দেখার আগেই ফিরুক সে। আমার বড্ড ভয় লাগছে, বাহার ভাই। মানুষের বদল কেমন ভয়ঙ্কর!”চিত্রার কথায় বাহার হাসলো। স্বচ্ছ চোখের পাতায় দেখা দিলো অগাধ জলরাশির আনাগোনা। বাহার ভাইয়ের চোখে এই জলরাশিরা বড্ড বেমানান। বাহার ভাই হলো পাহাড়, যে পাহাড়

মাথা উঁচু করে বাঁচে, সে পাহাড়ের বিধ্বস্ততা মানায় না।

নিচ থেকে দোয়েল ছুটে এলো ছাঁদে। চিত্রা এবং বাহারের মাঝে তখন নিরবতা। কি যেন ভাবনা ওদের। সেই নিরবতার জালকে ছিঁড়ে দিয়ে আগমন ঘটালো দোয়েল। ধীর কণ্ঠে বললো,

“চিত্রা আপা, বড় চাচী আপনারে নিচে যেতে বলছে। রাতের রান্নার

আয়োজন আপনাকে করতে বলেছে। বড় চাচীর নাকি শরীর ভালো লাগছে না।”চিত্রা তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইলো দোয়েলের পানে। দোয়েলের বলা কথা টা তার বিশ্বাস হলো না। মনে হলো সে ভুল শুনেছে হয়তো। যে মেয়ে এক গ্লাস পানি তুলে খায় না, সে কিনা এত গুলো মানুষের রান্না করবে!

চিত্রা হতভম্ব অবস্থা দৃষ্টি এড়ায়নি বাহারের। সে পা ঝুলাতে ঝুলাতে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে বললো,

“মেয়ে তুমি ঠিকই শুনেছো। এত অবাক হচ্ছো যে! এখন তোমার বড় চাচীর কোমড় ব্যাথা বাড়বে, মাথা ব্যাথা বাড়বে, শরীরের অসুস্থতা বাড়বে সাথে বাড়বে তোমার প্রতি তার অদৃশ্য, অকারণ হিংস্রতা। সাবধানে থেকো মেয়ে। পৃথিবীতে

সকল মানুষই খারাপ। তবে কেউ কেউ প্রশংসা পাওয়ার লোভে, সুযোগের অভাবে তার খারাপ গুণটা দেখাতে পারে না। তোমার বড় চাচী সুযোগ পেয়েছে এখন, এবার খোলশ বদলানোর পালা।”

চিত্রা কেবল শুনে গেলো বাহার ভাইয়ের কঠিন থেকে কঠিন সত্যি কথা গুলো। সত্যিই মানুষ তবে খোলশ বদলায়!সময়টা সেপ্টেম্বরের

মাঝামাঝি। ভ্যাটিকান সিটিতে আজ অবনী বেগমদের শেষ দিন। এইতো, একটু পর তারা নিজেদের গন্তব্যে রওনা দিবে। এরপর ভুলে যাবে সে এই ভ্যাটিকান সিটিকে। এই ভিনদেশ অবনী বেগমকে দান করেছে অগাধ বিশ্বাস ভাঙার যন্ত্রণা। এই ভিনদেশকে সে আর মনে করবে। সে আর ফিরে চাইবে না এ দিকে। ভুলে যাবে সব, যা আছে

মিছে কলরব। ভুলে গিয়ে যদি ভালো থাকা যায় তবে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়।এয়ারপোর্টে অপেক্ষারত অবনী। অধীর আগ্রহ তার উড়ে যাবার। এ দেশে আর যে টিকছে না মন। অনুভূতিদের ভোঁতা যন্ত্রণায় দিবানিশি যে জ্বালাছে, তা আর সে নিতে পারছেন না। এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে সমাপ্তি টানবে সে যন্ত্রণার।

এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি মিটিয়ে আমজাদ সওদাগর এসে বসলেন অবনী বেগমের সাথে। চেরিকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে রেস্টের জন্য। প্লেন ছাড়তে এখনো প্রায় ঘন্টা দেড়েক দেরি আছে।

অবনী বেগম তাকালো আমজাদ সওদাগরের দিকে। লোকটা কি নিয়ে যেন কয়েকদিন যাবৎ চিন্তিত।

কেমন অস্বস্তি দেখা যায় মানুষটার মুখ জুড়ে।

অবনী বেগমকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমজাদ সওদাগর বিব্রত বোধ করলো। কিঞ্চিৎ হেসে বললো,“কিছু বলবে?”

আমজাদ সওদাগরের প্রশ্নের বিপরীতে প্রশ্ন ছুঁড়লো অবনীও,

“তুমি কিছু বলতে চাও?”

অবনীর প্রশ্নে আমজাদ সওদাগরের অস্বস্তি বাড়লো। সে যে কিছু একটা বলতে চায় তা তার মুখ দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। অথচ বলতে পারছে না। অবনী বেগম হয়তো আন্দাজ করতে পারলো আমজাদ সওদাগরের না বলা কথাটা। অতঃপর ক্ষীণ হাসলো। ভারী কণ্ঠে বললো,

“আজ তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি, আমজাদ? অনেক বছরের পুষে রাখা মিছে এক আবরণ আজ ছিঁড়ে ফেলি?”

আমজাদ সওদাগর অবাক হলেন অবনী বেগমের কথায়। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,“কি কথা?”

“এই যে, আমি তোমার মেজো ভাইয়ের প্রাক্তন এই কথাটার পিছের ইতিহাস জানাতে চাচ্ছি।”

আমজাদ সওদাগর বিস্ফোরিত নয়নে অবনী বেগমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় এ কথাটা সে আশা করেন নি। আর এ বিষয়ে তাদের পরিবারে কখনো খোলামেলা আলোচনা হয় নি, তাই এমন আলোচনা যে কস্মিনকালেও হতে পারে তা তার ভাবনার বাহিরে ছিলো।

অবনী বেগম আমজাদ সওদাগরের হতভম্বতা দেখে কিঞ্চিৎ হাসলো। বেশ আরাম করে বসে বললো,“তোমাদের পরিবারে এসেছিলাম মনের পুষে রাখা ক্ষোভ নিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রতি বেড়ে গেলো মায়া আর আমার ক্ষোভ যে কতটা ভিত্তিহীন ছিলো তাও বুঝতে শুরু

করলাম। তবে হয়তো আজ এসব কিছু বলা অহেতুক। তবে মনে হচ্ছে জীবনের এ পর্যায়ে এসে এ সত্যিটা তোমার জানা উচিৎ। কিছু অনুশোচনা তোমাদেরও থাকা উচিৎ ভুল ভাবার জন্য।”

আমজাদ সওদাগরের অবাকের পাল্লা ভারী হলো। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,“কী বলতে চাচ্ছো?”

“যা বলতে চাচ্ছি তা শোনার জন্য তুমিও প্রস্তুত হও। আমার জীবনের মুমূর্ষু সেই অতীত,

সময়টা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। আমাদের গ্রামে তখন ডাকাতের প্রকোপ বেড়েছে। দিনের বেলা তো কাঠফাটা রোদ আর রাতে হতো তুমুল ঝড়। চারদিকে পানি বেড়েছে, সেই পানি দিয়ে আসতো জলদস্যু। তাই গ্রামে বড় বড় পুলিশ অফিসার আসে,

টহল বসানো হয় জায়গায় জায়গায়। তখন আমি ছিলাম পনেরোর কিশোরী। এগ্রাম ও গ্রাম দাপিয়ে বেড়াতাম। একদিন দুপুরেই কাঠফাটা রোদ্দুরে দেখা হয় আমার জীবনের সর্বনাশা পুরুষের সাথে। কিশোরী মন তখন সেই অপরিচিত পুরুষটার সান্নিধ্যে এসে কেমন কেঁপে উঠলো! সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম বিশেষ কিছু যা

কখনো আমি এর আগে অনুভব করি নি। এক দুপুরে সেই অপরিচিত পুরুষকে প্রথম দেখে আমি ভয়ে কেঁদে দেওয়ার উপক্রম। লোকটা কি সুন্দর করে আমাকে কাঁদতে না করলো! কি সুন্দর তার কথা! কিন্তু ভয়টা এতই জেঁকে ধরেছিলো যে রাতে গা কাপিয়ে জ্বর এলো আমার। ঘরে আব্বা একা মানুষ, আমার তখন ধুম জ্বর। মধ্যরাতে বাবা-

মেয়ের তখন বেহাল অবস্থা। তখন গ্রামে তো তেমন ডাক্তার ছিলো না। জ্বরে আমার দাঁতের সাথে দাঁত লেগে আসার উপক্রম। বাহিরে তুমুল ঝড়। তন্মধ্যেই বাহির থেকে গাড়ির শব্দ পাওয়া গেলো যা তুমুল বৃষ্টির ছাঁট পেরিয়ে শোনা গেলো। বাবা ছুটে বাহিরে গেলেন, আমি তখন প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো অবস্থা। ঝাপসা চোখে দেখলাম

দুপুরের সেই অপরিচিত পুলিশ অফিসারটা হন্তদন্ত হয়ে আমাদের ঘরে এসেছে। পাশে আরেকজন অফিসারও।দ্বিতীয় বার লোকটিকে দেখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে তখন দেখি আমাদের সদরের হসপিটালে আমি ভর্তি। চারপাশে রোদের ঝিলিক। জানতে পারলাম পুরো একটা রাত আমি অবচেতন ছিলাম। আমাকে

সেই পুলিশ অফিসারই হসপিটালে নিয়ে এসেছে গাড়ি দিয়ে। সারা রাত সে এখানেই ছিলো। বাবাকে অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু জানিনা আমার কেন যেন লোকটাকে ভয় লাগতো, কেমন একটা অনুভূতি হতো নিজেও বুঝতাম না। এই লম্বা চওড়া লোকটাকে দেখলেই বুকে ভয় হতো। হসপিটালে আমি তিনদিন ছিলাম, লোকটা তিনদিন রাতেই

এসে দেখে যেতো, আমি তখন ঘুমিয়ে থাকার অভিনয় করতাম। যেন তার চোখে চোখ পরলে আমি শেষ হয়ে যাবো। আমার পনেরো বছরের জীবন তখন ততটাও মজবুত ছিলো না।তিনদিন পর বাড়ি ফিরলাম। শরীর সুস্থ হতেই আবার আমার ছুটোছুটি শুরু। গ্রাম চড়ে বেড়ানোও শুরু। কিন্তু যখন পুলিশের

গাড়িটা দেখতাম তখনই লুকিয়ে থাকতাম।

একদিন দুপুরে পুকুরে নেমেছি আমাদের গ্রামের আরও ছেলেমেয়েদের সাথে, বাবা পাশের মাঠ থেকেই চিৎকার চেঁচামেচি করছে যেন উঠে যাই পুকুর থেকে। কিন্তু কে শুনে করা কথা? আমি তো আমার দুষ্টুমিতে মত্ত। হুট করেই তখন সেই চিরপরিচিত গাড়িটা এসে

থামলো। ছেলেমেয়ে সব পুকুর থেকে উঠে দৌড়। আমার আবার তৎক্ষনাৎ মাথায় বুদ্ধি আসে কম, যতটুকু বুদ্ধি এলো ততটুকু কাজে লাগিয়েই আমি পুকুরে ডুব মারলাম। কিন্তু কতক্ষণ আর শ্বাস আটকে রাখা যায়? আমারও হলো বেহাল দশা, দম আটকে দ্রুত উঠে গেলাম। উঠতেই চোখ পরলো পুলিশবাবুর দিকে। সে বুকে হাত গুটিয়ে আমার

দিকেই তাকিয়ে আছে। প্রথম দেখার পর আবার আমাদের দ্বিতীয়বার সরাসরি চোখে চোখ রাখা হলো। মানুষটার মুখটা দেখলেই আমার যেন কি হয়ে যেতো। আমাকে এমন তাকিয়ে থাকতে দেখে সে ধমক দিলো। তার রাশভারী কণ্ঠে শরীরের প্রতিটা নিউরন কেঁপে উঠলো। বাবা ছাড়া আমি কারো ধমকে ভয় পেতাম না, অভিমান তো করবো দূরের

কথা, অথচ আমি ভয় পেলাম লোকটার ধমকে। অভিমান করে উঠে গেলাম পুকুর ছেড়ে। বাবার পর এই দ্বিতীয় পুরুষ যার উপর আমার অভিমান হলো।এরপর দিন গড়াতে লাগলো, লোকটা আর তার বন্ধুকে দেখতাম প্রায়ই। আমাকে দেখলেই পুলিশ বাবু তার রাশভারী কণ্ঠে ডাক দিয়ে এটা ওটা বলতেন। কি সুন্দর হাসতেন! আমি কেবল

অপলক তাকিয়ে দেখতাম। বাবা বলতো আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে এক রাজপুত্র, আমি মনে মনে ভাবতাম পুলিশ বাবু সে রাজপুত্র হলে খারাপ হবে না। আবেগের গাছে তখন ভালোবাসার ফুল ফুটলো। ওরা দুই বন্ধু গ্রামে বেশ সুনামও কামালো। ওরা আসার পর কমে গেলো ডাকাতির প্রকোপ। উনার সাথে আমি প্রথম মানসিক

ভাবে ঘনিষ্ঠ হয় এক ঘটনায়। আগে তো দূর থেকে দেখতাম, হাসতাম, সে ঘটনার পর আমাদের সম্পর্ক হয়ে গেলো সহজ সরল। আমার এক বান্ধবীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে চাইলে সেই মানুষ প্রতিবাদ করেন। আমার বান্ধবী আবার পড়াশোনা করতো। পুলিশ বাবু আমার বান্ধবীর পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। এরপর থেকে

মানুষটার প্রতিটা কাজে আমি মুগ্ধ হতাম। আমার সাথে তার সম্পর্ক একদম কাছ থেকে কাছের হয়ে গেলো। মাঝে মধ্যে এটা-সেটা রান্না করে পুলিশ বাবু আর তার বন্ধুর জন্য নিয়ে যেতাম। দু বন্ধু কত তৃপ্তি করে খেতো! এমন করে বছর পেরুলো। পুরো গ্রাম জেনে গেলো আমাদের সম্পর্কের কথা। সবাই জানতো পুলিশ বাবুর সাথেই আমার

বিয়ে হবে। কিন্তু,,,,”কথা থামালো অবনী বেগম। আমজাদ সওদাগরের তখন হাত-পা কাঁপা-কাঁপি অবস্থা। যে সত্যের মুখোমুখি সে আজ হয়েছে, তা না জানতে পারলে যে নিস্তার নেই। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো,

“কিন্তু কী?”

অবনী বেগমের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হলো বুক। চোখে টলমল করে উঠলো

সেই অতীত। বাবার বি*ষ খাওয়া শরীর যা কাঁদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিলো মাঠে। কি বিভৎস সে স্মৃতি! কি বিশ্বাসঘাতক মানুষ!এয়ারপোর্টের বিচ্ছিরি শোরগোল। একটু পর পর ফ্লাইট ছাড়ার ঘোষণা। অবনী বেগমের চোখে টলমল অশ্রু। আমজাদ সওদাগর ক্ষণে ক্ষণে উৎকণ্ঠিত হচ্ছে। অধৈর্য কণ্ঠে বললো,

“কিন্তু কী বলবে তো? আর ঐ পুলিশ অফিসার কী মেজো ভাইসাহেব ছিলেন?”

তুমুল কান্নার বেগের মাঝেই হাসি এসে পরলো অবনী বেগমের। আহারে, তার আর্তনাদ ছুঁতে পারলো না কাউকে। বরং সন্দেহ পরিষ্কারের জন্য উন্মুখ মানুষ। বেশ বড়সড় এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী বেগম চোখ বন্ধ করলেন। অতঃপর বলা শুরু

করলেন,“তখন সময়টা বর্ষাকাল। হুট করে গ্রামে কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। ছেলেমেয়ে নে*শায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। চু*রি,মারামারি,হা*নাহা*নি তে গ্রাম উত্ত্যক্ত। আমার সাথেরই কত বন্ধু এই নে*শায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। এক অরাজকতার সৃষ্টি হলো। এই নে*শা কে বা কারা প্রাচার করছে তা সন্ধান পাচ্ছিলো না কেউ। নতুন

আরও পুলিশ অফিসারের আগমন ঘটলো।আমিও ততক্ষণে বাড়ন্ত শরীরে বেশ বড়সড় হয়ে গেলাম। কোনো বিয়ের সম্বন্ধ আসতো না, কারণ সবাই জানতো আমার সাথে পুলিশ বাবুরই সম্পর্ক। হয়তো বেশ গভীর, শারীরিক আরকি। কিন্তু তেমন কিছুই ছিলো না। সে আমার হাত ধরে ছিলো দু একবার, এর

বেশি কিছুই না। কিন্তু মানুষ তো বরাবরই বেশি ভাবতে পছন্দ করে। বাবা তখন উনাকে বার বার চাপ দিতো। বিয়ে করার প্রস্তাব দিতো। উনি বলতো উনার শহরে গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বলে প্রস্তাব নিয়ে আসবে। আমারও হুড়মুড় করে শরীর বাড়লো। কিশোরী থেকে নারীতে পরিবর্তন হচ্ছি। গ্রামের অবস্থা বেহাল থেকে বেহাল হওয়া

শুরু করলো। রাস্তায় বের হওয়া বিপদ হয়ে গেলো। ঘরে সারাদিন পরে থাকতাম। দিন গুনতাম, সে বোধহয় আসবে। কিন্তু আশার আলো কেবল হতাশায় পরিণত হলো।বর্ষার এক মাঝামাঝি সময়ে হুট করে সে একবারে উধাও হয়ে গেলো। তার বন্ধুর কাছে ছুটে গেলাম, খোঁজ দিতে পারলো না সে। আমি কেঁদে কেটে একাকার। গ্রামের

মানুষ ততদিনে আমাকে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে। আমাকে নাকি নষ্ট করে সে মানুষ চলে গিয়েছে। বাবার অবস্থাও করুণ হতে লাগলো। আমার হাসিখুশী বাবাটা নিরব হয়ে গেলো, আমি কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতাম সে নিরবতা। কাকে জানাবো সেই কষ্টের কথা, তখন আমার কেউ ছিলো না। অতঃপর তার বন্ধু আমাদের ভরসা দেয় খুঁজে

নিয়ে আসবে জানায়।কত গুলো দিন পেরিয়ে গেলো হতাশায়, অতঃপর তার বন্ধু অনেক খোঁজখবর করে জানতে পারলো তার পরিবারের সবাইকে নাকি মে*রে ফেলা হয়েছে। পুলিশবাবু এরপর থেকেই নিরুদ্দেশ। আমার তখন হাউমাউ করে কান্না, লোকটা গেলো কোথায়। আল্লাহর দরজায় তিনবার করে মাথা ঠুকতাম যেন সে ফিরে আসে।

অতঃপর বর্ষার শেষের দিকের এক দিনের কথা। আমি ভরদুপুরে ঘুমিয়ে ছিলাম। বাহিরে ঝরঝরে রোদ। গ্রামের এক ছেলে এসে খবর দিলো তার দেখা নাকি পাওয়া গেছে। আমার পুলিশ বাবু নাকি ফিরে আসছে। আমি সেই ভরদুপুরে এলোমেলো শরীর নিয়ে ছুটে গেলাম।গ্রামের মাঠে তখন তুমুল ভীড়। থানার সবচেয়ে বড়

অফিসারও নাকি এসেছে। কত বড় বড় মানুষ। কত অফিসার! আমি আমার পুলিশ বাবুর দিকে তাকাতেই থমকে গেলাম। শরীরে কালো পোশাক, চেহারা একবারে ভেঙে গেছে। চোখ গুলো কেমন ভেতরে চলে গেছে, মুখ ভর্তি চাপদাড়ি। মানুষটাকে মাঠের মাঝখানে একটা গাছে বেঁধে রেখেছে। পরে জানতে পারলাম মানুষটা নাকি দেশ*দ্রোহী,

পরিবার মারা যাওয়ার শোকে সে এই কালো দুনিয়ায় চলে গিয়েছে। সৎ থেকে তো পরিবার হারাতে হয়েছিলো, অসৎ হয়েছে তাই। গ্রামের নে*শার প্রবেশও সে করিয়েছে।আমি মানতে পারি নি মানুষটার বিধ্বস্ততা। ছুটে যেতে চেয়েছিলাম তার কাছে কিন্তু আমাকে যেতে দেওয়া হয় নি। মৃত্যুর আগে নাকি সকলের শেষ ইচ্ছে পূরণ করা

হয়, কিন্তু মানুষটা আমাকে একবার ছুঁতে চেয়েছিলো, সে ইচ্ছেটাও ওরা পূরণ করতে দেই নি। আমি কত কাঁদলাম, হাউমাউ করে কাঁদলাম, আমার কান্না ওদের হৃদয় অব্দি পৌঁছায় নি। আমি ভিক্ষে চেয়েছিলাম মানুষটার প্রাণ। বলেছিলাম আমরা অনেক দূর চলে যাবো, এ পাপে আর ডুবতে দিবো না মানুষটাকে। ওরা শুনে নি। আমার এত যত্নের

ভালোবাসা, আহা কি নিদারুণ তার বিধ্বস্ততা! মানুষটাও আমাকে একবার ধরতে চেয়েছিলো কিন্তু তার আগেই তার শরীরে পর পর ছয়টা গু*লি মেরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। র*ক্তে লাল হয় আমার প্রিয় সোজনবাদীর মাঠ। যে মাঠে মানুষটার হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে ছিলাম, সে মাঠে পরে থাকে নির্লিপ্ত ভাবে আমার পুলিশবাবু। যার সুনামে

একদিন গ্রাম মুখরিত ছিলো, তার লা*শ সেদিন দেশ*দ্রোহীর লা*শ হিসেবে গন্য হয়েছিলো। আর তাকে গু*লি করেছিলো কে জানো? তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, তোমার ভাই নুরুল সওদাগর।আমায় চোখ ভরে দেখতে দেই নি আমার পুলিশবাবুকে। ওরা পাষণ্ড! আমি হাউমাউ করে কেঁদেছি। কি ব্যাথা নিয়ে চিৎকার করেছি। মৃত্যুর পরও মানুষটা চোখ মেলে

যেন অপলক চেয়ে ছিলো আমার দিকে। আমি শেষবার ছুঁতেও পারলাম। দেয় নি ছুঁতে আমায়। তোমার ভাই সেদিন বন্ধুত্ব ভুলে হয়তো কর্তব্য পালন করেছিলো কিন্তু আমি আজও ভুলি নি সেই ভয়াবহতা। আমার মানুষটার এ দশা আমি আজও ভুলি নি।

প্রকৃতি আমার এসবটা নিয়েও ক্ষান্ত হয় নি। যখন আমি গুটিয়ে গেলাম

শূণ্যতায়, আমার বাবা আমার বিধ্বস্ত অবস্থা সহ্য করতে না পেরে বি*ষ খেয়ে সেই মাঠেই আত্মহত্যা করে মানুষটা মারা যাওয়ার তিনদিনের মাথায়। সেদিন সন্ধ্যায় তুমুল ঝড়, আব্বা আমার ঘরে নাহি ফিরে। চিন্তায় চিন্তায় আমি মরিয়া। আব্বা টা ছাড়া যে আমার কেউ ছিলো এই দুনিয়ায়। অবশেষে পরের দিন সকালে মানুষ খোঁজ দিলো আব্বা

আমার স্বার্থপর হয়েছে। আমায় এই গোটা দুনিয়ায় একা রেখে চলে গেছে। আমার আব্বা বেইমানি করেছে, আব্বা আমার বিশ্বাসঘাতক। ওরা কেউ কথা রাখলো না। কেউ আমার রইলো না। ওরা শেষ করে দিয়েছিলো আমায়।এই সবটা হারানো যন্ত্রণার রাগ গিয়ে পরেছিলো তোমার ভাইয়ের উপর। সেও তখন ট্রান্সফার হয়ে শহরে

চলে এসেছিল। অতঃপর প্রতিহিংসার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে আমিও পা রাখলাম সওদাগর বাড়ি। এরপর আগুন আজ কেবল মায়া হয়ে রইলো।”

অবনী বেগমের চোখ অশ্রুর ঢেউ। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সে কান্নার দাপটে। আমজাদ সওদাগরের চোখেও দেখা গেলো অশ্রু দের ভীড়। এতটা দুঃখ পুষে রেখে

একজন মানুষ তার সাথে এত বছর ঘর করে গেলো, অথচ সে টেরই পেলো না! বরং মিছে ভ্রম নিয়ে করে ফেলেছে জীবনের চরম ভুল। এ ভুলের মাশুল আদৌও দেওয়া যাবে!

তন্মধ্যেই অবনী বেগমের প্লেন ছাড়ার সময় হলো। চোখের জল মুছে অবনী বেগম ব্যাগটা কাঁধে চরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমজাদ

সওদাগর আমতাআমতা করে কেবল ডাক দিলো, “অবনী...”। পথিমধ্যে থামিয়ে দিলো অবনী বেগম। মুচকি হেসে বললো,“তুমি হয়তো আজ যা বলতে চাও তা আমাকে দ্বিতীয় বারের মতন ভেঙে দিবে। প্রথম বার ভেঙে গিয়ে অনেক কষ্টে জোরা লেগেছি। দ্বিতীয় বার হয়তো আর পারবো না। তোমার আমাকে নিয়ে ভুল ধারণা ছিলো, আমিও ভাঙাতে

চাই নি, ভেবেছিলাম একটা কলঙ্ক লাগুক তোমার ভাইয়ের গায়ে। আমি অভাগিনী তো চির কলঙ্কিনী ছিলামই। তাছাড়া তুমি যেভাবে ধোয়াশা আমিটাকে আঁকড়ে নিয়ে ভালোবেসে ছিলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ভালোবাসাও যে রঙ বদলাতে পারে। আজ তাই আফসোস করলাম। তুমিও নাহয় একটু আফসোস করো, আমাকে সব

খুলে বলতে না পারার আফসোস। আমাকে অনেক ভালোবেসেও কিছুটা কম ভালোবেসেছো সেই আফসোস। কিছু আফসোস থেকে যাক, অবসাদ জাগবে। আমায় এতদিনে ভুলে গিয়ে খুশি ছিলে আজ থেকে নাহয় প্রতিক্ষণ মনে রাখলে। আমি আজ একটু স্বার্থপর হলাম। কি সুন্দর তোমার মনে আফসোস জাগালাম! ভালো থেকো কেমন?”

আমজাদ সওদাগর কেবল তাকিয়ে রইলো অবনী বেগমের যাওয়ার পানে। সত্যিই হয়তো সে অনেক ভালোবেসেও কোথাও একটা ভালোবাসতে পারি নি। সত্যি বলতে এক জীবনে হয়তো অনেকটা ভালোবাসা কাউকেই দেওয়া যায় না।আজ সূর্য তার উত্তপ্ততা দু’হাত ভরে উজাড় করেছে বেকার যুবকদের জ্বা*লিয়ে দেওয়ার নামে।

পথে-ঘাটে চাকরির খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে অনবরত ছুটে যাওয়া বেকারদের বেলা সূর্য মানুষের মতন কঠোর হয়েছে। উত্তাপে সে ঝলসে দিতে চাচ্ছে বেকারদের দূর দূরান্তে হেঁটে যাওয়ার শক্তিকে। তবে বেকাররা সূর্যের চেয়েও তেজী হয়। মাথায় বেকারত্বের যে বোঝা, এই বোঝার চেয়ে আরও বেশি কঠিন তাদের কাছে কিছুই মনে হয় না।

পেটে ক্ষুধা, পকেটে বাবার ওষুধের লিস্ট, হাতে প্রেমিকার বিয়ের কার্ড, মাথায় দায়িত্বের ভারী বস্তা- এসবকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না সূর্যের তেজ। চাকরির ছয় নাম্বার পরীক্ষা টাও আজ দিয়ে দিলো বাহার। মাঝে সে অনেক ছুটাছুটি করেছে একটা চাকরির জন্য, কত রাত ঘুমিয়েছে ফুটপাতে! রাতের রাস্তার ভয়ঙ্কর শীতলতায় বুকে বেঁধেছিলো

নিউমোনিয়ার সংসার। তবুও সে থামে নি। এখানে ওখানে যোগ্যতার বটবৃক্ষ ঝাঁকিয়ে করেছিলো চাকরির সন্ধান। অথচ বাহার তখন জানতোই না 'টাকার তৈরী এই অযোগ্য শহরে, যোগ্যতা কেবল নিরেট নিশ্চুপ,মূল্যহীন,পরিত্যক্ত কবর।' আজ বাহার তা জানে। তবে আজ তার একটা চাকরির জন্য তেমন হাহাকার নেই। বেকারত্ব তো সব

কেড়েছে, এখন বেকারত্বের হাহাকার বাহারের ভেতর ছুঁতে পারে না। চাকরির চিন্তায় আজকাল তার আর রাত জাগতে হয় না। তবে আজ হুট করে মনে হলো চাকরি তার প্রয়োজন। পায়ের নিচের একটা শক্ত ভিত্তি প্রয়োজন। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে বেকারত্বের অভিশাপে কুকুরবিড়াল হয়ে বেঁচে থাকাটা জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। আর

একজন পুরুষের ব্যর্থতা সমাজের কাছে হাস্যকর।মাথার উপর রোদের প্রখরতা। ঘামে ভিজে গেছে শরীরের খুব সস্তার টি-শার্ট খানা। এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল লেপ্টে গেছে পরম অবহেলায় কপালের মধ্যিখানে। সিগারেটে ঝলসানো ঠোঁট গুলো আর গালে চাপদাড়ির অবাধ বিস্তারে বাহার ভাইকে কেমন অবহেলায় হারানো নিদারুণ কোনো

সুন্দর নির্দেশন লাগছে। যাকে দেখতে দেখতে কাটানো যাবে শত সহস্র যুগ।

হুট করেই প্রচন্ড পথচারীদের ভীড়ের মাঝে বাহারের মাথায় আর রোদ লাগছে না। সে হাঁটছে, তার তালে তাল মিলিয়ে একটা ছায়াও হাঁটছে। বিরাট ছায়া। বাহার অবাক হয়ে পাশ ফিরে তাকাতেই দেখলো কাঁধ সমান চুল গুলো ঝুঁটি করে খুব

সাদামাটা পোশাকে কি সুন্দর হাসি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা! কপালে অবস্থানরত ভ্রূদ্বয় আপনা-আপনি কুঁচকে গেলো বাহারের। অবাক কণ্ঠে সে প্রশ্ন ছুঁড়লো,“এই যে মেয়ে, এখানে কী?”

চিত্রা বাহারের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ডান হাতে ধরে রাখা রঙিন ছাতাটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো,

“রোদ্রের মাঝে ছায়া হতে এসেছি। এইযে গরম আপনাকে কেমন নাজেহাল করে দিয়েছে, তা তো আমার মোটেও ভালো লাগে না।”

“রোদ ভালো, রোদে শোক ভুলে যাওয়ার ঔষুধ থাকে। অতিরিক্ত রোদ মাথায় থাকলে শোক তখন মস্তিষ্কে বিচরণ করতে পারে না। কিন্তু আমরা বরাবরই শীত পছন্দ করি। অথচ শীতলায় শোক গাঢ়

হয়। যারা অতিবও বিষণ্ণতায় ভুগে, তাদের উচিৎ সারাদিন রোদের দাবানল সহ্য করে পথ থেকে পথান্তরে ঘুরে বেড়ানো।”“আচ্ছা বাহার ভাই, এত মানুষের ভীড়ে যে এমন হেলেদুলে হাঁটছেন, বিরক্ত লাগে না?”

“এই হাজার মানুষের ভীড়ে থাকলে একাকীত্ব অনুভব হয় কম। মনে হয় আমার মানুষ না থাক, অনেক মানুষ

তো আমার আশেপাশে আছে। জীবনকে পজিটিভ অনুভব করাও, তবেই না বেঁচে থাকা স্বার্থক।”

চিত্রা একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে রইলো এই বেকার যুবকটার দিকে। কে বলেছে এ শহর কেবল অর্থের পূজারী? এই যে, কিছু কিছু কিশোরীর মনে বেকার বাহার ভাইরাই তো একরাশ প্রশান্তি।

চিত্রাকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে দেখে আড়চোখে তাকালো বাহার। ফিচলে কণ্ঠে বললো,“এভাবে তাকিয়ো না মেয়ে, দুর্বলতা হানা দেয়। আচ্ছা মেয়ে, তুমি আজকাল বুকের বা’পাশটায় উঁকিঝুঁকি দেও কেনো! হেতায় কেনো তব বিচরণ?”

বাহারের প্রশ্নে লজ্জায় লাল হলো চিত্রার মুখ। বাহার ভাই দারুণ অস্বস্তি দিতে জানে।

হাঁটতে হাঁটতে পথিমধ্যে বাদামও খেলো দু'জন। ভাগাভাগি হলো আরও কিছু অনুভূতি। অষ্টাদশীর জন্য এই যেন ঢের।অবনী বেগম দেশে ফিরেছেন পাঁচদিন হতে চললো। স্বাভাবিক, সহজ-সরল জীবন যাত্রায় সে ফিরে এসেছেন।

ভিনদেশে যা চোখ দেখেছে তা সে ভিনদেশেই যেন রেখে এসেছে। সে খবর কাউকে জানায় নি সে, কাউকেই না।

বাড়িটাতে আবার কিছুটা গমগমে ভাব। কেবল মুনিয়া বেগমের শূণ্যতা টা হুটহাট বেশ অনুভব হচ্ছে। এত খোঁজখবর করেও মানুষটার কোনো খবর পাওয়া গেলো না। চৈত্রের গল্প যেমন বৈশাখে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়,

তেমন মিলিয়ে গেলো মানুষটা। কত গুলো দিন মানুষটা ছাড়া দিন কাটাচ্ছে সওদাগর বাড়ি!

রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত অবনী বেগম। তাকে হাতে হাতে সাহায্য করে দিচ্ছে চিত্রা। অহি আপা ভার্সিটিতে গেছে, নাহয় সেও সাহায্য করতো। আজকাল রোজা সওদাগরকে রান্নাঘরে তেমন দেখা যায় না। বেশ অদৃশ্য এক ক্ষমতার দাপট যেন

পেয়ে বসেছে তাকে। না চাইতেও সবটা কেবল তার ইশারায় হচ্ছে। আর এসবের সবচেয়ে ভুক্তভোগী মানুষটা হলো চিত্রা। হুট করেই চোখের বালি হয়ে গিয়েছে সে। রান্নাঘরের ভয়াবহ রকমের গরমে ঘেমে-নেয়ে একাকার চিত্রা। ছোটো মুখটা কেমন শুকিয়ে গেলো। মা হীনতার অভাব যেন তার পুরো মুখমন্ডলে বিস্তার করছে। বাড়ির

সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় মানুষ দোয়েলের মায়া লাগলো চিত্রার জন্য। সেই কিশোরী দোয়েল বেশ মায়া মায়া কণ্ঠে বললো,

“চিত্রা আপা,আপনে ঘরে গিয়া একটু গোসল করেন। কেমন ঘাইমা গেছেন! আমি তো আছি এইহানে, চাচীরে আমি আগায় পিছাই দিমু।”অবনী বেগমও চুলায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে চিত্রার দিকে

তাকালো। শ্যামলা মুখটা গরমে কেমন লাল হয়ে গেছে মেয়েটার! অবনী বেগমও আদুরে স্বরে বললো, “হ্যাঁ চিত্রা, যাও তোমার ঘরে। গোসল করো। গরমে কি অবস্থা হয়েছে তোমার! রান্নাঘরে এ জন্য আসতে না বলি। যাও যাও।”

চিত্রা পেয়াজের শেষ টুকরোটা কাটতে কাটতে বললো,“এইতো যাচ্ছি, আরেকটু।”

অবনী বেগম আর কিছু না বলে কেবল হতাশার শ্বাস ফেললেন। বাড়িতে আসার পর, বাড়ির নিবিড় পরিবর্তন টা সে বেশ সুক্ষ্ম ভাবে খেয়াল করেছে। আর বেশিরভাগ সদস্য কেমন যেন এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে নির্দ্বিধায়। একমাত্র তুহিনের জন্য পরিবর্তন গুলো ধারালো ভাবে করতে পারছে না রোজা সওদাগর। ক্ষমতার লোভ

সবচেয়ে বড় লোভ। এই লোভে মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায়।

পেয়াল গুলো সুন্দর করে কেটে ছোটো চাচীর সামনে রাখলো চিত্রা। অবনী বেগম মাথায় হাত বুলিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো,“চিন্তা করো না, চিত্রা। তোমার আম্মু ফিরে আসবে। সে তোমাকে এক মিনিটও চোখের আড়াল রাখতে পারতো না, হয়তে

অভিমান হয়েছে খুব তাই এতদিন যাবত তোমার থেকে দূরে।”

অনেক গুলো দিন পর কারো স্নেহের হাত পেতেই অষ্টাদশীর প্রগাঢ় অভিমান ঠোঁট ফুলিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু সে বের করতে দিলো না। বরং অমলিন একটা হাসি দিয়ে বললো,

“মা হয়তো দূরে আছে কিন্তু আমি সবসময় অনুভব করি তাকে। তুমি

চিন্তা করো না চাচী। আমি ঠিক আছি।”

অবনী বেগম আর কিছু বলার আগেই চিত্রা রান্নাঘর থেকে প্রস্থান করলো। দীর্ঘশ্বাসে ভারী হলো পরিবেশ। হাসি-খুশি পরিবারটার আদলে থাকা মানুষ গুলোর নির্মমতা বেরিয়ে আসছে যেন ভদ্রতার মুখোশ ঠেলে।ঝিম ধরা ভারী সন্ধ্যা, বৈরী তার বিবর্ণ বাতাস। অহি কাঁধের

ব্যাগটা মুঠোয় চেপে ধীর গতিতে হাঁটছে। আজকাল চিত্রাকে তাদের বাড়ির গাড়িটা দেওয়া হয় না যাতায়াতের সুবিধার জন্য। মেয়েটার হাতে টাকাও বোধহয় নেই। অহি দিতে চাইলেও নেয় না। হেঁটে হেঁটে, বাসে চেপে যাতায়াত করে সে। কলেজ বাসা থেকে কাছেই, রিক্সা দিয়ে আসা যাওয়া করা যায়, হেঁটেও আসা যায় কিন্তু কোচিং বেশ

খানিকটা দূরে। গাড়ি ছাড়া উপায় নেই। চিত্রার আবার বাস ট্রাভেলিং সহ্য হতো না। বমি করে ভাসিয়ে দিতো। অথচ আজ এ মেয়েটা নির্দ্বিধায় আসা-যাওয়া করছে সে বাসেই। চিত্রার প্রতি এমন অন্যায়ের নিরব প্রতিবাদে অহিও বাড়ির গাড়ি ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে।

অহির দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। সারা রাত-দিন পড়াশোনা

করেও তার তৃপ্তি মিলছে না। পরীক্ষার হলে গেলেই সে যেন সব ভুলে যায়। কি একটা অবস্থা!“এই যে মিস, শুনেন প্লিজ।”

পরিচিত কণ্ঠ নিরব রাস্তায় যেন ঝঙ্কার তুললো। অহির ঝিমিয়ে থাকা চিত্ত মিনিটেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। কপাল কুঁচকে বিরক্ত ছড়িয়ে গেলো তার সারা মুখে। পায়ের গতি থেমে গিয়েছে ততক্ষণে।

নীল রঙের পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন নওশাদ খুব দ্রুত এগিয়ে এলো, অহির পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। মুখে তার বিরামহীন সেই হাসিটা। কণ্ঠে মধুরতা। পাশে এসে দাঁড়িয়েই মিষ্টি হাসি বজায় রেখেই বলল,

“পরীক্ষা কেমন হলো শুনি?”

অহির চোখ-মুখে তখন আঁধার করা বিরক্ত। কণ্ঠ ঝাঁঝালো করে সে উত্তর দিলো,

“আপনাকে বলতে হবে!”“হ্যাঁ, বলতে হবে বলেই তো জিজ্ঞেস করা।”

নওশাদের স্বাভাবিক উত্তরে অহির চোখেমুখে ধরা দিলো বিস্ময়। লোকটা পাগল টাগল নাকি? ঝাঁঝালো কণ্ঠ আর স্বাভাবিক কণ্ঠের পার্থক্যও বুঝে না নাকি!

বিরক্ত হয়ে আবার নিজ গন্তব্যে হাঁটা ধরলো সে। নওশাদও পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল,

“আপনি যেন কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট?”

“সাইকোলজি।”“বাহ্, তবে তো রীতিমতো মানুষের ভেতরের তথ্য বুঝার বিশেষ ক্ষমতা আপনার আছে তাই না?”

নওশাদের কথায় থামলো অহি। বুকে দু’হাত ভাঁজ করে বলল,

“হ্যাঁ আছে। বলেন আপনার কি বলে দিতে হবে?”

নওশাদ কতক্ষণ মিছে মিছে ভাবুক মানুষ হলো। অতঃপর বেশ জয়ী একটা হাসি দিয়ে বললো,

“বলেন তো আমি আজ নীল রঙের পাঞ্জাবি কেনো পড়েছি?”

অহি নওশাদের মুখের দিকে তাকালো। তারপর পা থেকে মাথা অব্দি একবার চোখ বুলিয়ে কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলো,

“আপনি বিশেষ কোনো কারণ ভেবে নীল রঙটা পরেন নি। হুট করে মন চেয়েছিলো তাই পরেছেন। আর কিছু?”

নওশাদ বেশ অবাক হলো। বিস্মিত কণ্ঠে বলল,

“বাহ্, বুঝলেন কীভাবে?”“কারণ যখন কেউ শুনে আমরা সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছি তখন তারা আমাদের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য হুট করেই একটা অহেতুক প্রশ্ন করে যে প্রশ্নের উত্তর হয়তো বিশেষ কিছু না অথবা তাদের জানা নেই এমন কিছু।”

অহির আড়চোখে তাকিয়ে উত্তর বলার ভঙ্গিমা টা বেশ উপভোগ

করলো নওশাদ। হাসিরা আরও বিস্তৃতি লাভ করলো। সে কণ্ঠ খাদে নিয়ে বলল,

“আমার মায়ের আপনাকে পছন্দ হয়েছে, জানেন?”

নওশাদের কথায় হুট করেই হেসে উঠলো অহি। হাসতে হাসতে বলল,

“আহা, ভর সন্ধ্যে বেলা মিথ্যা বলছেন কেনো?”

নওশাদ বেশ অবাক হলো তবে কণ্ঠে গো ধরে রেখেই বলল,“না সত্যিই এটা।”

“উহুম, মিথ্যে এটা।”

“কীভাবে বুঝলেন?”

নওশাদের বিস্মিত অবস্থা দেখে অহির হাসি স্রোত বাড়লো। হাসতে হাসতে সে বলল,

“সাইকোলজির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসেব আমাদের জানা আছে। আপনি

সচারাচর হাত দুলিয়ে কথা বলেন, মানে সত্যি কথা গুলো। অথচ এই কথা টা বলার সময় আপনার দু'হাত স্থির ছিলো আর চঞ্চল হাসিটা কেমন গুমোট ছিলো। খুব সম্ভবত আপনার মায়ের আমাকে পছন্দ হয় নি এমন কথা সে আপনাকে জানিয়েছেন যার দরুন আপনি আমাকে উল্টোটা বলে পরীক্ষা করছিলেন। নাহয় এমন একটা কথা

আপনার মাথায় এত দ্রুত আসতো না।”

নওশাদ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো কেবল। মেয়েটা দারুণ বুদ্ধিমতী। সত্যিই নওশাদের মা আজ কথায় কথায় অহির উচ্চতার কথা বলেছে। ছোটো-খাটো অহির উচ্চতা মহিলার বেশ অপছন্দ হয়েছে সেটাই জানিয়েছেন।

নওশাদকে চুপ মেরে যেতে দেখে অহি গম্ভীর কণ্ঠে বলল,“আর কিছু বলবেন, মিস্টার?”

“আপনাকে আমার ভালো লাগে, সেটা জানেন?”

অহি ভড়কালো না নওশাদের এমন কথায় বরং বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

“এটাও মিথ্যে।”

নওশাদ অবাক হলো। মাথা দুলিয়ে বললো,

“না, এটা সত্যিই। নাহয় এভাবে আপনার পিছু নিতাম বলুন?”

“সে তো আপনি আমাকে জানার আকাঙ্খা থেকে পিছু নিয়েছেন, ভালো লাগা থেকে না।”

নওশাদের চলন্ত পা আবার থেমে গেলো। হ্যাঁ এটা ঠিক যে অহিকে জানার ইচ্ছেটা তার ভেতর আছে।

কিন্তু পরেরটাও তো সত্যি। কিন্তু অহি তা মানতে নারাজ। কয়েক প্রকার বাকবিতন্ডার পর নওশাদ মুখ ছোটো করে বলল,“আপনার সাইকোলজি সব দিয়েছে, অনুভূতি বুঝার ক্ষমতা কি দেয় নি?”

চিত্রা হাসতে হাসতে বলল,

“আমার সাইকোলজির মতে নওশাদ সাহেবের অনুভূতি বেশ স্বল্প। আর

এত স্বল্প অনুভূতি জাহির করা বোকামি।”

“আপনি পাষণ্ড।”

কথা খানা বলেই উল্টো দিকে হাঁটা ধরলো নওশাদ। অহি হাসতে হাসতে নিজেকেই নিজে বলল,

“ভালোবাসার মানুষকে অব্দি ভালোবাসা ছেড়ে দিলাম, পাষণ্ড না হলে কি পারতাম! আপনি তো দু’দিনের অনুভূতি নিয়ে আসছেন।”

ছোটো শ্বাস ফেলে দু’কদম এগিয়ে যেতেই কেউ ছুটে এলো তার কাছে। অহি অবাক হয়ে পাশের মানুষটার দিকে তাকালো। ফর্সা নওশাদ সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেছে দৌড়ানোর কারণে। সে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে অথচ মুখে আগের হাসিটা। হাঁপাতে থাকা অস্থির কণ্ঠ নিয়েই সে বলল,

“আচ্ছা আপনার সাইকোলজি মতে আপনাকে পটানোর কিছু ট্রিকস দিবেন?”

অহি অদ্ভুত ভাবে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে হা হা করে হেসে উঠলো। সেই হাসির ঝঙ্কারে নওশাদের সাথে মুগ্ধ হলো নিশ্চুপ রাস্তাটাও।সন্ধ্যার নাস্তার আয়োজনে মুখরিত ড্রয়িংরুম। চিত্রা আর দোয়েল মিলেই আয়োজন করেছে। তুহিনও আজ

বাসায়। সবাই ই সোফায় বসে আছে কেবল চাঁদনী আপা বাদে। আপা বোধহয় ঘরে।

চিত্রা যখন নাস্তার প্লেট টা টেবিলের উপর রাখলো তখন তুহিনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো,

“চিত্রা, আর কিছুদিন বাদে না পরীক্ষা? তুই এসব কেনো করছিস?”

চিত্রা নাস্তার প্লেট টা টেবিলে রেখে বড় চাচীর দিকে তাকালো। বড় চাচীই তাকে পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠিয়ে এনেছেন বিকেলের নাস্তা তৈরী করার জন্য। এখন এটা ভাইজান জানলে হয়তো তুলকালাম হতে পারে তাই সে চুপ করে রইলো। তন্মধ্যেই পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এলো,“ওমা তুহিন, তোমার মা নেই এখন বাড়িতে, এই সুযোগে

চিত্রাকে একটু কাজ শিখাতে হবে না? বলো?”

দরজার কাছে বাহার ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলো চিত্রা সাথে বাহার ভাইয়ের এহেন কথা। কিঞ্চিৎ ভড়কে গেলো উপস্থিত সবাই কেবল হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলো তুহিন। অবাক কণ্ঠে বলল,

“কাজ শিখাতে হবে মানে? ওর আবার কিসের কাজ? পড়াশোনা আছে না!”

“পড়াশোনা আছে নাকি? আমি ভেবেছি তোমাদের মা যাওয়ার সাথে সাথে ওর পড়াশোনাটাও নিয়ে গেছে। নাহয় মানুষের হুকুমে এমন উঠ-বস করতো!”

বাহার ভাই সচারাচর আসে না বাড়ির ভেতরে। আজ এসেই এমন

অদ্ভুত কথা বলছে যার দরুন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তুহিন। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। একবার বোনের দিকে আরেকবার বাহার ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে রোজা সওদাগর বোকা বোকা হেসে বলল,“আরে কি যে বলো না, বাহার। তা তুমি এখানে যে! বিশেষ কাজে এসেছো?”

“আমি কি-যে বলি না আন্টি। যা সঠিক তা-ই বলি। চোখ থাকতে অন্ধ হওয়াটা তোমায় মানায় না, তুহিন। তোমার বোন কি করছে না করছে, কে কি করাচ্ছে খোঁজ রাখো। ভাই হয়েছো তো দায়িত্ব কেন অবহেলা করছো! মায়ের হারানো তে ব্যথিত হয়ে বোনের সুখ তো সব উড়িয়ে দিচ্ছো। অথচ মেয়েটা সুখ প্রিয়।”

বহুদিন পর কেউ চিত্রার হয়ে কথা বললো, এই অনাকাঙ্খিত আনন্দে চোখে অশ্রু জমলো। মাথা নত করে সে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চালালো সে অশ্রু। তুহিন বুদ্ধিমান ছেলে, সে ততক্ষণে বাড়ির ভেতরের পরিবেশের কথা কিছুটা আন্দাজ করে ফেলেছে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো। চিত্রার কাছে গিয়ে

মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে শক্ত কণ্ঠে বললো,

“কিরে চিত্রা, তোকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কে? বড় চাচী নাকি ছোটোচাচী? নাকি ফুপি? কে বল?”চিত্রা ছোটো মানুষ, আদুরে ভাব তার শরীরে তো এখনও আছে। সে ভাইজানের বাহু আঁকড়ে কেঁদে দিলো। আপন মানুষের পরিবর্তনের নিরব অভিযোগ যেন জানালো

ভাইকে। তুহিনের রাগ চড়ে বসলো মাথায়। বোনকে এক হাতে ধরে টেবিলের সব খাবারের প্লেট এক এক করে ছুঁড়ে মারলো ফ্লোরে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে গেলো সেসব প্লেট। কাঁচের গ্লাসটা বড়োচাচীর পায়ের সামনে আছাড় মেরে আঙ্গুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল,“আপনাদের যদি কাজ করতে মন না চায় তবে নতুন কাজের

লোক নিন। একজনের জায়গায় দু’জন নিন। আপনাদের সাহস কীভাবে হয় আমার বোনের উপর এসব হুকুম তালিম করার? কে আপনি? সাহস কি করে হলো আপনার চাচী?”

তুহিনের এমন রাগে উপস্থিত সবাই ভীত। কেবল স্থির রইলো বাহার। মাঝে মাঝে কিছু কথা সঠিক মানুষের কানে দিতে হয়।

বড়ো চাচীরও ততক্ষণে অপমান আকাশ ছুঁয়েছে। সে দাঁত কিড়মিড় করে বলল,

“তুহিন, ভদ্রতা ভুলেছো? কাকে কি বলছো তুমি? আর তোমার বোনকে কাজ করাবো না কেনো? সে কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে আসে নি। রাজপ্রাসাদের মেয়েরা তো অন্যদের বাড়িতে মানুষ হয় না, তাই না? সামান্য একটা ব্যাপারকে এ মেয়ে

কি বিশ্রী করে তুললো? স্বার্থপর মেয়ে।”

টেবিলের কাঁচের উপর গ্লাস গুলো ফেলে ভেঙে চুরমার করে ফেললো সব এক নিমিষেই তুহিন। বড় চাচীকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললো,“আপনি তো কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে আসেন নি। আপনার বাপেরও কোনো জমিদারি ছিলো না। কন্যার ভার সামলানোর

ক্ষমতাও তার ছিলো না। বস্তিতে থাকতেন, এক রুমের খুপরিতে। ভুলে গেছেন অতীত? আবার আমার বোনকে নিয়ে আপনি বাজে কথা বলছেন। পেটে ঘি পরতেই পান্তা ভাতের কথা ভুলে ক্ষমতা দেখাচ্ছেন!”

অপমানে গা ঘিনঘিন করে উঠলো রোজা সওদাগরের। ছেলে-মেয়ে দুটোকে কি সে কম ভালোবাসা

দিয়েছিল? অথচ আজ কি কথা বলছে তারা!

তন্মধ্যেই নুরুল সওদাগর সশব্দে চড় বসালেন ছেলের গালে। এই প্রথম সে তার ছেলের গায়ে হাত তুললো। অফিস থেকে এসে ছেলের এমন রূপ দেখেই মূলত সে হতভম্ব। তুহিনের চোখ তখন ভয়ঙ্কর রকমের লাল। ফর্সা মুখে তখন তুমুল আক্রোশ। চিত্রা ছুটে সিঁড়ি বেয়ে

নিজের রুমের দিকে চলে যেতে নিলেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টলমলে চোখের চাঁদনী আপা তার হাত ধরে আটকে দিলো। চিত্রা হাত ঝারা দিয়ে রুমের ভেতর প্রবেশ করার সময়ই ভারী কিছু পরে যাওয়ার শব্দ হলো। পিছু ফিরে তাকাতেই চিত্রার চক্ষু চড়কগাছ। বড় আপার শরীরটা নিচের সিঁড়িতে পরে আছে। ভারী পেটটা ধরে তার

হৃদয় বিদারক চিৎকার। র* ক্তে রঞ্জিত হলো সাদা ফ্লোর।হুড়মুড় করে কেমন অবসাদের বাতাস বয়ে গেলো প্রকৃতি নিবিড় করে। হা হুতাশ মাখানো অসুস্থ বাতাস। হাহাকার করা নিস্তব্ধ বাতাস। চিত্রা লোহার গেইট টার হাতল ধরে ভেজা চোখে যেন কার পথ চেয়ে রইলো। কার ফেরার আশায় যেন উতলা হলো তার দেহের ছোট্টো হৃৎপিণ্ড

খানি। চিত্রা কেবল ঝাপসা চোখে অপেক্ষা করলো কিছু সুখবরের। শরীরে জড়ানো সুতির আকাশী রঙের জামাটায় তখনও র*ক্তের দাগ। হাতে লেগে আছে শুকনো র*ক্ত।

“আম্মা, আপনে ঘরে গিয়া বহেন। রাত তিনটা বাজে এইহানে বইয়া আছেন, ঠান্ডা লাগবো তো। যান আম্মা, ঘরে যান।”বাড়ির সবচেয়ে

কমদামী মানুষ বৃদ্ধ দারোয়ান চাচার আদর মাখানো দুশ্চিন্তা চিত্রার কানে কয়েকবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে-ফিরে গেলো তার নীড়ে। চিত্রা অটল,স্থির হয়ে বসেই রইলো। বিশেষ হেলদোল দেখালো না সে। যেন তার অবহেলিত শরীরটায় অবহেলাটাই প্রাপ্য। তুখোর অবহেলায় অবহেলায় ঝল* সে যাওয়াটাই তার প্রাপ্য।

দারোয়ান চাচা হতাশার শ্বাস ফেললো, নিবিড় কণ্ঠে বললো,

“অন্তত আমার টুল টার উপরে উঠে বসেন, আম্মা।”চিত্রা এবারও নিশ্চুপ। প্রাণহীন দৃষ্টিতে একবার তাকালো বৃদ্ধ দারোয়ানের দিকে। চোখে তখন অশ্রু কনারাও বিরতি নিয়েছে কিন্তু গাল তার তখনও ভেজা। বহু কষ্টে চিত্রা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে অপরাধী সুরে উচ্চারণ করলো,

“আমি ইচ্ছে করে চাঁদনী বুবুকে ধাক্কা মারি নি, চাচা। তুমি তো আমায় বিশ্বাস করো তাই না?”

বৃদ্ধ মতিউর রহমান গোলগাল মেয়েটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মেয়েটার দু’গালে তখনো নির্মম চ* ড়ের ছাপ স্পষ্ট। চুল গুলো বেজায় টানাটানিতে অগোছালো। বা’চোখের কোণাটাও কেমন ফুলে আছে! কি মা*রটাই না মেরেছে!

চিত্রা এবার বাঁধ ভেঙে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। নিজের ধুলোমাখা দু’হাতের মাধ্যমে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুটেস্বরে বললো,“আমি ইচ্ছে করে করি নি, চাচা। আমি এত অ-মানুষ নই। চাচা গো, আপাটার কিছু হলে সে কলঙ্কের কালিতে যে আমি পু* ড়ে ছাই হয়ে যাবো। আমার সে পাপের কী হবে শাস্তি!”

বৃদ্ধ মতিউর স্বান্তনার ভাষা খুঁজে পেলো না। তার সীমাবদ্ধতা যে খুবই অল্প। সে অল্প সীমাবদ্ধতা দিয়ে দুঃখিনী চিত্রার দুঃখ মুছবার যে তার ক্ষমতা নেই। বড়জোর সে তার নিজের চক্ষুদ্বয়ের অনাকাঙ্খিত অশ্রু মুছতে পারবে।

চিত্রা কাঁদতে কাঁদতেই গেটের সাথে হেলান দিলো। হুট করে সব অনাকাঙ্খিত ঘটনা যেন তার নামেই

লিখে দিলো সৃষ্টিকর্তা। এমন না হলে, খুব বেশিই কী ক্ষতি হয়ে যেতো! চাঁদনী আপার র* ক্তা* ক্ত শরীরটা সবার প্রথমে সে-ই ছুঁয়ে ছিলো। তার পিছে পিছে ছুটে এসেছিল দুলাভাইও। বাড়ির প্রত্যেকে ততক্ষণও হতভম্ব। যখন সবার মস্তিষ্কে মি* সাইলের চেয়েও দ্রুত বেগে ছুটে গেলো এই অঘটনার খবর, পুরো সওদাগর বাড়ি

যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কত আহাজারি, চেঁচামেচিতে কেমন ভয়ানক বিষাদপুরিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো সওদাগর বাড়ি!যখন নিস্তেজ হওয়া চাঁদনী আপার প্রাণ আশঙ্কায় কলিজের পানি শুকিয়ে আসছিলো সবার, তখন রোজা সওদাগর করলেন আরেক কাজ। চিত্রার চুলের মুঠি টেনে অনবরত চার-পাঁচটা চ* ড় সে বিরতিহীন

ভাবে বসিয়ে দিলেন চিত্রার কোমল, তুলতুলে গাল গুলোতে। সাথে নিম্ন পর্যায়ের ভাষা। যা শোভনীয় না মায়ের মতন চাচীর মুখে। কিন্তু এসব আচরণে ধ্যান নেই চিত্রার, সে কেবল আপাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিৎকার করছিলো। শেষ চ* ড়টা বসানোর সময় বাহার রুখে দাঁড়ায়। কেমন অদ্ভুত সাহসের সাথে বলে, “ওর গায়ে আরেকটা চ*

ড় পরলে, সে হাত নাও থাকতে পারে।” ব্যাস থেমে গেলেন রোজা সওদাগর। অতঃপর কেঁদে উঠলো সে। সবাই ছুটলো হসপিটালের উদ্দেশ্যে কেবল পুরো বাড়িতে একা পরে রইলো অপ্রয়োজনীয় সদস্য চিত্রা। অবশ্য তার ফুপি,অনয় এবং চেরি রয়ে গেছে কিন্তু চিত্রার প্রতি তাদের অনীহা। রোজা সওদাগর যেতে যেতে চিত্রার পেটে তুমুল

ভাবে লা* থি দিতেও ভুললেন না। আবারও গেইটে মাথা ঠুকে কেঁদে উঠলো চিত্রা। কে জানে, তার আপাটা কেমন আছে! চিত্রার নিরাশায় পরিপূর্ণ ব্যাথার মরুভূমিতে আশার চাঁদ হয়ে এলো বাহার। বাহারের ক্লান্ত, পরিশ্রমে নেতিয়ে যাওয়া শরীরটাকে হেলদুলে আসতে দেখা গেলো।

বাহার গেইটের দিকে এসে বিধ্বস্ত চিত্রাকে দেখে হতভম্ব। অনবরত কান্নার ফলে চোখ ফুলে নাজেহাল অবস্থা। বাহারের চোখে-মুখে বিস্ময়। সেই বিস্ময় ছড়িয়ে গেলো কণ্ঠধ্বনি অব্দি। সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“রঙ্গনা, এখানে এ অবস্থায় কি করছো! তুমি এখনো রুমে যাও নি!”

চিত্রা কথার উত্তর দিলো না। মনের মাঝে প্রশ্নরা দানা বেঁধে আছে। কিন্তু

জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। যদি কোনো খারাপ খবর হয়, তবে চিত্রা নিজেকে কীভাবে ক্ষমা করবে?

বাহারের প্রশ্নে উত্তর দিলো মতিউর রহমান,“না বাবা, আম্মা যে সেই সন্ধ্যা বেলা এখানে বসেছে, এখানেই আছে। আমি কতবার কইলাম ভেতরে যাইতে, উনি পথেই বসে আছে।”

বাহার ভাইয়ের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হলো। হাঁটু ভেঙে সে বসলো চিত্রার পাশে। চিন্তিত কণ্ঠে বললো,

“এই মেয়ে, এখানে এভাবে বসে আছো কেনো? মাথায় কি সমস্যা তোমার? কি অবস্থা নিজের করেছো? উঠো দেখি।”

আহ্লাদ পেয়ে গেলো চিত্রার কান্না। সে বাহার ভাইয়ের ডান হাতটা আঁকড়ে ধরে অপরাধী কণ্ঠে

অনবরত বলতে লাগলো,“আমি ইচ্ছে করে করি নি এমন, বাহার ভাই। আপনি তো আমায় বিশ্বাস করেন তাই না?”

বাহার চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো,

“আমার বিশ্বাস করার আগে তোমার নিজেকে নিজের বিশ্বাস করা উচিৎ। তুমি কেনো ভয় পাচ্ছো, অপরাধী ভাবছো নিজেকে!”

“কিন্তু তখন আমিই আপার হাত ঝাড়া দিয়ে ছিলাম। এটা তো ঠিক।”

“যা হয়েছে সেটা দুর্ঘটনা, ইচ্ছেকৃত না। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না।”

“আমাকে কেউ বিশ্বাস করছে না, বাহার ভাই।”

“আমি তো করছি। চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করছি। আমি জানি, তুমি

কারো বিরাট ক্ষতির কারণ হবে না।”

চিত্রার তুমুল কান্নায় এই স্বান্তনার বাণী টুকু প্রয়োজন ছিলো। কান্নার ছাটও নিমিষেই কমে এলো। চিত্রা চোখ-মুখ মুছে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো,“আচ্ছা বাহার ভাই, আপা কেমন আছে? আর বাবু? দশ মাস বাবুর জন্য কত অপেক্ষা করলাম, আর শেষ মুহূর্তে এসেই কিনা,,, ”

কথা বলতে বলতে আবারও চিত্রার আকাশ ভেঙে কান্না এলো। বাহার তৎক্ষণাৎ মুখ চেপে ধরলো চিত্রার। আদুরে এক ধমক দিয়ে উঠলো। মিছে রাগী রাগী স্বরে বললো,

“আরেকবার যদি কেঁদেছো, তবে এখুনি তোমাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবো।”

বাহারের এমন অবিশ্বাস্যকর কথায় কান্নার মাঝেও হেসে দিলো চিত্রা।

গোলগোল চোখে হাসতে হাসতেই বললো,

“আমাকে কি আপনার চেরি মনে হয় যে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন!”

“কেনো দেখাতে পারবো না ভয়? তুমি চেরি না হও চিত্রা তো।”“হ্যাঁ, আমি চেরি না চিত্রা। কেউ বড় মানুষকে এগুলা বলে ভয় দেখায়?”

“তাহলে বড় মানুষ, তুমি কেন এমন অবুঝের মতন কাঁদছো! বড় মানুষের তো অবুঝ হওয়া সাজে না।”

বাহারের কথার জালে যে খুব বাজে ভেবে ফেঁসে গেছে চিত্রা তা আর বুঝতে বাকি রইলো না তার। অতঃপর ছোটো একটা শ্বাস ফেলে, নিবিড় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

“আপার কী অবস্থা, বাহার ভাই? সুস্থ আছে তো?”

বাহার মাটি থেকে উঠে চিত্রাকে ডান হাত দিয়ে টেনে তুললো। চুল গুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বললো,

“তোমার আপা ঠিক আছেন। এখন রুমে গিয়ে সুন্দর মতন গোসল করে, খেয়ে ঘুমাবে কেমন?”

অগোছালো বাহারের এমন গোছানো যত্নে চিত্রার কান্নারা নির্বাসনে গেলো। সে ভদ্র মেয়ের মতন বললো,

“আচ্ছা।”

সে ভদ্রমেয়ের মতন কথা রাখলো। শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাহার তাকে হাত ধরে ঘর অব্দি পৌঁছে দিলো।বাহার ভাই যে ভীষণ মিথ্যে কথা বলে চিত্রাকে সামলেছে তা জানা গেলো পরেরদিন হসপিটাল থেকে সবাই আসার পর। মুখ থমথমে অনুভূতি, তার প্রতি

সকলের অসন্তুষ্ট চাহনি আর বড়চাচীর আক্রোশ দেখে।

গতকাল রাতে চিত্রা বাহার ভাইয়ের কথা অনুযায়ী গোসল করে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙার পর দেখে ঘড়ির কাটায় সময় তখন দুপুর বারোটা। হুড়মুড় করে সে উঠে বসতেই নিচ থেকে কেমন ফুঁপানোর শব্দ এলো। কে যেন মিহি স্বরে কাঁদছে। চিত্রা হতবিহ্বল। গতকাল

বাহার ভাইয়ের কথা অনুযায়ী তো আজ কান্না-কাটি করার কথা না। তাহলে!মনের কৌতূহল মিটানোর জন্য সে দ্রুত গতিতে নেমে গেলো বিছানা থেকে। তার চেয়েও দ্রুত সে বসার রুমে উপস্থিত হলো। বসার রুমে বড় চাচীর ক্রন্দনরত মুখটা দেখেই ছলাৎ করে উঠে বুক। সে চাচীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“চাচী, কী হয়েছে? কাঁদছো কেনো?” রোজা সওদাগরের ঝিমিয়ে থাকা আক্রোশ তুমুল হলো। চিত্রাকে তুমুল এক লা* থি মেরে বসলো। চিত্রা দু’হাত দূরে ছিটকে পরলো। তুহিন সবে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে। বোনের এহেন অবস্থা দেখে সে ছুটে এলো। আ* হত চিত্রাকে আঁকড়ে নিলো। নির্ঘুম কাটানো রাত্রির কারণে চোখ-মুখ তার কেমন

হলদেটে ভাব। বড় চাচীর মন মেজাজ খারাপ তবুও বোনের প্রতি এমন আচরণ সহ্য করতে পারলো না তুহিন। কর্কশ কণ্ঠে বললো,

“আপনার হা-পা সামলে রাখবেন, চাচী। নাহয় আমার অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।”

ক্ষুধার্ত বাঘিনীর ন্যায় হিং* স্র হয়ে উঠলো রোজা সওদাগর। সে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিত্রার গলা

চেপে ধরে বলল,“তোর জন্য আমার মেয়েটার আজ এ অবস্থা। তোর এত রা* গ না রে? খেয়ে দিলে আমার মেয়ের বাচ্চাটাকে? তোর এত খিদে?”

অবনী বেগম, অহি ছুটে এলো রোজা সওদাগরকে ছুটানোর জন্য। কেমন পৈচাশিক শক্তি যেন ধরলো তাকে। তুহিন অনেক কষ্টে হাত ছাড়ালো রোজা সওদাগরের। তুমুল পেট

ব্যাথা সাথে গলা চেপে ধরায় চিত্রার মুখ নাক দিয়ে গলগল করে র* ক্ত বের হওয়া শুরু করলো।জীবন ধারার স্রোত কখন কোথায় গিয়ে বিরতি নেয় তা জানে না কেউ। শৈবালের মতন কেবল ভেসে ভেসে চলতে হয় সেই স্রোতের তালে। দিন যায়, ক্ষণ যায় কেবল যায় না স্মৃতিরা। কেমন বুক ভার ভার কষ্টের পাহাড় আঁকে রোজ নিয়ম

করে মন মন্দিরে। কখনো স্মৃতিরা খিলখিল হাসি হাসে, কখনো বা তারা করে নিরব আর্তনাদ। আমরা মানুষেরা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি নিজেদের স্মৃতির সেই ভয়ঙ্কর আহাজারি। স্মৃতি বদলানোর সাধ্য থাকলে, মানুষ সবার আগে নিজের খারাপ স্মৃতি বদলাতো। কারণ দিনশেষে স্মৃতিরা ভালো থাকতে দেয় না আমাদের।সেপ্টেম্বরের

উনত্রিশ তারিখ। বৃহস্পতিবার। চিত্রা নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার আজ পনেরো দিন হলো। কই, একটা সময় যে বাড়িটাকে নিজের পায়ের নিচের ভিত্তি, বেঁচে থাকার অবলম্বন মনে হয়েছিল, আজ সে বাড়ি বিহীন তো ভালোই কেটে গেলো পনেরোটা দিন। তাহলে আগে কেন মনে হতো, সে মানুষ গুলো ছাড়া নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই?

সময় মানুষকে বাঁচতে শেখায়। কখনো অনেক প্রাপ্তির মাঝে বাঁচতে হয়, কখনো বা বাঁচতে হয় তুমুল অপ্রাপ্তিতে। চিত্রারও সেই অপ্রাপ্তির জীবন শুরু হয়তো। অনেক তো হলো প্রাপ্তির ডানা ঝাপ্টানো।

ধানমন্ডি লেকের পাশের বড় রাস্তার কোণ ঘেষে যাওয়া গলিটার ভেতরের দিকের রঙচটা হলুদ রঙের বাড়িটার দু'তলার দুইরুমের নির্জন ফ্লাট টাতে

ঠাঁই হয়েছে চিত্রার। নির্বাসন বলা চলে। চাঁদনীর অনাকাঙ্খিত ক্ষতির শাস্তি স্বরূপ চিত্রার দীর্ঘ নির্বাসন ঘোষণা করা হয়েছে। খারাপ কি! নিরব বেঁচে থাকাটা মৃত্যুর জীবন্ত স্বাদ। চঞ্চল চিত্রাকেও সে স্বাদ নিতে হলো প্রিয় মানুষদের কাঠিন্যতায়। প্রকৃতিতে তুমুল ঝড় উঠলো। চিত্রা শুয়ে ছিলো খাটে। বারান্দায় ফুলের টব পড়ে যাওয়ার শব্দে তার গম্ভীর

ধ্যান নষ্ট হলো। চোখে মেলে তাকাতেই দেখে দুপুরের ঠাঠা রোদ শূন্যে মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ভর সন্ধ্যে বেলা এটা! হুট করে প্রকৃতির এমন অসন্তুষ্ট অবস্থা দেখে বারান্দায় ছুটে গেলো চিত্রা। বারান্দায় কতগুলো জামাকাপড় শুকাতে দেওয়া হয়েছে, সে গুলোই আনার জন্য এত ব্যস্ততা।জামাকাপড় আলগোছে সরিয়ে আনতেই আকাশ

ভেঙে ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি নামলো ধরার বুকে। চিত্রা ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলো। মানুষের সঙ্গ পছন্দ করা চিত্রা আজ নিরবতায় আচ্ছন্ন। ভাগ্যের চাকাটা খুব দ্রুতই ঘুরেছে বোধহয়।

বারান্দার দরজা আটকাতে গিয়ে বৃষ্টির ছাঁট কিছুটা গায়ে লাগলো চিত্রার। দরজার সাথে ডান হাতটার একটু জোরে ঘর্ষণ লাগতেই ডান

হাতের তালুর উপর পরা বড় ফোসকা টা গলে গেলো। মৃদু স্বরে ‘আহ্’ করে উঠলো চিত্রা। একটু আগে ভাতের মাড় গালতে গিয়েই এই অঘটন টা ঘটেছে। অতিরিক্ত জ্বালায় চোখ টলমল করে উঠলো। অথচ চিত্রা ফিক করে হেসে দিলো নিজের ব্যাথা দেখে। হাসতে হাসতে হাঁটু মুড়ে বসলো বারান্দার দরজায় হেলান দিয়ে। ফোসকা পড়া

জায়গাটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভীষণ রকমের আহাজারি করা সুর অথচ তাচ্ছিল্য নিয়ে বললো,
“তোর আজও ব্যাথা লাগে, চিত্রা? ব্যাথারা তবে এত আঘাত পাওয়ার পরও ম* রে নি!”নিজের করা প্রশ্নের ধ্বনি কানে বাজতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সে। যখন বাড়ি ছাড়লো, তখনও তো এমনই বৃষ্টি ছিলো তাই না? এমন

তান্ডবই তো চলে ছিলো প্রকৃতিতে! এমন ধ্বংসই তো হয়েছিলো চিত্রার নরম, কোমল হৃদয়টা তাই না?

চোখ বুঝে চিত্রা। চোখের পাতায় ভেসে উঠে সেদিন তার র* ক্তা* ক্ত মুখের দৃশ্য টা।

চিত্রার নাক-মুখ দিয়ে অনবরত র* ক্তের স্রোত বেরিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যায় তুহিন। তার ভীত কণ্ঠে বাড়ির বাকি সদস্যদেরও দৃষ্টি

পরে চিত্রার উপর। মেয়েটার শরীর নিস্তেজ প্রায়। অবনী বেগম ছুটে আসে, পাগলের মতন চিত্রার চোখ-মুখে পানি ছিটাতে থাকেন। তুহিন হতভম্ব। সাথে হতভম্ব বাড়ির অন্যান্য মানুষেরাও। রোজা সওদাগরও আকষ্মিক ঘটনায় তাজ্জব বনে যায়।বোনের এই নাজেহাল অবস্থাতেও বাবাকে অটল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয় তুহিন।

বাবার প্রতি ঘৃণায় রি রি করে উঠে তার শরীর। চিত্রা ততক্ষণে প্রায় বেহুশ অবস্থা। তুহিন বোনের হেলে যাওয়া শরীরটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বাবার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে,

"আপনি সত্যিই মানুষ তো, আব্বু?"

নুরুল সওদাগর তেমন উৎকণ্ঠা দেখালেন না। বরং বেশ ধীরে বললেন,

“ওকে ঘরে নিয়ে যাও, ডাক্তারকে কল করো।”

তুহিন তাচ্ছিল্য করে উঠে। জীবনের প্রথম তার কোনো মানুষকে ঘৃণা হলো। সে মুখ ঝামটি মেরে বাবাকে বললো,

“আপনার সেটা না ভাবলেও হবে, আব্বু। আমার বোন তো, সামলে নিবো নাহয় আমি। আপনি বরং আপনার সংসার সামলান।”তুহিনের

কথায় এবার একটু চিন্তার ভাঁজ পড়লো নুরুল সওদাগরের মুখে। কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বললো,

“তুমি ব্যবস্থা করবে মানে?”

“যে মেয়েটা আপনাদের চক্ষুশূল, সে নাহয় আর আপনাদের চোখের সামনে না রইলো।”

তুহিনের এমন পরিস্থিতিতে এমন কথা হয়তো আশাকরি নি কেউ। তাই তো ফুপি ধমকে উঠে বললো,

“তুহিন, কি বলছিস বাবু তুই? মেয়েটার এ অবস্থাতেও এসব বলা লাগে? আপাতত কোনো ব্যবস্থা কর ওর। খারাপ কিছু হয়ে গেলে পরে!”

“ভালোই তো হবে, ফুপি। আপনাদের ঘরে থাকার চেয়ে আমার মনে হয় ওর ম* রে যাওয়াটা ওর জন্য সুখের, তাই না চিত্রার বড় চাচীম্মা?”বাহারের হুট করে আগমন এবং এমন অপ্রাসঙ্গিক কথায় সবার

মুখটা ছোটো হয়ে এলো। নুরুল সওদাগর ধমক দিলেন বাহারকে। আঙ্গুল উঁচিয়ে বললেন,

“তোমাকে কেউ আমার মেয়ের ব্যাপারে বা আমার সংসারের ব্যাপারে কথা বলতে বলেছে?”

“আপনার মেয়ে! হাসালেন তো। সুন্দর কৌতুক। তা আমি মনে করি, এমন বাবার মেয়ের এমন দুর্ভাগ্যই প্রাপ্য। এই যে র* ক্তা* ক্ত হয়ে

পরে থাকাটাই তার প্রাপ্য। শুনেছি বাবারা সন্তানের বটগাছ হয়, একমাত্র আপনাদের পরিবারেই দেখলাম, বাবারা সন্তানের চরম সর্বনাশের কারণ।”

“তোমাকে দু’টো চ* ড় বসানো উচিৎ । বেয়া* দব ছেলে।”“আরে স্যার, আগে নিজে তো আদবটা রপ্ত করুন। তারপর নাহয় অন্যকে বে* য়াদব বলবেন।”

নুরুল সওদাগরের কথা সেখানেই থেমে গেলো। বাহারের সাথে তর্কে জড়ানোটা নেহাৎই বোকামি ছাড়া কিছু না। বাহার এগিয়ে আসলো চিত্রার কাছে। অহির দিকে তাকিয়ে বরফ আনার নির্দেশ দিলো। অহি তৎক্ষণাৎ বরফ নিয়ে চলে এলো। চিত্রার নাকের কাছটাকে কিছুক্ষণ বরফ ধরে রাখতেই বন্ধ হয়ে গেলো র* ক্তের স্রোত। চিত্রার নিভু নিভু

চোখে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। ভেজা ভেজা কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে সে বললো,“আমি সত্যিই চাঁদনী আপার ক্ষতি চাই নি, বাহার ভাই।”

“আমি জানি।”

বাহারের ছোট্টো উত্তরটার পরে জ্ঞান হারালো চিত্রা। মেয়েটার বেহাল অবস্থা দেখে বুক কাঁপলো বাহারের। সে তুহিনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“তুহিন, মেয়েটাকে বাঁচতে চাইলো নিরাপত্তা দিতে হবে। অথচ তোমার পুরো বাড়িটাই বর্তমানে তার জন্য অনিরাপদ জায়গা। যা করবে, ভেবে করো।”

বাহারের ইঙ্গিতের কথাবার্তা হয়তো তুহিন ঠিক বুঝলো। বোনের মাথাটা চেপে ধরে বড়চাচীর হতভম্ব মুখটার দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,“আপনি কী চান?”

“আমি তোমাদের ভালোবাসি। তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি আমার সন্তানদের। চিত্রাকে সামনে দেখলেই আমার সন্তানের সর্বনাশের কথা মাথায় চলে আসে। বাকিটা তোমরা জানো।”

চাচীর উত্তর শোনার পর তুহিন বাবার মুখের দিকে তাকালো। তার এতটুকু বিশ্বাস ছিলো বাবা হয়তো এবার কিছু বলবে। কিন্তু তাকে ভুল

প্রমাণ করে দিয়ে বাবা কিছুই বললেন না আশানুরূপ। বরং নিবিড় কণ্ঠে বললেন,

“ভাবী আমাদের সংসারের কত্রী। তার কথাই শেষ কথা।”অতঃপর তুহিন আর কারো পিছুডাক শুনলো না। বোনকে নিয়ে এক কাপড়েই বেরিয়ে গেলো। ছোটো চাচী, ফুপি, অহি সবাই ই পিছু ডাকলো, কেবল

যার ডাকার কথা ছিলো সে-ই মানুষটাই নীরব রইলো।

সওদাগর বাড়ির বহু পুরোনো ভিত্তিটা কেঁপে উঠলো। ভাঙনের সুরে ইট-পাথর গুলোও যেন কেঁপে উঠলো। এই বাড়িটাকে এক সূত্রে বেঁধে রাখার জন্য যেই নারী জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগ করেছিলো, আজ সেই নারীর হাত ধরে ভাঙন শুরু।হঠাৎ বজ্রপাতে

কেঁপে উঠলো চিত্রা। শরীরও প্রায় কিছুটা ভিজে গিয়েছে। চোখের কোণে সরল গতিতে বেয়ে পড়লো অশ্রুররেখা। কেমন ছাড় খাঁড় করা দুপুর এটা! কেমন নিস্তব্ধ করা বেলা!

বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে চিত্রার ডাক ভেসে এলো যেন ভয়াবহ বাতাস ভেদ করে। চিত্রা মনে মনে ভাবলো হয়তো ভুল শুনেছে। পর পর

আবারও ডাক ভেসে এলো। বারান্দা দিয়ে তাকাতেই ভেজা শার্ট লেপটে থাকা শরীরে বাহার ভাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে। বাহার ভাইয়ের সাথে গত সপ্তাহে দেখা হয়েছিলো। এরপর আর লোকটার খোঁজ নেই। আজ হুট করে কোথা থেকে উদয় হলো সে!চিত্রাকে ধ্যানে মগ্ন থাকতে দেখে বাহার তৃতীয় বারের মতন নাম ধরে ডাকলো এবং নিচে আসার

ইঙ্গিত দিলো। চিত্রা মাথা দুলালো, প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

“নিচে আসবো কেনো? আপনি উপরে আসুন।”

বাহার বৃষ্টির জন্য ভালো করে চোখ মেলে তাকাতেও পারছে না। তবুও বারান্দার জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা চিত্রার মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে বললো,

“তাড়াতাড়ি আসলে আসো নাহয় বসে থাকো। এত কৈফিয়ত দিতে পারছি না।”

চিত্রা অধৈর্য হয়ে বললো,“দাঁড়ান দাঁড়ান, আসছি।”

বাহারের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। সে মিটমিটিয়ে হেসে বললো,

“তাড়াতাড়ি আসো মেয়ে। বৃষ্টি যে আমাকে ভিজিয়ে নাজেহাল করে

দিচ্ছে। অথচ আমার ভেজার কথা ছিলো তোমার প্রেম বৃষ্টিতে।”

এমন খোলামেলা, অস্ফুটে বাহারের লাগামহীন কথাতে তাজ্জব বনে গেলো চিত্রা। সে দ্রুত মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললো। লজ্জায় ক্ষাণিকটা সময় চুপও ছিলো। অতঃপর ফ্লাটের দরজা আটকে ছুটে গেলো নিচে। তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে জুবুথুবু চিত্রার শরীর। হাঁটতে হাঁটতে চলে

এসেছে অনেকটা দূর। বাহার ভাইয়ের নাকি আজ ভেজা শহর দেখার শখ জেগেছে। সেই শখ পূরণ করতেই তার ছুটে আসা।

চিত্রাকে শীতে কাঁপতে দেখে আড়চোখে তাকালো বাহার। ঠাট্টার স্বরে বললো,

“অত কাঁপা-কাঁপি করে লাভ নেই মেয়ে, টিভির হিরোদের মতন গায়ের জামা খুলে দিতে পারবো না।

আমারও তো লজ্জা-টজ্জা আছে নাকি।”বাহারের কথায় গোলগোল চোখ করে তাকিয়ে রইলো চিত্রা। ভাষাহারা তার কণ্ঠ। বিস্মিত কণ্ঠে সে বললো,

“বাহার ভাই, আজ কথার লাগাম ছেড়েছেন নাকি?”

“না না ছাড়ি নি। কেবল বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গেছে বেড়িবাঁধ। ও তুমি চিন্তা করো না, বৃষ্টি চলে গেলে

অনুভূতিরাও আবার লুকিয়ে যাবে।”“বাহার ভাই জানেন? আপনি আমার বিশাল পূর্ণতা।”

“অথচ আমি মানুষটা গোটা এক শূণ্যতা।”

“আপনিও কী তবে আমায় ছেড়ে যাবেন?”

“ছাড়তে যদি হয়, তাইতো ধরতে করছি ভয়।”

“আপনি আমার বৃষ্টির দিনে এক কাপ চা।”

“তুমি আমার বৃষ্টির দিনে গরম গরম খিচুড়ির মাঝে, তেলতেলে ইলিশ মাছ ভাজা।

মিষ্টি মিষ্টি কথাকে শেষমুহুর্তে এসে ঠাট্টায় উড়িয়ে দিলো বাহার ভাই। আবার নিজেই হা হা করে হেসে দিলো। চিত্রা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও পরক্ষণেই সেও হেসে দিলো

বাঁধন ছাড়া হাসি। ভেজা রাস্তায়,তুমুল বর্ষণে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম দৃশ্য বোধহয় এটা। দু’জন মানুষ দু’জনের দিক থেকে তুমুল ভেঙে যাওয়া অথচ দু’জনই দু’জনের সান্নিধ্যে চরম সুখী। অপ্রাপ্তির মাঝে সবাই হাসতে জানেনা, সবাই হাসাতে জানেনা, যারা জানে, তারা প্রত্যেকে একেক জন দারুণ মানুষ। ভেজা শরীরে গরম গরম খিচুড়ি

সাথে ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিলো দুজনেই। চিত্রা মাছ বাছতে পারে না বলে খুব যত্নে সে কাজটা করে দিলো বাহার ভাই। ভাবা যায়, একজন অগোছালো মানুষ কোনো একটা মানুষের কাছে এসে নিপাট ভালো মানুষ হয়ে যায়! ভালোবাসা সব পারে, তাই তো ভালোবাসা সুন্দর।

খিচুড়ি খেয়ে বেরুতেই চিত্রাকে থামিয়ে দিলো বাহার। চিত্রা অবাক হলো, অবাক কণ্ঠে বললো,

” বাসায় যাবেন না? অনেকক্ষণ তো হলো।”

বাহার হাসলো। মিষ্টি কণ্ঠে বললো,

“তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।”

“কি সারপ্রাইজ?”বাহার চিত্রাকে ইশারা করলো পিছে তাকাতে।

তখনও প্রকৃতিতে বর্ষণ অবস্থানরত। চিত্রা পিছু ফিরেই বৃষ্টির মাঝে ঝাপসা ঝাপসা ভাবে মানুষটার মুখ দেখতেই অবাক হয়ে গেলো। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে একবার বাহার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছুটে গেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে। নিসঙ্কোচে জড়িয়ে ধরলো সে মানুষটাকে। চোখের মাঝে তখন তুমুল খুশির অশ্রুরা। শক্ত করে

মানুষটাকে জাপ্টে ধরে ক্রন্দনরত সুরে সে বললো,
“তোমার মতন কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারে নি। ওরা আমায় ভালোবাসে নি।”মায়ের বুকের মাঝে যত্নে লেপ্টে থাকা চিত্রার লতার মতন দেহখানি, চোখো অশ্রুদের সমাহার, কণ্ঠে অভিযোগের তুমুল মি* ছিল। মুনিয়া বেগম হাসলেন, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

“কে বলেছিস শুনতে পাই নি, আবার বল।”

“ওরা আমায় ভালোবাসে নি, আম্মু। তোমার মতন কেউ ভালোবাসতে পারে না।”

“ভালোবাসবে কী করে? সবাই তো আর মা না।”

চিত্রা মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো। যেন কত

সহস্র বছর পর দেখতে পেলো মায়ের মুখখানা! কি ভীষণ মিষ্টি!

বাহার তখনও পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে লেপ্টানো মিষ্টি হাসি। চিত্রা মায়ের দিকে তাকিয়ে আদুরে স্বরে বললো,“তুমি কেনো গেলে আম্মু? তুমি যাওয়ার সাথে সাথে সুখ গুলোও তো আমায় ছেড়েছে।”

“কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ হারানো উত্তম, মানুষ হারালে বাস্তবতা বুঝা যায়। তাই গিয়েছিলাম। তোমার বাহার ভাইকে তো রেখে গিয়েছিলাম, যেন তোমায় আগলে রাখে তুহিন ভাইজানসহ। কিন্তু ভাবি নি তোমার বাস্তবতা এতটা নিষ্ঠুর।”

“বাহার ভাই জানতো তুমি কোথায়!”

চিত্রার চোখে-মুখে তুমুল বিষ্ময়। মুনিয়া বেগম মাথা নাড়ালেন। কোমল কণ্ঠে বললেন,

“হ্যাঁ, জানতো। আমি প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম, কাউকে বলে যাই নি কেবল তোমার মাথার ভূ* ত ছাড়ানোর জন্য। কে জানতো, সুখও তোমায় ছেড়ে যাবে!”

শেষের কথাটায় দীর্ঘশ্বাসের ছোঁয়া। চিত্রা বাহার ভাইয়ের দিকে

তাকালো। অভিমানীনির অক্ষি দ্বয়ের ভাষা যেন বুঝলো বাহার ভাই, তাই তো দু’কম এগিয়ে এলো, চিত্রার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছোট্টো কণ্ঠে বললো,

“আন্টিকে বুদ্ধিটা দেওয়ার জন্য আমি কোনোরকমের গিল্টি ফিল করছি না। তোমার বিয়ের সাধ ছাড়ানোর জন্য ই বুদ্ধি।”চিত্রা মুখ

ভেংচি দিলো। বাহার হাসতে হাসতে ফিসফিস করে বললো,

“চিন্তা কিসের মেয়ে? মনে রেখো, আমি তোমায় আলো দেবো, সূর্য ডোবার পরেও।”

চিত্রা তৃপ্তির শ্বাস ফেললো। বাহার তাদের রিক্সায় উঠিয়ে পাঠিয়ে দিলো গন্তব্যে। রিক্সার বিপরীতে হাঁটা ধরলো সেও, গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো,

“ভুলভাল ভালবাসি,
কান্নায় কাছে আসি
ঘৃণা হয়ে চলে যাই থাকি না
কথা বলি একা একা,
সেধে এসে খেয়ে ছ্যাঁকা
কেনো গাল দাও আবার বুঝি না।”আফজাল সওদাগর যখন বাড়ি ফিরলেন, বাড়ির এমন বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সে প্রায় হতভম্ব। ছোটোবেলা থেকেই পরিবারকে

আগলে রাখার এক অদম্য শখ তার মনে ছিলো। ভাই-বোনদের সে খুব ভালোবাসতেন তাই তাদের আগলিয়ে রাখার নিখুঁত এক চেষ্টা চলতো তার ভেতর। আর তার চেষ্টাকে সবসময় সাহায্য আর সম্মান করেছে তার অর্ধাঙ্গিনী। একমাত্র এ পরিবারটাকে এক রাখার জন্য কত কিছু সে মনের মাঝে দাফন করেছেন, আর আজ সেই রোজা

সওদাগর কিনা কারো ভেঙে যাওয়ার কারণ!ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে আফজাল সওদাগর বসে আছেন তার রুমের আরাম কেদারায়। চোখেমুখে তার ভেসে উঠেছে কালো অতীতের কিছু স্মৃতি। জীবনে উপরে উঠার জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য কম পাপ করেন নি। ক্ষমতার কারণে সে ধামাচাপা দিয়েছে কত পাপ! বাহিরের দুনিয়ার সাথে সে যতটা শক্ত, পরিবারের

জন্য ঠিক ততটাই কোমল। কিন্তু আজ! কি হলো অবশেষে? পাপ তো বাপকেও ছাড়ে না।

আফজাল সওদাগরের সামনে ঠান্ডা লেবুর শরবত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রোজা সওদাগর। মুখে তার কথা নেই। গম্ভীরতা পুরো মুখ জুড়ে।

আফজাল সওদাগর লেবুর শরবত টা নিলেন না, বরং অদ্ভুত কণ্ঠে বললেন,“আমার যুবক বয়সের

পাপের শাস্তি কি তুমি, এখন দিচ্ছো?”

স্বামীর গম্ভীর কণ্ঠে কাঁপলেন রোজা সওদাগর। কিন্তু কথা বললেন না। ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

আফজাল সওদাগর অনেক বছর পুরোনো প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন এক নিমিষেই। স্ত্রীর হাতের শরবতের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেললেন মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে

টুকরো টুকরো হলো গ্লাসটা। সাথে ভীত হলো রোজা সওদাগরও। মিনিট ব্যবধানে সশব্দে চ* ড় পড়লো তার গালে। সে তাজ্জব,হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইলো স্বামীর পানে। আজ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর আগে দেওয়া কথাটা ভেঙে ফেলেছে তার স্বামী, তা যেন সে মানতে পারলো না।

আফজাল সওদাগরের তখন চোখ দিয়ে ঝরছে অগ্নি। সেই আগুনে সে যেন জ্বালিয়ে দিবে তার অর্ধাঙ্গিনীকে। কণ্ঠে তার তুমুল ক্ষোভ, চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন,“তোমার সাহস হলে কীভাবে, আমার অবর্তমানে আমার পরিবারটাকে এক ছিন্ন বিছিন্ন করার? ফকিন্নির বাচ্চা।”

রোজা সওদাগর নিরুত্তর। অনেক দিন পর স্বামীর পুরোনো রূপ দেখে প্রায় সে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। মানতে কষ্ট হচ্ছে তার যে এটাই তার স্বামী। আফজাল সওদাগরের মুখের ভাষা বিশ্রী থেকে বিশ্রী হলো। ক্রোধ ঝরে পড়লো সারা শরীর উপচে। টিকতে না পেরে রোজা সওদাগরের চুলের মুঠি টেনে ধরলেন। বা'গালে আরও একটা চ* ড় বসিয়ে

বললেন,“ফকিন্নির মেয়ে হুট করে রাজার আসনে বসলে তো এমনই হবে। তুই আবার আমার ভাইয়ের মেয়ের গায়ে হাত তুলিস। তোর সাহস দেখে আমি অবাক।”

“আপনার সাহস দেখেও আমি অবাক। ভুলে যাচ্ছেন, আমার কাছে আপনার ইজ্জত আমানত আছে? এমন কিছু করবেন না যে আমার

সবটা মেলে দিতে হয় সবার সামনে।”

রোজা সওদাগর যে খুব নিবিড় একটা হুমকি দিলো তা বুঝতে বাকি রইলো না আফজাল সওদাগরের। তার রাগ তখন সীমা পেরিয়ে গেলো। অনবরত আঘাত করতে থাকলো তার স্ত্রীকে।

তাদের ঘরের এমন হৈচৈ শুনে অবনী বেগম, অহি, চাঁদনী সহ সবাই

ছুটে আসে। এমন বিরল ঘটনা ঘটতে দেখে তারা রীতিমতো অবাকে হা হয়ে রইলো। লতা বেগম আর অবনী বেগম এসে হাত ছুটানোর চেষ্টা করলো কিন্তু আফজাল সওদাগরের পুরুষ শক্তির কাছে তাদের জোড়াজুড়িটা খুবই স্বল্প। চাঁদনীর শরীর তখনও দুর্বল, কণ্ঠে অসুস্থতার ছোঁয়া, তবুও সে

এই ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,“আব্বু, কি করছো? আম্মুকে ছাড়ো।”

মেয়ের দুর্বল কণ্ঠ কর্ণদ্বয়ে পৌঁছাতেই হাতের চাপ ঢিলে করে দিলো আফজাল সওদাগর। ছেড়ে দিলেন অর্ধাঙ্গিনীকে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকে নিয়ে সবার মনে যে সম্মানের জায়গা ছিলো, আজ সে জায়গাটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেলো।

রোজা সওদাগরও তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। সেও চায় নি তার স্বামীর সম্মান কিঞ্চিৎ কমুক। তাই তো ঘটনা ধামাচাপা দিতে ক্ষীণ স্বরে বললো,

“সবাই বের হও, উনি মাত্র এসেছেন তো তাই মাথা গরম। তোমরা যাও এখন।”সাথে সাথে সবাই বেরও হয়ে গেলো বিনা প্রতিবাদে। অহি চাঁদনীকে ধরে নিয়ে গেলো।

আফজাল সওদাগরও আবার বসে পড়লেন আরামকেদারা খানায়। সে তার জীবনে ভাই, ভাইদের ছেলে-মেয়ে,বোন, বোনের ছেলেকে অনেক বেশিই ভালোবেসেছে। আর চিত্রাকে বোধহয় একটু বেশিই ভালোবেসেছে কারণ সে চিত্রার মাঝে তার অতীতের খুব গোপনের মায়া-মায়া, আদুরে সেই কন্যার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। যার প্রতি দায়িত্বহীন হয়েছিল

বিধায় তার অগোচরে সে কন্যা ঢলে পড়েছিল মৃত্যুর মুখে। সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে নি। না প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে সে পাপের, তন্মধ্যেই রোজা সওদাগরের এহেন আচরণ তাকে আরও ভেঙে দিয়েছে, তাই তো সে হারিয়ে ফেললো নিজের এতদিনের ব্যাক্তিত্ব কিংবা বলা যায় খোলশ।তপ্ত দুপুরে ঘামে ভিজে একাকার অহির শরীরখানা।

কি মারাত্মক রোদ উঠেছে পহেলা অক্টোবরের আকাশে!বিরক্তের আকাশে হুট করে মুগ্ধতা নিয়ে হাজির হলো নওশাদ। সাদা শার্ট, গলায় টাই, কালো প্যান্টে মারাত্মক সুন্দর লাগছে লোকটাকে। অহি যখন নওশাদের এমন রূপ দেখলো, সে বেশ অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলো নওশাদের পানে।

অহিকে দেখেই হাসি খুশি নওশাদ হেলেদুলে চলে এলো অহির পাশে। মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিয়ে বললো,

“কি হে মিস, আজ রোদ বোধহয় আপনাকে বেশিই উত্যক্ত করেছে!”

অহি ওড়না দিয়ে কপালের ঘাম টুকু মুছলো, বিরক্তের স্বরে বললো,“হ্যাঁ বেশিই উত্যক্ত করেছে, আর এখন

আপনি নিশ্চিত তার চেয়েও বেশি করবেন।”

নওশাদ হেসে দিলেন। মাথার পেছনে চুল গুলোতে হাত বুলিয়ে বললেন,

“তা আপনি মিছে বলেন নি। হুট করে আপনার কথা মনে হলো, তাই চলে এলাম উত্যক্ত করতে।”

“আপনি নাকি কাজ করেন? তা সারাদিন মেয়েদের পিছনে ঘোরা

ছাড়া তো কোনো কাজ আপনার নেই দেখছি।”

“মেয়ের পিছনে ঘুরি ঠিক তবে মেয়েদের পিছে না। আর এখন লাঞ্চ ব্রেক চলছে মিস।”

নিজের ঝাঁঝালো কথার বিপরীতে নওশাদের হাসি খুশি উত্তরে কিঞ্চিৎ খারাপ লাগলো অহির। তাই সে আর কিছু না বলেই হাঁটা ধরলো। নওশাদও সাথে সাথে হাঁটতে হাঁটতে

বললো,“আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি মিস।”

অহি ভ্রু কুঁচকালো। চোখ মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো,

“কি জিনিস?”

নওশাদ তার পকেট থেকে তৎক্ষনাৎ কালো গোলাপ টা অহির সামনে ধরলো। চোখের মাঝে আনন্দের চিলিক খেলিয়ে বললো,

“কালো গোলাপ, ভালোবাসার বিষাদময় প্রতীক। পছন্দ তো আপনার?”অহি মিনিট দুই ফুলটার দিকে তাকিয়ে রইলো। হুট করে তুমুল মাথা ব্যাথায় তার চোখ বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। কেমন যেন শিরা-উপশিরায় আ* ন্দোলন চালালো রাগ। নওশাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো গোলাপটা এবং ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে কয়েক টুকরো করে ছুঁড়ে

মারলো তা দূরে। নওশাদ কেবল ফ্যালফ্যাল করে দেখলো সবটা। সে যেন কোনো ভাষা খুঁজে পেলো না। অহির কাছে এমন একটা আচরণ সে ঠিক আশা করে নি বলা যায়।

অহি তুমুল রাগে হেঁটে চলে গেলো কয়েক পা। নওশাদ তখনো ঠাঁই দাঁড়িয়ে। এই গোলাপটা কেনার জন্য সে অফিস ছুটি নিয়েছে, ফুলের দোকানের কর্মচারীটার সাথে কথা

কাটাকাটি করেছে, অথচ যার জন্য এটা কেনা হলো, সে কি করলো! অহি কয়েক পা এগিয়ে আবার থেমে গেলো। ফিরে তাকালো নওশাদের থমথমে মুখটার দিকে। খারাপ লাগায় ছেয়ে গেলো তার মনের আঙিনা। সে আবার পিছু ফিরলো, পিছুটান টেনে নিয়ে গেলো তাকে নওশাদ অব্দি। অহি ক্ষীণ স্বরে মাথা নত করে বললো,“মন খারাপ

করবেন না। আমি আসলে ফুল পছন্দ করি না। ফুল দেখলেই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। বলা যায় এটা আমার একটা মানসিক রোগ যা কেউ জানেনা। খুব ছোটোবেলার বিদঘুটে ঘটনার প্রভাবে আমার এই মানসিক রোগ, যা মাঝে মাঝে মানুষ খু* ন করার ইচ্ছে জাগাতেও সাহায্য করে।”নিবিড়, নিশ্চুপ স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ ছোট্টো একটা পুকুরের

পাশের বেঞ্চিতে বসে আছে অহি এবং নওশাদ। রোদ ঝিমিয়ে বিকেল প্রায়। প্রকৃতিও বেশ চুপচাপ। নওশাদ তাকিয়ে আছে অহির দিকে, চোখেমুখে তার প্রশ্নের ছড়াছড়ি। ভেতরের অনুভূতিরা অধৈর্য্য, উৎকণ্ঠিত। কিন্তু সে অহিকে সময় দিলো, নিজেকেও প্রস্তুত করলো অপ্রস্তুত কিছু শোনার জন্য। অহি দীর্ঘক্ষণ সময় নিলো। কিছু কথা

যখন বলা হয় না পরিস্থিতির চাপে তখন তা যুগ যুগ ধরে স্মৃতির পাতায় থাকতে থাকতে চাপা পরে যায়। চাইলেও তখন আর তা খুব সহজে মেলে ধরা যায় না। অহির অবস্থাও ঠিক তা-ই। খুব বাজে অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে চালাতে আজ তা ধূলো পড়ে ধোঁয়াশা হয়ে গেছে। সেই ধূলো

পরিষ্কার করতে কিঞ্চিৎ সময় তো লাগবেই।

প্রায় মিনিট দশ পর অহি মুখ খুললো, কণ্ঠ ধ্বনিরা প্রস্তুত হলো বিভীষিকা ময় কথা গুলো বলার জন্য। ভীষণ বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলা শুরু করলো,“ছোটোবেলা থেকেই আমার মা আমার ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন ছিলো, সেই উদাসীনতার জন্য

ছোটো বয়সে আমার সাথে ঘটে গিয়েছে বড় বিপর্যয়। আমার বয়স তখন সাত কিংবা আট হবে। বাবা-মায়ের একদিন তুমুল কথা কাটাকাটি, অবশেষে কথা কাটাকাটির অবসান ঘটলো আমাকে গৃহান্তর করার মাধ্যমে। মায়ের জেদের কারণে আমার এত বড় বাড়ি, এত সুন্দর পরিবার থাকতেও আমাকে পাঠানো হয় হোস্টেল।

জীবন বোঝার আগেই যৌ* নতার লালসার শিকার হবো তা হয়তো কারোই জানা ছিলো না। হোস্টেলের পর্যবেক্ষণ করতো এক মামা ছিলো যে সব বাচ্চাদের আদর করতো। আমাদের চকলেট দিতো, কোলে নিয়ে ঘুরতো। আমি খুব কমই মামার সান্নিধ্যে যেতাম। ছোটোবেলা থেকে খুব চুপচাপ থাকার কারণেই মানুষের সাথে কম মিশতাম। তখন

সময়টা শীতকাল, ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর দিকে। হোস্টেলের বেশিরভাগ দায়িত্বরত সদস্য ছুটিতে। আমি বিকেলে হোস্টেলের পেছনের দিকে বাগানে খেলছিলাম। ফুল আমার প্রিয় ছিলো বিধায় সেটা নিয়েই নিজের আপন মনে হাবিজাবি এঁকে খেলায় মত্ত ছিলাম। এর মাঝেই সেই লোকটা এলো যে সব বাচ্চাদের আদর করতো। তথাকথিত

নিয়মে সে আমার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে দিলো, চকলেট দিলো অথচ আমি নিলাম না। বাচ্চা হলেও বুঝতাম অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া উচিৎ না। মামা তখন একটা সূর্যমুখী ফুল এনে আমার হাতে দিলো, আমি তো খুশিতে আত্মহারা। আমাকে হাসি-খুশি দেখে মামা কোলে নিলেন। আমিও বেশ আনন্দে কোলে উঠে

গেলাম। যখন আমি ফুল নিয়ে ব্যস্ত তখন অনুভব করলাম আমার... আমার বুকে প্রচন্ড ব্যাথা হচ্ছে। ব্যাথার চোটে চোখে টলমলে অশ্রুদেরও ভীড় জমে গেলো। আমি উফ্ করে শব্দ করে উঠলাম। মামার দিকে তাকিয়ে বললাম 'মামা, ব্যাথা'। মামা বিদঘুটে হেসে বললো, 'আদর করলে একটু ব্যাথা লাগবেই, মামা তো তোমাকে আদর করছি।'

আমি তবুও কিছুটা মোচড়ামুচড়ি করছিলাম, অস্বস্তিতে ভরে গেছে আমার শরীর। আমার ছোটো নাজুক শরীরটা তখন মামার হাতের মুঠোয়, সে যেভাবে পেরেছে সেভাবে ছুঁয়ে দিয়েছে। তারপর বাগানের মালি কাকাকে আসতে দেখে সে আমায় ছেঁড়ে দিলো। তারপর আমি ফুলটা ছুড়ে ফেলে নিজের ঘরে চলে গেলাম।”দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামলো

অহি। অদ্ভুত ভাবে নওশাদের চোখে অশ্রু থাকলেও অশ্রু নেই অহির চোখে অথচ তার কণ্ঠনালী কাঁপছিলো। অহি মাথা নিচু করলো, ডান হাত দিয়ে অনবরত নিজের বাম হাত মুচড়োচ্ছিলো। তার যে সেসব অতীত মনে করে খুব কষ্ঠ হচ্ছে তা বুঝতে বাকি রইলো না নওশাদের। তাই তো সে গলা পরিষ্কার করে বিবশ কণ্ঠে বললো,

“আজ নাহয় থাক। অতীত নাহয় অতীতই থাকুক।”

অহি হাসলো, তাচ্ছিল্য করে বললো,

“ঘৃণা হচ্ছে তাই না আমার উপর! হওয়াটাই স্বাভাবিক।”

অহির কথার ধরণে হতবিহ্বল নওশাদ। তাজ্জব হয়ে বললো,

“কী বলছেন? আপনার খারাপ লাগছে বিধায় না করেছি।”

অহি হাসলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,“এখন আর খারাপ লাগে না। এত বছর নিজের মাকেও বলতে পারি নি এসব কথা। কেবল আমি আর আমার ঐ আল্লাহ জানতো আমি যে কি লুকিয়ে বেঁচে ছিলাম। আজ যেহেতু বলা শুরু করেছি, তাহলে বলি?”

‘তাহলে বলি’ কথাটাই যেন কেমন নিবিড় আর্তনাদ ছিলো। বিদঘুটে

অতীত বের করে মন হালকা করার একটা হাহাকার ছিলো যা ছুঁতে পারলো নওশাদকে। সে ধীর কণ্ঠে বললো,

“আমি শুনছি তবে, আপনি বলুন।”

অহি পুকুরের ঝলমলে, স্বচ্ছ জলরাশির দিকে তাকিয়ে বলা শুরু করলো,“সেইদিন আমার সাথে ঘটা বিদঘুটে ঘটনা টা কিঞ্চিৎ নাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে। কই, বাবা-চাচা

সবাই তো আমাকে আদর করতো কিন্তু কখনো এমন ব্যাথা দেওয়া আদর তো করতো না। সন্ধ্যার দিকে যখন সব নিরিবিলি মালি কাকা এলেন আমার ঘরে। আমি তখন পড়ার টেবিলে বই নিয়ে বসেছি। কাকা এসেই আমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসলেন, তার চোখেমুখে কি যেন একটা হাবভাব। সে আমাকে কেমন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন ‘তোমার

সাথে ফজলু কিছু করছে?’ আমি এক ঝটকায় বুঝে ফেললাম কাকা বিকেলের সেই ঘটনার কথা বলছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, অনবরত ডানে-বামে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললাম ‘না’। মালি কাকা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন তখনই। আমার ছোটো মনে তখন অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়েরা হানা দিলো। সেই ঘটনার তিনদিন পরের

কাহিনী। আমি রাতে খাবারের পর দাঁত ব্রাশ করতে করতে হোস্টেলের পিছনের বারান্দায় গেলাম যেটা আমার অভ্যাস ছিলো। সেখানেই হোস্টেলের কর্মচারীদের কোয়াটার ছিলো। আমি হঠাৎ ভীষণ হাসাহাসির শব্দ শুনলাম ঐ মামার ঘর থেকে। তার দরজাটাও হালকা খোলা ছিলো। আমি ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম সেই ঘরটাতে। কিন্তু দরজা পুরোটা হাত

দিয়ে খুলে দিতেই আমি হতভম্ব। ভেতরের দেখা দৃশ্যটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এত অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো। আমাদের খাবার সার্ভ করা খালা আর মামা ছিলেন সে ঘরে। আমি ভয় পেয়ে ছুটে আসতে নিলেই খালা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন আমায়। মামার চোখে তখন উপচে পড়া লালসা। মামার লালসাকে সাঁই দিলেন খালাও। সে

আমাকে জোর করে ধরে আমার জামার পেছনের চেইনটা খুলে দিলেন। একজন মহিলা, যার কন্যার বয়সী হয়তো ছিলাম আমি, সে কিনা মামাকে খুশি করতে আমায় বলিদান করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। মামার এলোমেলো, নোংরা ছোঁয়ায় আমি নেতিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর....”কথা থেমে গেলো অহির। তুমুল কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

নওশাদও আবিষ্কার করলো তার হৃৎপিণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বিট করছে। অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছে তার শরীর। ঘৃণায় ভরে উঠেছে অনুভূতিরা। ছোটো একটা মেয়েকেও কিনা ছাড় দেয় নি! সে চাইলো,অহির কাঁধে ভরসার হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে, কিন্তু সে তা করলো না। কারণ অহির মনে এখন অতীতের নোংরা

ছোঁয়ার স্মৃতি কিলবিল করছে, নওশাদের সঠিক ছোঁয়াও হয়তো আরেকটা ভিন্ন ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে। তাই নওশাদ নিজেকে সংযত করলো। কাঁদতে দিলো অহিকে।

অহি কাঁদলো, পাহাড়ের মতন অটল অহি নিমিষেই গলে জল। কাঁদতে কাঁদতে যখন চোখের জল ফুরালো সে ভেজা কণ্ঠে বললো,“নওশাদ, জানেন সেদিন আমি বেঁচে

গিয়েছিলাম। আমার সাথে খারাপ ঘটতে গিয়েও ঘটে নি। আমার চিৎকারে মালি কাকা ছুটে এসেছিলো, হৈচৈ শুনে ছুটে এসেছিলো আমাদের হোস্টেলের কয়েকজন মেডাম। আমি ততক্ষণে নেতিয়ে পড়ে গিয়েছি। কাকার কারণে শেষ মুহূর্তে আমি বেঁচে যাই। অতঃপর মেমরা আমাকে বলে এসব নাকি খারাপ কথা, মানুষ জানলে

আমায় নোংরা বলবে তাই যেন কাউকে না জানাই। আমিও তাই লুকিয়ে গেলাম সবটা। ওদের কি হয়েছিল পরে আমার জানা নেই, কেবল আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাড়িতে। মিছে অযুহাত দেখিয়ে বলে ছিলো আমি নাকি থাকতে চাচ্ছি না আর সেখানে। তারপর থেকে সে ঘটনা আমাকে মানুষ থেকে মানসিক রোগীতে রূপান্তরিত করলো।

কাউকে বলতে না পারার কারণে খুব বাজে ভাবে পোকায় খেয়ে ফেললো আমার ভেতর টা। এরপর থেকে আমি ফুল সহ্য করতে পারতাম না। মাঝে সাঝে ঐ মানুষ গুলোকে খু* ন করার তৃষ্ণাও জাগতো। এটা ধীরে ধীরে মানসিক সমস্যা হয়ে গেলো।”নওশাদ চুপ, নিরুত্তর। অহির ক্ষণে ক্ষণে নাক টানার শব্দ পাওয়া গেলো। কিছুটা

ক্ষণ দু’জনে চুপ থাকার পর উঠে দাঁড়ালো অহি। ক্ষীণ স্বরে বললো,

“বুঝলেন তো নওশাদ, মনের মাঝে যেই ঘৃণা আছে তা নিয়ে আমি আরও একজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি জানি মানুষটা আমার না। আর আমিও তো পবিত্র না।”

“আমার কাছে কারো বিদঘুটে ছোঁয়া আপনার অপবিত্রতা হতে পারে না।

আর ভালোবাসার কথা তো আপনিই বললেন, সে মানুষ যেহেতু আপনার না তবে যে মানুষ আপনাকে ভালোবাসছে তাকে নাহয় আগলে নিন।”

“হয়তো পারবো না। আমার এমন কলুষিত জীবনের সাথে আপনাকে জড়াতে চাইছি না। আপনার ভালোর জন্য বলছি, ভুলে যান ভালোলাগাকে।”

কথা শেষ করেই অহি পা বাড়ালো নিজ গন্তব্যে, নওশাদ কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে বললো,

“কী আশ্চর্য! আপনি আমার ভালো চাইলেন, অথচ আমায় চাইলেন না!”

কথার মাঝে কি যেন একটা ছিলো যা থামিয়ে দিলো অহির পা। পিছুটান তো অহির জন্য না, তবে আজ কেন থামিয়ে দিলো তাকে সে পিছুটান!চিত্রার কোচিং শেষ হতে

হতে সন্ধ্যা নামলো প্রকৃতিতে। সোডিয়ামের আলোয় রাস্তাঘাট উজ্জ্বল। চিত্রা খুশি মনে এক প্যাকেট ঝালমুড়ি কিনলো আর হেলতে দুলতে হাঁটা ধরলো নিজের বাড়ির পথে। কিছুদূর যেতেই তার চোখ আটকালো পরিচিত মানুষটার দিকে, অথচ মানুষটার এখানে থাকার কথা না। যেই মুহূর্তে চিত্রা তাকে ডাক দিতে নিবে মানুষটা

তখনই হাঁটতে হাঁটতে পাশের একটা আঁধার গলিতে ঢুকলো। চিত্রারও কি যেন মনে হলো, সেও ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মানুষটার পিছে পিছে আঁধার গলিতে প্রবেশ করলো। বেশ কত গুলো নোংরা গলি, ভূতুড়ে প্রকৃতি পাড় হয়ে রঙিন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করলো চিত্রা। কেমন অদ্ভুত এক দুনিয়া। চিত্রা হতভম্ব আশপাশের মানুষ গুলোর দিকে

তাকিয়ে। সভ্য সমাজে অসভ্যের স্থান দখল করা প* তিতালয়ে এসে পড়েছে সে। ধানমন্ডির রাস্তা পার হয়ে অনেকটা দূরেই যে চলে এসেছে সে, তা আর বুঝতে বাকি রইলো না তার। চিত্রা বেশ অবাক হয়েছে অমন মানুষকে এইরকম একটা জায়গায় আসতে দেখে। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেছে তার শরীর। মৃদু কম্পন দেখা

দিয়েছে তার শরীরের শিরায়-উপশিরায়। তন্মধ্যে কেমন বিদঘুটে হাসি দিয়ে একটা লোক বলল,“কি সুন্দরী, দাম কত তোর?”

কিশোরী চিত্রা আরও ক্ষাণিকটা ভয় পেয়ে যায়। সে আর কোনো কথা না বলে যে রাস্তা দিয়ে এসেছে, সে রাস্তাতেই ছুট লাগায়। পেছন থেকে ম* দ খেয়ে নেশায় বিভোর হওয়া লোকটার বিদঘুটে হাসির শব্দ ভেসে

এলো। চিত্রা চোখ-মুখ বন্ধ রেখেই যেন ছুটে চললো। কতটা দৌড়িয়েছে তার জানা নেই, তার দৌড়ানোর সমাপ্তি হলো একটা শক্ত সামর্থ্য দেহের সাথে ধাক্কা খাওয়ার পর।

“কি ব্যাপার, দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে নাকি? এভাবে চোখ-মুখ বন্ধ রেখে কোথায় যাচ্ছো!”

সামনের পুরুষটির কথায় চোখ মেলে তাকালো চিত্রা। গলা শুকিয়ে কাঠ প্রায়। তবুও বেশ কষ্টে সে উচ্চারণ করলো,

“একটু পানি দেন, বাহার ভাই।”চিত্রার এমন উত্তেজিত মুখমন্ডল দেখে অবাক হলো বাহার। দ্রুত পাশের দোকানটা থেকে পানির বোতল কিনে আনলো। চিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে পানির বোতল।

চিত্রা ডান-বামে না দেখেই ঢকঢক করে বেশ খানিকটা পানি পান করলো। অতঃপর জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো।

বাহার ভ্রু কুঁচকালো, অবাক কণ্ঠে বললো,

“কোথায় গিয়েছিলে? হাঁপাচ্ছো কেনো?”চিত্রা বেশ কতক্ষণ চুপ থেকে নিজেকে ধাতস্থ করলো। তারপর বেশ ভাবুক স্বরে বললো,

“বাহার ভাই, সব রহস্যের সমাধান হচ্ছে না কেনো জানেন? ধূলো পড়েছে চেহারায় আর আমরা মুছছি আয়না। আসলে আমরা রহস্যের সঠিক রাস্তায় এখনো হাঁটাই ধরি নি।”চিত্রার আধো রহস্য মাখা কথা আধা-ই রইলো। সে পুরোটা বিশ্লেষণ করলো না বাহারের কাছে, কেবল কতক্ষণ বিজ্ঞ ব্যাক্তিদের

মতন ভাবুক হয়ে রইলো। যেন রাজ্যের ভাবনায় মত্ত সে!

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পেরিয়ে রিকশা নিলো বাহার। দু'জনই রিকশায় উঠে বসলো। নিস্তব্ধ রাস্তা, হুড়মুড় করে বাতাস ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে আদুরে ভাবে। বাহার চুপ করে রইলো, সাথে চুপ রইলো চিত্রাও। আকাশে রূপোর থালার মতন চাঁদ। অক্টোবর এসেছে বিরাট

জ্যোৎস্না নিয়ে। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসে শরীরে ক্লান্তিটাও ক্ষাণিক বিশ্রামে গেলো। কয়েকদিন পর তো আবার শীত আসবে। শীতকাল চিত্রার বেশ প্রিয়। কেমন মিষ্টি অলসতায় কাটে। চিত্রা আবার বেশ অলসতা প্রিয়। দু'জনের নিশ্চুপ ভাবনার মাঝে রিকশা এসে থেমেছে চিত্রাদের গলির মুখে। চিত্রা ঝটপট বাহার ভাই টাকা বের করার আগে নিজেই

রিকশা ভাড়া দিয়ে দিলো। তা দেখে বাহার কিঞ্চিৎ হাসলো। পকেট থেকে সিগারেট বের করে তা দুই ঠোঁটের ভাঁজে চেপে লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বললো,

“বেশ চালাক হচ্ছো যে!”

বাহারের বাক্যের মানে চিত্রার ঠিক বোধগম্য হলো। মুচকি হেসে সে বললো,

“আপনার সাথে থাকি, আর চালাক হবো না?”

“তা বেশ ভালো। চালাক হতে ক্ষতি কি! তবে চিন্তা নেই, চাকরি পেলে তোমার রিকশা ভাড়ার দায়িত্বটা আমি নিজের কাঁধে নাহয় নিয়ে নিবো।”

“আপনি চাকরি করবেন?”

হাঁটকে হাঁটতেই বাহারের দিকে তাকিয়ে চিত্রার প্রশ্ন। বাহার পায়ের

কাছের খালি বোতলটা তে ছোটো লা* থি দিয়ে বললো,“ভাবছি তো করবো। রিকশা ভাড়াটা দেওয়ার জন্য হলেও চাকরি করা জরুরী।”

“তারপর আমায় বিয়ে করবেন তো, বাহার ভাই?”

চিত্রার প্রশ্নে বাহার বিশেষ অবাক হলো না। কারণ সে জানে, বয়ঃসন্ধিরা আবেগ প্রকাশ করতে ভীষণ পছন্দ করে। আর কিছু কিছু

ক্ষেত্রে মানুষ তার প্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে একটু বেশিই বেহায়া হয়ে যায়। চিত্রাও তার বাহিরে না।

বাহারকে চুপ থাকতে দেখে চিত্রা আবার প্রশ্ন করলো,

“আমি আপনার এতটাই অপছন্দ?”

“তুমি তো তোমার বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করবে তাই না? ঐ যে ভদ্র সুশীল ছেলেটাকে।”

বাহারের ঠাট্টা মাখানো কথায় ছোটো হয়ে এলো চিত্রার মুখ। ক্ষীণ স্বরে সে বললো,“আমার তো অ-ভদ্র আপনিটাকেই পছন্দ।”

“বয়ঃসন্ধির আবেগ দিয়ে ফাঁসাতে চাচ্ছো?”

“একদম না, অষ্টাদশীর ভালোবাসা দিয়ে ফাঁসাতে চাচ্ছি।”

বাহার আর উত্তর দিলো না। চিত্রা মন খারাপ করে বললো,

“চাকরি টা হবে তো?”

“তোমার সাথে সংসার করতে হলে, চাকরিটা হতেই হবে, তাছাড়া উপায় নেই। আচ্ছা, তোমার বাড়ির চিলেকোঠার ঘরের মতন একটা ঘরে কী কী আসবাবপত্র লাগবে বলো তো? সংসার সম্পর্কে ধারণা কম তো!”

বাহারের এমন অপ্রত্যাশিত কথায় হতভম্ব চিত্রা। চোখ-মুখে খুশির

ঝিলিক দিয়ে উঠলো। সে চমকে যাওয়া কণ্ঠে বললো,“এ জন্যই কি চাকরির খোঁজ করছেন?”

“তোমার ভাই বেকারের কাছে তার বোনকে দিবে? যদি দেয় তাহলে নাহয় খোঁজ না করলাম।”

চিত্রা কিছুক্ষণের জন্য বাক্যহারা হয়ে গেলো। বাহার ভাই এত সহজে মেনে যাবে তা যেন তার ধারণার বাহিরে ছিলো। চিত্রা আর কিছু

বলতে গেলেই থামিয়ে দিলো বাহার। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,

“বাড়ি এসে পরেছে, ভিতরে যাও। সংসার করতে হলে ভালো রেজাল্ট চাই, নাহয় সেসব চিন্তা বাদ।”

চিত্রা এতক্ষণ এতটাই অবাক হয়ে ছিলো যে সে যে নিজের বাড়ির গেইটের সামনে চলে এসেছে তা তার খেয়ালই ছিলো না। বাহারের কথায় আশপাশ তাকিয়ে দেখলো

সত্যিই সে তার বাড়ির সামনে। বাহার চিত্রাকে আর কিছু না বলে সোজা হাঁটা ধরলো। চিত্রা বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো,

“বাহার ভাই, আপনি আমার পুরো জীবনের লাল কালির পূর্ণতা যা জ্বলজ্বল করবে আমার প্রাপ্তির খাতায়।”

বাহার অবশ্য কথাটা শুনেও ফিরে তাকালো না। চিত্রা কতক্ষণ বাহারের

ফেরার অপেক্ষা করে বাড়ির ভেতর চলে গেলো। বাহার বুঝলো, তার পিছে যে অষ্টাদশীর ছায়া নেই। বাহার আকাশের দিকে তাকিয়ে বেশ বিষণ্ণ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,“রঙ্গণা, তুমি আমি বিশাল অপ্রাপ্তির জীবনে হয়তো আরও একটা অপ্রাপ্তি। বাহারদের অনেক স্বপ্ন ঠিকই থাকে, কিন্তু তা ঝরে যায় রাতের আঁধারে। তুমি সকাল অব্দি

থাকলেও পারো, রঙ্গণা। বাহার খারাপ, তবে তার স্বপ্ন না। আমাদের একটা ছোটো সংসার হলে খারাপ হয় না, আমি অপ্রাপ্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তি পেয়ে যেতাম তোমায় পেয়ে। আফসোস! বাহারদের জীবনের স্বপ্ন গুলো ঐ দূর আকাশের চেয়েও দূরের। যা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। তুমি নাহয় মেয়ে, বৃষ্টি হয়ে দিও ছুঁয়ে।”

বাহারের কথা গুলো কি শুনলো রঙ্গণা? হয়তো না। তাতে কি? একটা গোটা রাত তো দেখলো সংসার সাজানোর স্বপ্ন কত সুন্দর হয়! একটা গোটা আকাশ তো জানলো, অপ্রাপ্তিদের কত বেদনা হয়!মহিনের কেইসটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আরও সপ্তাহখানেক আগে। একদম গোলকধাঁধায় মতন এটা একই জায়গায় কেমন ঘুরপাক

খাচ্ছিলো, তাই তো বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহিনের ভাই মাহতাবই বন্ধ করে দিতে বলে। এই গোলকধাঁধায় আর কতদিনই বা ঘুরপাক খাবে? এরচেয়ে থেমে যাক সব ঝামেলা। নুরুল সওদাগররা লাস্টে আরেকটা ক্লু পেয়েছিলো যে এ* সিড নিক্ষেপ করা ছেলেদেরকে অনবরত যে সিম থেকে ফোন দেওয়া হতো সেই সিমটা কার নামে। ইনভেস্টিগেশন

করতে গিয়ে দেখা গেলো ঐ দুই ছেলের মাঝেই একজনের আইডি কার্ড দিয়ে সিমটা কেনা হয়েছিলো। কাকে ধরবে আসামি হিসেবে? ঐ ছেলে দু’ টোকেও তো খু* ন করা হয়েছে। পরপর তিনজন মানুষকে একই ব্যাক্তি খু* ন করেছে কিন্তু সঠিক, স্বচ্ছ প্রমাণের অভাবে বন্ধ হয়ে গেলো ইনভেস্টিগেশন।তপ্ত দুপুরে বিরক্ত ভঙিতে মাহতাব এসে

বসলো তার ঘরে। চাঁদনী নিচ থেকে ঠান্ডা শরবত নিয়ে এলো। আজকাল মাহতাব হুট করেই কেমন রেগে যায়। মেজাজ চরম খিটখিটে থাকে তার। চাঁদনী মাহতাবের হাতে লেবুর শরবতটা ধরিয়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে মাহতাবের মুখের ঘাম মুছিয়ে দিতে নিলেই তার হাত আটকে দেয় মাহতাব। চাঁদনী কিঞ্চিৎ অবাক হয়, উদগ্রীব হয়ে বলে,

“কী হয়েছে তোমার? অফিসে ঝামেলা হয়েছে?”

মাহতাব শরবত টুকু খেয়ে বেশ শব্দ করে টেবিলের উপর গ্লাসটা রাখে। তপ্ত শ্বাস ফেলে কর্কশ মেজাজে বলে,

“চাকরিটা চলে গিয়েছে।”

চাঁদনী বেশ অবাক হলো। মাহতাব সবসময়ই বেশ কর্মঠ লোক। তার

চাকরী যাওয়ার তো কথা না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে বললো,

“চাকরি চলে গিয়েছে মানে? কেনো?”

“মানুষ কি একজনের ভালো আরেকজন সহ্য করতে পারে? পারেনা। যেমন তোমার মা পারে নি চিত্রার ভালো সহ্য করতে তেমন অফিসের কিছু মানুষ আমার ভালো সহ্য করতে পারে নি। চিত্রার ঘর

ছাড়তে হলো আর আমার চাকরি।”চাঁদনী বেশ অবাক হলো তার স্বামীর কথায়, বেশ শক্ত কণ্ঠে ও বললো,

“তুমি কিসের সাথে কি মেলাচ্ছো, মাহতাব? আমার মা তোমার গুরুজন হয়, সম্মান দিয়ে কথা বলো।”

“যে নিজেই নিজের সম্মান রাখতে পারে না, তাকে আবার কিসের সম্মান দিবো হ্যাঁ? তোমার মা বলে

তো আর সে অন্যায় করে পাড় পেয়ে যাবেনা তাই না?”

মাহতাবের কথায় তুমুল তাচ্ছিল্যের সুর। চাঁদনী হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলো তার স্বামীর দিকে। অবশ হয়ে আসে তার অনুভূতিরা। সে বিধ্বস্ত কণ্ঠে কেবল বলে,

“মাহতাব!”

মাহতাব উত্তর দেয় না, গটগট পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। চাঁদনী

কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখে।বনানীর বিলাসবহুল এক ফ্লাটের ডাইনিং রুমে রাতের খাবারের আয়োজনে বেশ তৃপ্তি নিয়ে আহার করছে ছোটো এক সুখী ফ্যামিলি। এই পরিবারটা নওশাদের। মা-বাবা আর নওশাদকে নিয়েই তাদের ছোটো পরিবার।

নওশাদ খেতে খেতে তার মা নওরিন খাতুনের দিকে তাকিয়ে বেশ আয়েশি ভঙিতে বললো,

“মা, তোমাদের কিছু বলার ছিলো।”

নওরিন খাতুন তখন মাছের কাঁটা বাছায় ব্যস্ত। ছেলের কথায় ছেলের দিকে তাকালে, হাস্যোজ্জ্বল মুখ মহিলার। মিষ্টি করে শুধালো,

“কী কথা?”“তোমরা আমার বিয়ে নিয়ে উঠে পরে লেগেছো, সেই সম্বন্ধেই কথা।”

নওশাদের বাবা ইলিয়াস খান খাবার চিবুতে চিবুতে বললেন,

”ও হ্যাঁ ভালো কথা মনে করেছো, নুরুলদের বাড়ি থেকে তো আর কোনো খবর পেলাম না। আজই নাহয় একবার কল দিয়ে জিজ্ঞেস করবো।”

“জিজ্ঞেস পরে করো, আগে আমার কথা শুনো বাবা।”

“কী কথা?”

বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতে সামান্য সময় নিলো নওশাদ। অতঃপর বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো,

“আমরা সেদিন যখন নুরুল আঙ্কেলের মেয়েকে দেখতে গেলাম, সেখানে গিয়ে আমার পাত্রীকে পছন্দ নাহয়ে তার বোনকে পছন্দ হয়ে

গিয়েছে। নুরুল আঙ্কেলের ছোটো ভাইয়ের মেয়েকে। বিয়ে করলে আমি ওকেই করবো।”

নওশাদের কথা শুনতেই খাওয়া থামিয়ে দিলেন নওরিন খাতুন। সে বেশ জোরেই বলে উঠলেন,

“অসম্ভব। অমন খাটো মেয়েকে তোমার কীভাবে পছন্দ হয়! কেমন বোকাসোকা হাবভাব! আমি রাজি না

এই প্রস্তাবে।”“আমি রাজি, মা। সেটাই কি যথেষ্ট না?”

ইলিয়াস খান নিজের স্ত্রীর দিকে তাকালেন। নম্র কণ্ঠে বললেন,

“রাগছো কেন নওরিন? মেয়েটা তো সুন্দরই। আর নওশাদ যেহেতু পছন্দ করেছে সেহেতু,,, ”

নওরিন খাতুন খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে অগাধ গম্ভীরতা ঢেলে বললেন,

“অসম্ভব মানে অসম্ভব। মেয়েটার মাঝে কেমন সাদামাটা ভাব। কখনোই আমি ওরে মানবো না।”

“আমি তো মানছি তাহলে তোমার সমস্যা কোথায়?”

নওশাদও খাবার টেবিল থেকে উঠতে উঠতে মায়ের বিপরীতে কথা বলে উঠলো। ছোটোখাটো কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। বাহিরে তখন

তুমুল বৃষ্টি। ইলিয়াস খান বার বার পিছু ডাকলেন ছেলের অথচ সে একটুও দাঁড়ালো না। ঠান্ডা মানুষ রেগে গেলে এই একটা ঝামেলা। নওরিন খাতুনও ফুসতে ফুসতে ঘরে গিয়ে দোর দিলেন।বৃষ্টির মৌসুম বলে রাতে চিত্রাদের বাসায় খিচুড়ির আয়োজন করা হয়েছে। চেরিকে নিয়ে অহিও এসেছে ওদের বাসায়। মাহতাব এসেছে। একটা হৈচৈ পরে

গেছে ছোটো ফ্লাটটাতে। রান্নাঘরে ব্যস্ত মুনিয়া বেগম। তার হাতে হাতে সাহায্য করে দিচ্ছে চিত্রা ও অহি। তুহিন ও মাহতাব ড্রয়িং রুমে বসে হরেক রকমের গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাহারকেও বেশ কয়েকবার আসতে বলার পর অবশেষে সে আসার জন্য রাজি হয়েছে। বাহিরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। অহির ফোনে টুংটাং ম্যাসেজের আনাগোনা।

নওশাদের ম্যাসেজ দেখে অহি আর রিপ্লাই দেয় নি। উদ্দেশ্য হাতের কাজ শেষ করে রিপ্লাই দিবে। এমনেতে সে বিকালে কথার ছলে বলেছিলো আজ এ বাসায় আসবো, তবুও নওশাদের অত জরুরি তলবের মানে খুঁজে পেলো না সে। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে বাহার যেই না চিত্রাদের বিল্ডিং এ প্রবেশ করতে নিবে, সেই মুহূর্তেই তার চোখে

পরলো ফর্সা, সুন্দর পরিচিত পুরুষ দেহের প্রতিচ্ছবি। বাহারের কপালে ভাঁজ পড়লো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“আপনি নওশাদ না?”

নওশাদ এতক্ষণ ভিজে একাকার। সামনের পুরুষটির মুখে হুট করে নিজের নাম শুনে সে বেশ চমকালো। থতমত খেয়ে বললো,

“হ্যাঁ, আমি নওশাদ। আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না?”

বাহার ফিচলে হাসলো। রহস্য করে বললো,

“চেনার কথাও না। তা এতরাতে এইখানে কী?”বাহারের প্রশ্নে কিছুটা হোঁচট খেলো নওশাদ। কি বলবে ভেবে না পেয়ে কতক্ষণ আমতা-আমতা করলো। অতঃপর কোনো উছিলা খুঁজে না পেয়ে বোকা বোকা কণ্ঠে বললো,

“অনেক বৃষ্টি তো, তাই এখানে দাঁড়িয়েছি।”

“বনানীতে বুঝি দাঁড়ানোর জায়গা নেই? সোজা ধানমন্ডি এসে পড়েছেন দাঁড়ানোর জন্য!”

নওশাদ অবাক হলেন। সামনের ছেলেটা যে তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তা আর বুঝতে বাকি রইলো না তার। মাথা এপাশ ওপাশ ঘুরাতে ঘুরাতে সে কথা খুঁজে

বেড়ালো। বাহারও ঠাঁই দাঁড়িয়ে দেখলো নওশাদের কান্ড। নওশাদকে এখানে দেখে যতটা বিস্মিত হওয়ার কথা ছিলো সে ততটা বিস্মিত হলো না কারণ এর আগে অহির সাথে প্রায় কয়েকবারই সে নওশাদকে দেখেছে। তাই হয়তো নওশাদের এখানে আসার কারণও আঁচ করতে পেরেছে। বাহারের বরাবরই ষষ্ঠীয় ইন্দ্র বেশ প্রখর। বাহার তাই

নওশাদকে স্বাভাবিক করার জন্য বললো,“অহির সাথে দেখা করবেন? তাহলে উপরেই চলুন।”

নওশাদ আবারও থতমত খেলো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“আপনি অহিকেও চিনেন?”

“চিনবো না? বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। আপনি ভীষণ ভাগ্যবান বলা চলে।”

বাহারের চেয়ে নওশাদও বোধহয় কিছুটা কম চতুর না। তাই তো সে কায়দা করে বলে ফেললো,

“আপনি তাহলে অমন ভাগ্য ফেরালেন কেনো?”এবারও যেন বাহার অবাক হলো না কারণ সে জানে, বাহারের প্রতি অহির যে মুগ্ধতা সে মুগ্ধতা অহি প্রকাশ না করে থাকতে পারবে না। আমরা যখন একটা মানুষকে ভালোবাসি,

তখন চাই মানুষটাকে আগলে রাখতে, গোপনে রাখতে। আর আমরা যখন একটা মানুষের উপর মুগ্ধ হই তখন চাই সেই মুগ্ধতা প্রকাশ্যে আনতে। ছড়িয়ে দিতে আরও একটা মানুষের সামনে। অহি দুটোই করেছে। ভালোও বেসেছে, মুগ্ধও হয়েছে। তাই সে সব জায়গায় মুগ্ধতা না ছড়ালেও কিছু কিছু জায়গায় ঠিক প্রকাশ করেছে।

নওশাদ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চুপ করে রইলো। অহির ভাষ্যমতে তার ভালোবাসার মানুষটা কিছুটা অগোছালো, এলোমেলো, গা ছাড়া স্বভাবের। মেপে হাসে, ঠাট্টাও করতে জানে আর সামনের পুরুষটির কাছে সেই সব গুণই বিদ্যমান। ঢিলটা যে খুব ভুল দিকে ছুঁড়ে নি, তা বুঝতে বাকি রইলো না নওশাদের।

তন্মধ্যেই বাহারের হা হা হাসি ভেসে এলো। হাসতে হাসতে সে বললো, “ভাগ্যের সাথে মানানসই না হলে যত ভালো জিনিসই আসুক, ভাগ্য তা গ্রহন করে না। যেমন অহি ম্যাচুয়ার্ড, সে আমাকে যতটুকু বুঝে ততটুকুও আমায় কেউ বুঝে নি। তাতে কি? ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় মনের শান্তি। অহি আমার চিন্তা ভাগ করতে পারলে

মানসিক শান্তির কারণ হতে পারবে না কখনো।”

নওশাদ যে খুব ভুল আন্দাজ করে নি তা বাহারের কথায় বুঝা গেলো। বাহারের কথার গম্ভীরতা বেশ ভালো লাগলো নওশাদের। তাই তো সে মুচকি হেসে উত্তর দিলো,

“সে জন্য আপনি ধন্যবাদ প্রাপ্য। ভাগ্যিস সে আপনার মানসিক শান্তি

হয় নি, তা হলে তো পরে আমাকেই অশান্তিতে কাটাতে হতো।”

বাহার আর নওশাদ সমস্বরে হেসে উঠলো।ভেজা শরীর নিয়ে চিত্রাদের ফ্লাটে প্রবেশ করলো বাহার। কিছু কুশলাদি বিনিময় করেই চলে গেলো তুহিনের জন্য বরাদ্দকৃত রুমে। বৃষ্টির পানিতে ভেজার পর একটু গোসল না করলে কেমন কেমন যেন লাগে। বাহার ঘরে যাওয়ার আগে

অহিকে একটু ইশারা করে তার সাথে যেতে। অহি অবশ্য এতে অবাক হয়। বাহার ভাই কখনো আকারে ইঙ্গিতে কথা বলার মানুষ না।

অহি গরে ঢুকতেই বাহার গলা পরিষ্কার করলো, ঠাট্টার স্বরে বললো, “তোমার জন্য কে যেন অপেক্ষা করছে নিচে।”

অহি অবাক হলো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“কে!”

“বনানী থেকে ধানমন্ডি আসার গল্প।”বাহারের হেয়ালি কথায় কপাল কুঁচকালো অহি। আর প্রশ্ন না করেই সে দ্রুত প্রস্থান করলো রুম থেকে। বাহারও নিজের পকেট থেকে টুকটাক জিনিসপত্র বের করে গোসল করতে চলে গেলো। এর

আগও এ বাড়িতে সে দু একবার গোসল করেছে, তাই তার টি-শার্ট এখানে আছেই।

দীর্ঘ পনেরো মিনিট পর প্রশান্তিকর গোসল দিয়ে বের হলো বাহার। চোখে-মুখে তৃপ্তি। কিন্তু বের হয়েই চিত্রার টলমলে চক্ষু যুগল দেখে সে থেমে গেলো। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলো,"কী হয়েছে?"

চিত্রা উত্তর দিলো না, তবে মাথা নিচু করে আগের জায়গায় ই দাঁড়িয়ে রইলো। বাহার এতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলো। কপাল কুঁচকে বললো,

“এখানে দাঁড়িয়ে কোন জামাই মরার শোকে কাঁদছো? কাঁদার জন্য কি বাহিরে জায়গার টান পড়েছে?”

বাহারের দিকে অভিমানীনি চোখ মেলে তাকালো চিত্রা। হাতের ভাঁজে

চেপে রাখা কাঁঠালী রাঙা খামটা মেলে ধরে তাচ্ছিল্য করে বললো,
“আপনি তবে আমায় ভালোবাসেন না, বাহার ভাই?”
চিত্রার হাতে নিজের অতিব মূল্যবান খামটা দেখেই সাথে সাথে ছিনিয়ে নিলো বাহার। ধমক দিয়ে বললো,
“কারো জিনিস জিজ্ঞেস না করে ধরেছো কেন?”“দুঃখীত বাহার ভাই।”

বাহার মাথায় তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সে জানে চিত্রা জেনে বুঝে ধরে নি, তবুও তার রাগ কমলো না।

চিত্রা কেবল এই অপরিচিত বাহার ভাইকে দেখলো। যার খামের মাঝে ছিলো ভালোবাসার বার্তাসহ চিঠি আর একটা নুপুর আর চোখে ক্রোধ।তুমুল বৃষ্টির ছাঁটে বিরক্ত অহি। আর কিছু অপ্রয়োজনীয় মিথ্যে

অজুহাতে বাহিরে এসে নওশাদের দেখা পাওয়ার পর হতভম্বও সে। লোকটার ফর্সা ফর্সা মুখ কেমন লাল হয়ে গিয়েছে! অনেকক্ষণ যাবত হয়তো ভিজছে! অহি দ্রুত গিয়ে নওশাদের মাথার উপর ছাতা ধরলো। বৃষ্টির অবাধ্যতায় কতখানি ভিজেও গেলো সে। বিরক্ত এবং অবাক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলো,

“আপনি এখানে কী করছেন!”

ঠান্ডায় নওশাদের নাক-মুখ বসে যাওয়ার উপক্রম। তবুও অনেক কষ্টে বললো,

“আপনাকে দেখতে এসেছি!”“আপনি আমাকে দেখতে বনানী থেকে ধানমন্ডি এসেছেন! বনানী থেকে ধানমন্ডির দূরত্ব জানেন তো?”

“আপনি বনানী থেকে ধানমন্ডির দূরত্ব দেখছেন অথচ আমার

ভালোবাসার গুরুত্ব দেখছেন না! এ কেমন অবিচার আপনার? দয়া করে নাহয় একটু দয়া করুন, আমায় নিয়ে ভাবুন, আমায় একটু নাহয় ভালোবাসুন।”

নওশাদের কণ্ঠে তুমুল আকুলতা। অহি বিরক্ত হলো। এমন পা* গলামো কিংবা বাচ্চামো তার কখনোই পছন্দ না। তবুও লোকটা এসব করছে!

অহিকে চুপ থাকতে দেখে কথা বললো নওশাদ। আকুতি করে বললো,

“আমার প্রতি কী আপনার একটুও মায়া হয় না?”

“না, হয়না।”

প্রশ্নের জবাবে অহির কাঠকাঠ উত্তর। নওশাদ তপ্ত শ্বাস ফেললো। ভারিক্কী গলায় বললো,

“তাহলে এখনি এখান থেকে যান। আমার ভালোবাসার প্রতি যার দয়া নেই, তার যেন আমার প্রতিও কোনো করুণা নাহয়।”নওশাদের কথার এই আকাশ-পাতাল পরিবর্তনে প্রায় থতমত খেয়ে গেলো অহি। স্তম্ভিত হয়ে বললো,

“কী করছেন? টিনএজারদের মতন আচরণ করবেন না।”

“ভালোবাসার আচরণের আবার পার্থক্য আছে নাকি? ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি গম্ভীর কিংবা টিনএজারও হতে রাজি।”

“আমার এসব পছন্দ না কিন্তু।”

“তাহলে চলুন, বিয়ে করি?”

নওশাদের হঠাৎ এমন প্রস্তাবে অহি কিংকর্তব্যবিমুঢ়। কথা বলার ভাষা খুঁজে পেলো না। কেমন হতভম্ব

চোখে তাকিয়ে রইলো! অদ্ভুত কণ্ঠে বললো,

“কী!”

“চলুন না, বিয়ে করে ফেলি।”অহি গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইলো। এই মুহূর্তে নওশাদ ফাজলামো করছে বলে তো মনে হয় না কিন্তু কথাটা যে সত্যি সত্যি বলছে তাও বিশ্বাস হচ্ছে না। বনানী থেকে এই রাতে ছুটে এসেছে কি কেবল এই

কথাটা বলার জন্য? এত পা* গলাটে চিন্তা! অহি তপ্ত শ্বাস ফেললো, শীতল কণ্ঠে বললো,

“যেখান থেকে আসছেন, সেখানে ফিরে যান। এসব করে আমার মনে বিরক্তের সৃষ্টি করছেন, তাছাড়া আর কিছুই না।”

“কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন! যেখান থেকে এসেছি

সেখানে ফিরে যেতে হলেও আমার আপনাকে চাই।”

“আমাকে চান? কেনো চাইবেন? ভালো লাগে বলে?”

“না, ভালোবাসি বলে।”নওশাদের সহজ স্বাভাবিক উত্তরে অহির তেজের ভাঁটা পড়লো। হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবে বললো,

“আচ্ছা মানলাম ভালোবাসেন বলে। তা, ভালোবাসলেই কি পেতে হবে

এমন কোনো কথা আছে? ইতিহাসে এমন কতই তো হয়েছে যে তুমুল ভালোবাসার পরও একজন আরেকজনকে পায় নি। তাহলে আপনারই কেন পেতে হবে?”

“ইতিহাসে বিচ্ছেদ ছিলো বলে আমিও অপ্রাপ্তি রাখবো তা ভাবছেন কেনো? বার বার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে তারও কোনো মানে নেই। ইতিহাস যারা রটেছে

তারাও মানুষ। তারা নাহয় রটেছে অপ্রাপ্তির ইতিহাস, আমরা নাহয় রটবো প্রাপ্তিরটা।”

“আমায় পেয়ে কি আর এমন হবে বলুন? আমাকে এখন হয়তো ভালো লাগছে কিন্তু একসাথে সংসার করার পর আর নাও ভালো লাগতে পারে।”

“আপনাকে পেলে তেমন কিছুই হবে না। কেবল পাওয়া না পাওয়ার এই

পৃথিবীতে, আপনাকে পেয়ে গেলে আমার সব পাওয়া হয়ে যাবে।”এমন একটা অনুভূতি মাখানো কথা শোনার পর আর কথা খুঁজে পেলো না অহি। বিরক্ত দেখাতে গিয়ে দেখলো কি আশ্চর্য! তার বিরক্ত লাগছে না। তবুও সে মিছে বিরক্তের ভাব ধরলো। নাক-মুখ ফুলিয়ে চলে গেলো নিজের বিল্ডিং এ। নওশাদ পেছন থেকে চিল্লিয়ে বললো,

“আপনি বিয়ের জন্য রাজি না হলে আজই আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার জান দিয়ে দিবো।”

অহি গোপন হাসলে। মুখ ভেংচি দিয়ে বললো,

“বৃষ্টিতে ভিজলে কেউ ম* রে না। ভিজতে থাকুন।”

“বৃষ্টিতে না ম* রলেও আপনার ঐ হাসিতে ঠিকই ম* রেছি।”

অহি আর পিছু ফিরলো না। চলে গেলো নিজের ফ্লাটে। নওশাদের কথাটা সে নেহাৎই হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো। ভাবলো নওশাদ হয়তো মজা করেই বলেছে। কিন্তু অপরদিকে নওশাদ নাছোড়বান্দা তা যে জানা নেই রমণীর।মন খারাপের আকাশে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো অভিমানেরাও। চিত্রা বাহারের তীক্ষ্ণ কথা হজম করে চুপ করে ছিলো।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাকে চুপ করিয়েছে বাহারের আনা অন্য কারো জন্য নূপুর আর চিঠি। চিঠিটা পড়তে পারে নি তবে যতটুকুই দেখেছে মুগ্ধতা ভরা ছিলো। কারো জন্য খুব যত্নে লিখেছিলো চিঠিটা। বাহার চিত্রাকে ছাড়াও অন্যকারো কথা চিন্তা করছে ভাবলেই অষ্টাদশীর বক্ষ মাঝে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়। প্রিয় মানুষের ক্ষেত্রে আমি একটু

বেশিই স্বার্থপর হই। সব ভাগ করা মানুষটাও প্রিয় মানুষের ভাগ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু বাহার ভাইকে তা জানিয়ে লাভ নাই। মানুষটা তো এমনই, অনুভূতি বুঝলেও প্রকাশ্যে তার মূল্য দেই নি কভু। অথচ সেই বাহার ভাইয়ের জন্যই অষ্টাদশীর এত হাহাকার! ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর ড্রয়িং রুমে ছোটোখাটো একটা আড্ডার

আসর বসলো। কিন্তু চিত্রার মন বসলো না সেই আসরে। সে কাজের নাম দিয়ে উঠে চলে গেলো। তখনও প্রকৃতিতে ভরা বর্ষণ। বারান্দার ছোটো ছোটো শিকের জানালা গলিয়ে হাত ভিজাতে পারছে না বলে চিত্রার মন আরও খারাপ হলো। কেবল দেখেই যেতে হলো নিবিড়ে সেই বর্ষণ ধারা।

তন্মধ্যেই চিত্রা নিজের পেছনে কারো উপস্থিতি অনুভব করলো। মানুষটাকে দেখার আগেই মানুষটার গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এলো,

“ভালোবাসা যখন মানসিক শান্তি নাহয়ে মাথা ব্যাথার কারণ হয়, তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় সে ভালোবাসার মানুষটি ভুল।”

চিত্রা কণ্ঠের মালিককে চিনলো কিন্তু এ মানুষ এমন কথা বলতে পারে

ভেবেই তার অবাক লাগলো। অবাক কণ্ঠে বললো,“দুলাভাই, আপনি!”
চিত্রার বিস্মিত মুখ দেখে হাসলো মাহতাব। পকেটে হাত গুঁজে হেলতে দুলতে চিত্রার সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোটো একটা শ্বাস ফেলে বললো,
“ভালোবাসার মানুষ ভুল হলে ভালোবাসা ফুল নাহয়ে কাঁটা হয়ে রবে কিন্তু শালীকা।”

চিত্রা কথা বললো না। দুলাভাই কিছু বুঝতে পারলো কিনা ভেবেই তার বুক কাঁপলো। ক্ষীণ স্বরে বললো,

“কী বলছেন এসব?”

“তোমাদের বয়সই এমন যে এটা বলতে হচ্ছে। শোনো, কোনো সম্পর্ক যদি তোমায় ব্যাথা দেয়, তিল তিল করে মা* রে তবে তুমি বরং সে সম্পর্কটাই মে* রে ফেলো। মনে রেখো, ভুল কারণে নিজে মরার

চেয়ে, ভুল কারণটার মৃত্যু হওয়া ভালো।”

চিত্রা কি বুঝলো কে জানে, কেবল অনবরত মাথা নাড়ালো। চিত্রাকে খুশি করতে হাস্যোজ্জ্বল মাহাতাব বলে উঠলো,

“চলে আজ রাতের রাস্তা ঘুরবো, বৃষ্টিতে ভিজে আইসক্রিম খাবো। যাবে?”

চিত্রা কতক্ষণ ভেবে রাজি হয়ে গেলো। এতক্ষণের মন খারাপ টা তার হুট করেই ভালো হয়ে গেলো। তখন প্রায় মধ্যরাত। চিত্রাদের ফ্লাটে কেবল অহি আর মুনিয়া বেগম রয়েছে। চিত্রা, চেরি, মাহতাব, তুহিন তো কিছুক্ষণ আগেই বের হয়েছে রাতের রাস্তা ঘুরার জন্য। বাহার ভাইও তার পরপর বেরিয়ে গিয়েছে।

অহি, মুনিয়া বেগম নিজেদের মতন ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত তিনটে, হুট করে সশব্দে বেজে উঠলো অহির ফোন। কড়া ঘুমটা হঠাৎই হালকা হয়ে এলো ফোনের শব্দে। অহি বিরক্ত হলো, চোখ-মুখ কুঁচকে ফোনটা রিসিভ করতেই অপর পাশ থেকে বাহার ভাইয়ের কণ্ঠ ভেসে এলো,

“আমায় ভালোবাসো অহি?”

অহির ঘুমিয়ে থাকা মস্তিষ্কে হুট করে এমন কথাটা কেমন ভোঁতা ভোঁতা অনুভূতির সৃষ্টি করলো। ঘুমিয়ে থাকা মস্তিষ্ক জেগে উঠলো সেকেন্ডের মাঝেই, অহি চুপ থেকে রয়েসয়ে উত্তর দিলো,

“ভালোবাসতাম, এখন ভালোবাসা ছেড়ে দিয়েছি।”

উত্তর টা শুনে ফোনের অপর পাশের বাহার ভাই কি একটু হাসলো! হ্যাঁ হয়তো হাসলো। ক্ষীণ হেসে বললো, “এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত। আরেকটা উত্তম সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলো তো ঝটফট।”

অহি ভ্রু কুঁচকালো, প্রশ্নাত্মক কণ্ঠে বললো,“কী?”

“তোমাদের বাড়ির নিচে যে ছেলেটা বৃষ্টিতে ভিজেছে এই মাঝ রাত্তি

অব্দি, তার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফেলো। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি অনবরত ছুটে চলা ঘড়ির কাটা, আমার মতন বেকার বাহারের জন্য থেমে থাকা তোমার মানায় না। আমরা তো বেকার মানুষ। আমরা হলাম অযত্নের কংক্রিট।

মানুষ ভাবে পাথর মন, দিলাম নাহয় একটু ভেঙে,

ক্রেংকিটের আড়ালেও হৃদয় নরম,মানুষ কি আর তা জানে?
একটা মৃত্যুর স্বাদ পেতে, বেকার মরে রোজ,,
তাই তো সমাজ নিয়ম করে আমাদের স্বপ্ন করছে ভোজ।
ফ্যানের সাথে কি যেন ঝু* লে, ডাকে মোরে মুক্তি হেথায়,
বাঁচবার সাধ বেকারেরও আছে, সে কথা কি সমাজে বিকায়?

যোগ্যতার সার্টিফিকেট তাচ্ছিল্যে ভাসে, অযোগ্যদের কাছে,
একটা চাকরি না পেলে, বেকারদের প্রেমও মিছে।তোমাদের অবশ্য সে পিছুটান নেই, প্রেম মিছে হওয়ার ভয় নেই। মধ্যরাতে তোমার দোরে ভালোবাসা চাওয়া মানুষটাকে আজ নাহয় একটা কিছু বলেই দেও। মুক্তি নাহয় প্রেমের মৃ* ত্যু।”

অহি চুপ করে বাহার ভাইয়ের কথা শুনলো। অপর পাশ থেকে কল টা কাটতেই সে ওরনা টা জড়িয়ে সাবধানে ফ্লাটের দরজা আটকে নিচে নেমে গেলো। তখনও বৃষ্টি পড়ছে বিরতিহীন ভাবে।

বিল্ডিং ছেড়ে রাস্তায় নামতেই জুবুথুবু নওশাদকে চোখে পড়লো অহির। বেচারা শীতে কাঁপছে। অহি বেশ

শক্তপোক্ত মুখ নিয়ে এগিয়ে গেলো নওশাদের কাছে। শক্ত কণ্ঠে বললো, “আপনি না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছেন? এসব করে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?”

“আমায় বিয়ে করে নিলেই তো পারেন। বাঁচিয়ে নিন না আমায়।”

অহির মুখে তুমুল কাঠিন্যতা। কর্কশ কণ্ঠে বললো,

“আমার জন্য যে ছেলেটা মধ্যরাত অব্দি এমন পা* গলামো করতে পারে তাকে ফেরানোর সাধ্যি আমার নেই। এত রাতে কাজী অফিস খোলা থাকবে তো?”

নওশাদ ভেবেছিল এবারও বরাবরের মতন প্রত্যাখ্যান আসবে কিন্তু অহির কথায় সে হতভম্ব। নওশাদের হতভম্ব ভাব দেখে অহি ঠাট্টা করে বললো,

“বিয়ে কি করবেন না শহীদ হওয়ার ইচ্ছে এখনও আছে?”তুমুল বর্ষণ মাথায় নিয়ে, অনাকাঙ্খিত ভাবে হয়ে গেলো নওশাদ আর অহির বিয়ে। বেশ সাদামাটা এবং অপ্রত্যাশিত ছিলো মধ্যরাতের সেই বিয়েটা। আর সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হলো, বাহার ভাই ছিল সে বিয়ের প্রধান সাক্ষী। নওশাদ যে এত দ্রুত সব ব্যবস্থা করতে পারবে তা অহির

ধারণার বাহিরে ছিল কিন্তু তবুও সে নড়বড়ে অনুভূতি নিয়ে শক্ত করে সেই মানুষটার হাত ধরেছিল। যা হবে দেখা যাবে তার ভিতরে উপস্থিত। আর সবটা সম্পূর্ণ হওয়ার বড় ভূমিকা বাহার ভাইয়ের।

অহি কাজী অফিসে বাহার ভাইকে সব প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেসও করেছিল "বাহার ভাই, আপনি সিউর কীভাবে ছিলেন

যে বিয়েটা আমি করতামই?”বাহার তখন মুচকি হেসে বলেছিল,”মানুষ বরাবরই ভালোবাসার কাঙালি। যখন কেউ সেই ভালোবাসা উজাড় করে দেয় তখন খুব কম সংখ্যক মানুষই তা ফেরাতে পারে। ঘৃণা দেখেও চুপ থাকা যায় কিন্তু ভালোবাসা দেখলে তার বিপরীতে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। আর আমি তোমাকে প্রথমে কেনো জিজ্ঞেস করেছিলাম আমায়

ভালোবাসো কিনা বলো তো? আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ ভাঙার চেষ্টা করেছি যেন তুমি খুঁটি শক্ত করে ধরো। আর আমি সক্ষম।”

বাহারের কথায় চুপ রইলো অহি। ভালোবাসবে না করেও আরো একবার ভালোবাসলো বাহারকে। এ-ই শেষ। এরপর আর মানুষটাকে ভালোবাসা হবে না। আর মুগ্ধ হওয়া হবে না মানুষটার উপর। মনে

একজন রেখে আরেকজনের সাথে ঘর করা যে পাপ। আর অহি সে পাপ কখনো করবে না। মনের মানুষকে নাহয় মন থেকে চিরতরে বিতারিত করবে।

এরপরেই খুব নীরব ভাবে হয়ে গেলো একপাক্ষিক ভালোবাসার বিচ্ছেদ, এবং আরেকটা একপাক্ষিক ভালোবাসার সন্ধি। প্রকৃতির নিয়মই এটা, কোথাও ভাঙবে সে আবার

কোথাও জোড়া লাগবে।সওদাগর বাড়িতে মুখ থমথমে ভাব। সেই বাড়ির সকল সদস্য চিত্রা, তুহিনও সহ আজ সে বাড়িতে এসেছে। নওশাদের বাবা-মাও এসেছে। বাড়ির সবচেয়ে ঠান্ডা মেয়ে এমন একটা কাজ করতে পারে তা যেন কারো বিশ্বাস হচ্ছে না। সবাই কেবল বিস্মিত নয়নে তাদের দেখে যাচ্ছে ঘন্টাখানেক যাবত।

প্রথম কথাটা আফজাল সওদাগরই বললেন। গম্ভীর কণ্ঠে সে অহির দিকে তাকিয়ে শুধালেন,

“তোমার যদি নওশাদকে এতই পছন্দ হয়েছে, আমাদের বললেই তো পারতে। আমরা তোমার পছন্দ কখনো অপূর্ণ রাখি নি।”

বড়চাচাকে বাড়ির বাচ্চারা বরাবরই বেশ পছন্দ করে। তাই এ মানুষটার

কথার বিপরীতে অহি কোমল হয়েই বললো,

“আমার পছন্দের সব তোমরা পূরণ করেছো তা আমিও মানি। তাই বলে আমার ভালোবাসার সব পূরণ করবে তা তো না। সেই সংশয় থেকেই এমন কাজ করা।”

অহির উত্তরে আফজাল সওদাগর তপ্ত শ্বাস ফেললেন। কিন্তু পরের কথাটা উচ্চারণ করলেন অবনী

বেগম। কাঠ কাঠ কণ্ঠে বললেন,“তোমার ভালোবাসাও আমরা অপূর্ণ রাখতাম না।”

“ও তাই নাকি? সাইকোলজি পড়তে চেয়েছিলাম যেটা আমার ভালোবাসা ছিলো, তোমরা ভর্তি করিয়ে ছিলে বাংলায়। ছয়-সাত বছরের আমি আবদার করে ছিলাম তোমাদের সাথে থাকার, ঠাঁই হয়েছিল আমার

হোস্টেলে। এভাবেই পূরণ করতে তাই না?”

মেয়ের তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে মাথা নত হয়ে আসে অবনী বেগমের। মেয়েকে সে যখন হোস্টেলে দেয় তখনও তার কাছে জীবনের মানে ভিন্ন ছিল। আজকের অবনীর আর তখনের অবনীর পার্থক্য অনেক। কিন্তু মানুষ তা আর জানলো

কই?“অহি, তোমার মায়ের সাথে এভাবে কথা বলছো কেন?”

নুরুল সওদাগরের গম্ভীর কণ্ঠে অহির তাচ্ছিল্য ভাব আর বিস্তৃতি লাভ করলো। খুব করে মানুষটাকেও দুটো কথা শুনাতে ইচ্ছে হলো কিন্তু সে শুনালো না। যতই হোক, নওশাদ এবং তার বাবা-মা সওদাগর বাড়ির মেহমান। তাদের সামনে এমন আচরণ শোভনীয় না।

নওশাদের বাবা-মা এতক্ষণ চুপই ছিলো। সওদাগর বাড়ির কথা কাটাকাটি থামার অপেক্ষায় ছিলেন হয়তো তারা। তাই তো সওদাগর বাড়ির মানুষদের কথা থামতেই মুখ খুললেন নওশাদের মা নওরিন। তুমুল আশ্চর্যের সাথে সে প্রশ্ন করলেন,

“নওশাদ, তুমি হুট করে এমন সিদ্ধান্ত কেনো নিলে?”

“হুট করে তো নেই নি, মা। তোমাদের তো জানিয়ে ছিলাম কিন্তু তোমরাই আমাকে কোনো পজিটিভ উত্তর দিতে পারো নি। তাই বাধ্য হলাম।”“কেবল একবার জানিয়ে ছিলে। মানুষ দিনের পর দিন অপেক্ষা করে বাবা-মাকে মানায়। অধচ ইতিহাসে তুমিই একমাত্র ছেলে যে একবার মাত্র কথা

কাটাকাটি করে বিয়ে করে ফেলছো। কী অদ্ভুত!”

“বিয়েই তো করবো মা, কোনো অপরাধ তো না। তো এত মানামানির কথা আসছে কোথা থেকে? আমি কিংবা অহি, দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক। তাই তোমাদের এমন অদ্ভুত আচরণ শোভা পাচ্ছে না।”

“দেখলে দেখলে, তোমার ছেলের কথা শুনলে? মায়ের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে?”

নওরিন খাতুনের স্বামীর প্রতি অভিযোগ। ইলিয়াস খান মিনমিনে কণ্ঠে বললো,

“যা হয়েছে তা কি বদলাতে পারবে? এরচেয়ে মেনেই নেও।”

স্বামীর জবাবে হতাশ নওরিন। তিনি ভেবেছেন তার স্বামী হয়তো তার

পক্ষ থেকে একটু হলেও কিছু বলবে। তা আর হলো কই! হতাশার শ্বাস ফেলে তিনি বললেন,“এমন হুটহাট বিয়ে আমি মেনে নিতে পারছি না।”

“এখন করণীয়! আলাদা থাকবো?”

ছেলের ঝটপট উত্তরে ব্যাথিত দৃষ্টি নিয়ে তাকান নওরিন খাতুন। দশমাস দশদিন যে ছেলেকে গর্ভে ধারণ করলো, ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার

পর এত গুলো বছর যে মা বুকে আগলে রাখলো, একটা মেয়ের জন্য সে মায়ের মুখের উপর এমন প্রশ্ন হয়তো একটা সন্তানই করতে পারে। কি আর করার? যুগ বদলের খেলায় এসব হয়তো স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে কিছুটা রাগ এই মেয়েটার উপরও বর্তাচ্ছে। কিছুটা সময় মৌণ থেকে নওরিন খাতুন তপ্ত শ্বাস ফেলে বললেন,“আমার কখনোই

পছন্দ ছিলো না অহি। কিন্তু আমার ছেলের আবার ওকেই পছন্দ। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার পছন্দ অপছন্দে কিছু আটকাবে না। আমি না চাইলেও আমার ছেলে ওর সাথে সংসার করবে আমি জানি। আমার ছেলের হয়তো মায়ের প্রয়োজন নেই অথচ আমার কিন্তু ছেলের প্রয়োজন আছে। একান্তই আমার সেই স্বার্থে আমি বিয়েটা মেনে নিচ্ছি। তবে

আমাদের বা আপনাদের পরিবারের একটা মান সম্মান আছে। সেই মান সম্মানের ভিত্তিতে আমি চাচ্ছি বিয়েটা আবার বড় করে দিতে।”মায়ের কথায় নওশাদের মুখটা ছোটো হয়ে এলো। মা যে তার কষ্ট পেয়েছে তাও বুঝতে পারলো সে কিন্তু এমন জেদ না দেখালে হয়তো পরিস্থিতি ঘুরে যেতো। তাই এমন কঠিন হওয়া।

নওরিন খাতুনের স্পষ্ট কথার ধাঁচ অহির বেশ ভালো লাগলো। মানুষটা হয়তো উপর উপর শক্ত কিন্তু ভেতর ভেতর খুব কোমল। নওরিন খাতুনের প্রস্তাবে রাজি হলেন আফজাল সওদাগর। মহিলজ যে বেশ বুদ্ধিমতী তা আর বুঝতে বাকি রইলো না কারো।

বিয়ের তারিখ ঠিক করা হলো পঁচিশ দিন পরে। অহির মায়ের মতামতও

নেওয়া হলো। বাড়িতে পরে গেলো আনন্দের ঢেউ। সব কিছুতে নিরেপক্ষ ভূমিকা পালন করলো রোজা সওদাগর এবং চাঁদনী। না আনন্দ হলেন না অন্য কিছু। ড্রয়িং রুমে উপস্থিত থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়ায় তারা কেবল তা পালন করলো। এছাড়া কিছুই না। চিত্রা আর চেরি তো আনন্দে আত্মহারা কিন্তু চিত্রা চাইলেও সে আনন্দ

দেখাতে পারছে না। এ বাড়িটা যে তাকে পর করেছে। পরের বাড়িতে শোক মানায় আনন্দ না।অনেকদিন পর নিজের বাড়িতে পা রেখে সংশয়ে কাঁপছে চিত্রা। যে বাড়িতে একসময় বিনা বাঁধায় ছুটে বেড়িয়েছে, সে বাড়ির দেয়াল ছুঁতেও যেন আজ করছে ভয়। কেমন পর পর লাগছে সবটা!

বাড়ির সকলে যখন মিষ্টি ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত চিত্রা এক ফাঁকে চলে গেলো চাঁদনী আপার কাছে। ছোটো থেকে এ অব্দি আপা তাকে কম আদর করে নি। আজ যদি আপা মুখ ফিরিয়ে থাকে তবে চিত্রার দায়িত্ব আপার কাছে ক্ষমা চাওয়া। যেমন ভাবনা তেমন কাজ।

চাঁদনী নিজের ঘরের কিছু জামাকাপড় গুছচ্ছিল। তন্মধ্যেই ঘরে

দরজায় টোকার শব্দ, ক্ষীণ শব্দে চিত্রা বললো,

“আসবো?”

চাঁদনী একবার পলক ঝাপটিয়ে চিত্রার দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে মনযোগ দিয়ে বললো,“আয়।”

চিত্রা আসলো। ছোটো ছোটো পা ফেলে ঘরে থাকা চেয়ারটাতে বসলো। বুকে তখন তার তুমুল ঝড়। এত কাছের বড় আপার সাথে

কথা বলতেই হাত-পা তার কাঁপছে। তবুও সে বললো,

“কেমন আছে, আপা?”

“যেমন চেয়েছিলি।”

বড় আপার কাঠ কাঠ উত্তরে মনে মনে হোঁচট খেলো চিত্রা। কণ্ঠধ্বনি বার বার জড়িয়ে এলো তবুও সে ক্ষীণ স্বরে বললো,

“আমি তো ভালোই চেয়েছিলাম আপা।”

“তাহলে আর কি, ভালোই আছি।” চিত্রা আর কথা আগানোর শক্তি পেলো না। কত কথা সাজিয়ে এসেছিলো কিন্তু এখন সব অগোছালো হয়ে গেছে। ঘরে দু’জন মানবী চুপ হয়ে রইলো। কত কথা বলতে চেয়েও বলা হলো না। শেষমেশ চিত্রা মনের লুকিয়ে রাখা প্রশ্নটা করেই বসলো,“আপা,

দুলাভাইয়ের সাথে তোমার সব ঠিক আছে তো?”

চাঁদনীর হাত থেমে গেলো সাথে সাথে। কিন্তু উত্তরটা সাথে সাথে এলো না। এলো দুই তিন মিনিট পর। হৃদয় ছাড় খার করা উত্তর সেটা। চাঁদনী আপা অসহায় কণ্ঠে বললো,

“আমার মায়ের রাগ আমার উপর না মিটালেও পারতি।”

“আমি তোমায় ইচ্ছে করে কষ্ট দিতে চাই নি বড়আপা।”

চিত্রার মাথা নত হয়ে এলো। বড় আপা তাচ্ছিল্য করে বললো,“এত জোরে ধাক্কা কী মানুষ অনিচ্ছাকৃত দেয়? আমার তো জানা ছিলো না।”

বড় আপার কথায় চিত্রার চক্ষুদ্বয় বড় বড় হয়ে গেলো। অবাক কণ্ঠে বললো,

“আমি তো ধাক্কা দেই নি তোমায়, কেবল হাত ঝারা দিয়ে ছিলাম।”

“থাক সেসব কথা। আমি তবুও দোয়া করি, তুই যেন তোর স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থাকিস।”

বড় আপার দোয়ার আড়ালে কী গোপন অভিশাপের ছোঁয়া ছিলো! চিত্রার মনে কেমন খচখচ করলো বড় আপার কথা। সে তো আপাকে ধাক্কা দেয় নি, তাহলে!

তন্মধ্যেই নিচ থেকে হৈচৈ ভেসে এলো। নুরুল সওদাগরের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তুমুল ভাবে। চিত্রা এবং চাঁদনী অপেক্ষা না করেই ছুট লাগালো।বাহার ভাইয়ের ঘর ফাঁকা। তার অবহেলার বিছানা শূণ্য। পড়ার টেবিলে যত্নের বই গুলোও নেই। বাহার ভাইয়ের অস্তিত্ব চিলেকোঠার ঘরের কোথাও নেই। মূলত নুরুল সওদাগরের চেঁচামেচির কারণ এটা।

চিত্রা কেবল ফ্যালফ্যাল করে শূণ্য ঘরটায় তাকিয়ে রইলো। শূণ্য ঘরটার রঙ মেটে হওয়া দেয়ালে বড় বড় করে লিখা,

“স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার যার প্রতি অনীহা, মানুষ কীভাবে তাকে করবে দয়া!”

অবশেষে, অবশেষে বাহার ভাই নামক মানুষটা মায়া লাগিয়ে চলে গেলো! অবশেষে বাহার ভাই মানুষটা সত্যিই কঠিন হলো।

অষ্টাদশী মানতে পারবে এই অনাকাঙ্খিত বিচ্ছেদ?বাহার ভাই বিহীন আজ তিন তিনটে দিন কেটে গেলো। কেমন নীল বিষাদ সমুদ্রে কূল কিনারা বিহীন দিন গুলো। সকাল, দুপুর,রাত নিজেদের মতন মুগ্ধতা ছড়াতে যেন ব্যর্থ হলো তিনটে দিনে। চিত্রার মনে যেই গভীর অমাবস্যা নেমেছে, সেই অমাবস্যার আঁধার ছাপিয়ে সূর্য

উঠতে পারে নি। রাত গুলো কেমন ডুকরে কেঁদে উঠে হাহাকার করে অভিযোগ করে যায় অনাকাঙ্খিত বিচ্ছেদের। চিত্রা কেবল ফ্যালফ্যাল করে দেখে সেই আর্তনাদ। এরচেয়ে বেশি কিছুই যে তার করার নেই। তন্মধ্যেই কলেজ থেকে আবারও মডেল টেস্টের তারিখ ধার্য করা হলো। খুব শীগ্রই পরীক্ষা। চিত্রা বিষাদ তুললো বন্দী খানায়। চেয়ার

টেনে মুখ ডুবালো বইয়ের পাতায়, কিন্তু কী অদ্ভুত! বইয়ের লিখা কেমন ঝাপসা! চোখের জল গুলোও কী বাহার ভাইয়ের মতন বে*ঈমা*নী করছে? অশ্রু তার অথচ ঝরছে বাহার ভাইয়ের নামে। এমন শোক বিধাতা কেনো আমাদের দেয়?তীর্যক রোদের তপ্ত দুপুর। জানালা গলিয়ে রোদ এসে পড়ছে চিত্রার পড়ার টেবিলে। ঘরের ফ্যান বন্ধ, কারেন্ট

নেই। চিত্রা ছাড়া পুরো ফ্লাটে আর কোনো জনমানসের চিহ্ন নেই। মা নিজের কলেজ গিয়েছে, ভাইজানও গিয়েছে ভার্সিটি। পুরো ফ্লাটে চিত্রা একা। শোক পালনের মহোৎসব তাই ঝেঁকে ধরেছে তাকে। চিত্রা খুব চেষ্টা করলো পৃথিবীর সকল ধ্যান সে বইয়ের উপর দিতে। বারংবার তার চেষ্টা বিফলে গেলো। হাজার চেষ্টা করেও সে ধ্যান দিতে পারলো না

বইয়ের পাতায়। কী বিরক্তিকর ব্যাপার স্যাপার! চিত্রা সশব্দে চেয়ার টা পিছে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। না চাইতেও বার বার বাহার ভাইয়ের সেই এলোমেলো চুলের ঢেউ গুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা কী জাদু করলো?ঘেমে-নেয়ে একাকার চিত্রার শরীর। সেই ঘর্মাক্ত মুখখানা নিয়েই সে বারান্দায় দাঁড়ালো। আশেপাশের রাস্তা বেশ নীরব। মাঝে মাঝে

রিকশার টুং টাং শব্দ ভেসে আসে এরপর আবার নিশ্চুপ হয়ে যায়। নিশ্চুপ রাস্তার দিকে নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে রইলো চিত্রা মিনিট পাঁচ। চোখের সামনে ভেসে উঠলো চিলেকোঠার ঘরটা। বাহার ভাইয়ের গিটারের মোহনীয় সেই টুং টাং সুর। ঠোঁটের ভাঁজে রাখা সিগারেটের ধোঁয়া উড়ানোর দৃশ্য। চোখের বেকারত্বের হাহাকার। বাহার ভাই টা

যে বড্ড একা তা এই এক বছরে বেশ ভালো করেই জানা হয়ে গেছে চিত্রার। সেই একা মানুষটাই কিনা চিত্রাকে একা করে দিয়ে গেল! চিত্রার মনে জেগেছে আরও একটা সংশয়।বাহার ভাই কেনো অহি আপার বিয়ের পরই চলে গেলেন? তবে কী বাহার ভাইয়ের মনের মনিকোঠায় অহি আপা যত্নে লুকানো ছিলো? নিজের ভাবনায় নিজেই

কেঁপে উঠলো। না, না, বাহার ভাইয়ের মনে অন্য কারো ঠাঁই আছে ভাবলেই কেনো যেন বুক মোচড় দিয়ে উঠে, কেমন ব্যাথা ব্যাথা লাগে। অহি আপার মনে যে বাহার ভাই আছেন, সেটা কী চিত্রা জানতো না? অবশ্যই জানতো। কিন্তু জেনেও সে না জানার ভাব ধরে ছিলো কেবল নিজের স্বার্থে। বাহার ভাই যে কেবল তার। কিন্তু সে ভুল, বাহার

ভাইরা হয়তো কারো হয়না। বাহার ভাইদের ভালোবেসে প্রতিটা নারী অহি হয়ে রয়ে যায়। বাহার ভাইরা বিশাল জীবনের অপ্রাপ্তি হিসেবেই হয়তো সদা থেকে যায়। চিত্রার এই আঠারো বছরের জীবনে, পর পর এত অপ্রাপ্তি কখনো মেলে নি। খুব সুন্দর, হাসি হাসিই তো কেটেছে গত হওয়া বসন্ত গুলো। তবে এবার কেন বসন্ত কেবল চৈত্রমাসের খরা

হয়ে রইলো? এবার কেনো বসন্ত এত বিবর্ণ।ভাবনার মাঝেই কলিংবেলের কৃত্রিম শব্দে ভাবনার রাজ্যে ভাঁটা পড়লো। চিত্রা বিষন্ন দেহটাকে টেনে দরজা অব্দি নিয়ে গেলো। কিন্তু দরজা খুলে সে অবাক। আশেপাশে কেউ নেই, তবে কলিংবেল বাজালো কে! বিরক্ত হয়ে যখন চিত্রা দরজা আটকাতে নিবে তখনই দরজার সামনে ইট দিয়ে

চাপা দিয়ে রাখা কাগজ চোখে পড়লো। চিত্রা ক্ষানিকটা কৌতূহল বশত কাগজটা কুড়িয়ে নিলো, আশপাশে বেশ ভালো করে চোখ বুলিয়েই দরজা টা আটকে দিলো। হাতের কাগজটা নিয়ে এসে আরাম করে বসলো নিজের খাটে। কাগজটা মূলত কেবল কাগজ না। চিঠিও বলা যায়।কাগজটা মেলে ধরতেই অসম্ভব মুগ্ধতা ভরা লিখা জ্বলজ্বল করে

উঠলো। চিঠির শুরুতেই ‘প্রিয় রঙ্গণা’ শব্দটা দেখে সে বিমূঢ় হয়ে গেলো। দুই তিনবার চিঠির সম্বোধন করা শব্দটায় চোখ বুলালো। তার বাহার ভাই এসেছিল! এ চিঠি কী তবে বাহার ভাই দিয়ে গেলো? চিত্রা চিঠি হাতে নিয়েই আবার বারান্দার দিকে ছুটে গেলো বাহার ভাইয়ের দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু চিত্রার এমন আশা পূরণ হলো না। হাজার ছটফট

করা মন নিয়ে, আকাঙ্খা নিয়েও সে দেখতে পেলো না বাহার ভাইকে। মন খারাপ হলো তার। তুমুল মন খারাপ নিয়েই সে চিঠিটা পড়া শুরু করলো,প্রিয় রঙ্গণা,

আমি জানি, চিঠির শুরুর সম্বোধনী টা দেখেই তুমি তুমুল আগ্রহে আমায় খুঁজে বেড়াবে। এই মুহূর্তে তুমি তাই করছো, তাই না? তুমি এত বো* কা কেন গো? যখন আমার অনুভূতিই

তোমার হাতের মুঠে তখন আমার উপস্থিতি দিয়ে কী আসে যায়! তুমি অনুভব করলেই দেখতে তোমার হাতের মুঠোয় ঐ চিঠির ভাঁজে আমি আছি। অথচ তুমি তো তত চালাক না, চালাক হলে কী আর আমার অত কাঠখড় পোড়াতে হতো! তুমি নাকি পড়াশোনা শিকেয় তুলে মন খারাপের উৎসবে মেতেছো? এমন হেলাফেলা করলে বাহার ভাইয়ের

রিকশার খরচ দিবে কীভাবে? বাহার ভাইয়ের তো ভাগ্যে চাকরি নেই, এখন যদি রঙ্গণাও কিছু করতে না পারে তবে আমাদের সংসার হবে কী করে? বুঝলে রঙ্গণা, তুমি বড্ড বো* কা, তাই তো সংসার করার জন্য খুঁজে খুঁজে একমাত্র বাহার ভাইকেই পেলে। জেনেশুনে কেউ নিজের পায়ে কুড়াল মারে বলো তো? আমায় চেয়ে বড্ড ভুল করলে

রঙ্গণা। আমায় চাইলে কেবল দুঃখের উৎসব পাবে, আমায় পাবে না। তুমি কী বিশ্বাস করো তোমার বাহার ভাই কোনো খারাপ কাজ করতে পারে? আমি জানি, তুমি তোমার বাহার ভাইকে এতটাই বিশ্বাস করো যে কখনোই তাকে ভুল বুঝবে না। কিন্তু খুব শীগ্রই হয়তো তোমার সেই বিশ্বাসের আয়না চূর্ণবিচূর্ণ হতে চলছে। তোমার চূর্ণবিচূর্ণ বিশ্বাসের

ভাঙন আমি দেখতে পারবো না যে। তোমার হয়তো অনেক মানুষ আছে, আমার কেবল তুমিই আছো। তোমার জন্যই হয়তো আমি চাকরির সন্ধান করে ছিলাম। একটা ছোটো সংসারের সাধ করেছিলাম। সময় ও পরিস্থিতির কাছে আজ সব অসহায়। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত অব্দি আমি চাই তুমি আমায় বিশ্বাস করো। তোমার চোখে অবিশ্বাস আমায় যে বেঁচে

থাকার পরও মেরে ফেলবে। খুব শীগ্রই আমাদের দেখা হবে রঙ্গণা। আমাদের সংসারও হবে। আমরা এ শহর ছেড়ে খুব দূরে চলে যাবো। যাবে তো?

ইতি

বাহার ভাই।”চিঠিটা হাতের ভাঁজে রেখে চুপ করে রইলো চিত্রা। বাহার ভাইয়ের চিঠির মাঝে কেমন ধ্বংসের আভাস! খুব খারাপ কিছু

হওয়ার সম্ভাবনা। চিত্রার বুক কাঁপলো। বাহার ভাই কি তবে কোনো গোলকধাঁধায় আটকে গেলো! এধার ওধার হাতড়েও চিত্রা উত্তর পেলো না নিজের প্রশ্নের। তবে সে বাহার ভাইয়ের সাথে সংসার করবে, যে-কোনো মূল্যে। যেহেতু সংসার করার জন্য অনেকদূর যেতে হবে সেহেতু আগে নাহয় মহিনের মৃত্যুর রহস্য টা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।

বেশখানিকটা প্রমাণ তো সে পেয়ে গেছেই। এখন কেবল মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা। তারপর চিত্রা আর বাহার নাহয় শহর ছাড়বে। চিত্রা জানে, বাহার ভাইদের কোনো কলঙ্ক হয় না।রাত তখন এগারোটা। বাহারের চিঠিটা চিত্রা সারাদিনে বোধহয় শ'খানেক বার পড়ে ফেলেছে। এখনও পড়ছিল, তন্মধ্যেই কলিংবেলের শব্দে তার মনযোগে

বিঘ্ন ঘটে। বুকের মাঝে আরও একবার ছলাৎ করে উঠে। আবারও দুপুরের মতন অনাকাঙ্খিত চিঠি আসতে পেরে ভেবেই সে ছুটে গেলো মেইন দরজার সামনে। মুনিয়া বেগম রাতের রান্না করছিলেন, দরজার শব্দ শুনে সেও হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এলো দরজার দিকে। চিত্রা মাকে দেখে নিজেকে সংযত করে ধীর গতিতে দরজা খুলতেই

হতভম্ব চোখে সামনের মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুনিয়া বেগমের চোখেও ভরা বিস্ময়। অবাক কণ্ঠে বললো,“তুমি এখানে যে! আকাশের চাঁদ মাটিতে কেন?”

শেষের কথাটায় তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া। দরজার ওপাশে দাঁড়ানো নুরুল সওদাগর তেমন পাত্তা দিলো না বোধহয় সে তাচ্ছিল্যে। বরং বেশ কঠিন স্বরে চিত্রাকে শুধালো,

“ঐ ল* ম্পট ছেলেটা কোথায়?”

চিত্রা ভ্রু কুঁচকালো, অবুঝ কণ্ঠে বললো,

“জি?”

“তোমাদের পছন্দের ঐ ভবঘুরে নে* শাখোর ছেলেটা কোথায়?”

চিত্রা এবার বোধহয় বুঝলো বাবা কার কথা বলছে। বোঝার সাথে সাথেই তার চোখ মুখে বিরক্ত ছড়িয়ে পড়লো। রাগী কণ্ঠে সে তার

বাবাকে বললো,“উনার একটা নাম আছে, আব্বা। ভদ্র ভাবে বলতে পারলে বলুন নাহয় কথাই বলবেন না।”

নুরুল সওদাগর তাজ্জব বনে গেলেন। এতদিন তার মেয়ের চোখ-মুখে যে সম্মান দেখেছিল নিজের জন্য, আজ আর সেটা দেখতে পেলো না। লেবু অতিরিক্ত চিপলে সেটা

তিতা হয়ে যায়। চিত্রাই তার বহিঃপ্রকাশ।

নুরুল সওদাগর তবুও দমে গেলেন না, কঠোর হয়ে বললেন,

“তোমার বাহার ভাইকে পেলে অবশ্যই আমাকে কল দিবে। কারণ ওরে আমাদের পুরো পুলিশ টিম খুঁজছে।”

মুনিয়া বেগম অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললো,“ওরে খুঁজছে কেন তোমার

পুলিশ টিম? মানুষের ভালো তোমাদের কী সহ্য হয় না?”

নুরুল সওদাগর উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। মুখ বাঁকিয়ে বললো,

“ভালো! কার ভালোর কথা বলছো? ঐ খু* নিটার? জানো সে কী করেছে? তার দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধ* র্ষণ করে খু* ন করেছে। তোমাদের আদরের বাহার। সে জন্যই তো পালিয়েছে বাসা থেকে।”

চিত্রা হতভম্ব চোখে বাবার পানে তাকালো। অনবরত তার পা কাঁপছে। বাহার ভাই অমন করেছে! পুরো শহর জুড়ে ছেপে গিয়েছে বাহার ভাইয়ের নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি। যে যেখানেই তাকে দেখবে সাথে সাথে যেন খোঁজ দেয় ভার্সিটির নেতা সাহেব কিংবা পুলিশকে। কৃতজ্ঞতায় বিরাট পাবলিক ভার্সিটির একজন ক্ষমতাশালী নেতা। পোস্টার গুলো

তাহলে সেই নেতাই ছাপিয়েছে। মানবতা আজকাল বেঁচে আছে কিনা, তাই তো নেতারাসহ একজন খু* নিকে খোঁজার জন্য সাহায্য করছে আইনজীবীদের।কোচিং থেকে ফেরার সময় বড় বড় পোস্টার গুলোতে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যায় চিত্রা। রাস্তাটা খালি পেলেই ছুঁয়ে দেয় পোস্টারের মাঝে থাকা বাহার ভাইয়ের সাদা-কালো

মুখমন্ডলকে। কেবল পুরো শহর না, পুরো পৃথিবীও যদি বাহার ভাইয়ের বিপরীতে চলে যায় তবুও বাহার ভাইয়ের পক্ষে কেবল একজন মানুষ থাকবে, সে হলো চিত্রা। পুরো দুনিয়া তার কাছে মিথ্যে, কারণ সে জানে, তার বাহার ভাই একমাত্র সত্য। তন্মধ্যেই চিত্রার কাছে থাকা তার স্মার্ট ফোন খানা সশব্দে বেজে

উঠলো। চিত্রা রয়েসয়ে কল তুলতেই অহির চিন্তিত কণ্ঠ ভেসে এলো,

“কই তুই? সবাইকে বললি একত্রিত করতে, এখন দেখি তোরই খবর নেই!”

চিত্রা ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো,“এইতো রাস্তায়, আসছি।”

চিত্রার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পরও অহি ফোনটা কাটলো না। তখনও ফোনে হুড়মুড় করে বাড়ছে

সেকেন্ডের হিসাব। চিত্রাও কাটলো না ফোন। কারণ সে জানে, অহি আপা কিছু বলার জন্য সময় নিচ্ছে। সেও চুপ থেকে সময় দিলো। সেকেন্ডের কাটা পেরিয়ে যখন মিনিটে গেলো, তখন অহি ধীর কণ্ঠে বললো,

“তুইও কী বিশ্বাস করিস, বাহার ভাই এমন কাজ করেছে?”

“রাতের আকাশে কখনো সূর্য উঠে, আপা?”

চিত্রার অদ্ভুত প্রশ্নে হয়তো থতমত খেলো অহি। তাইতো বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,“কী বলছিস?”

“উত্তর দেও আগে। রাতের আকাশে কখনো সূর্য উঠে?”

“না।”

“কেনো উঠে না?”

এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চিত্রার এহন কথায় বিরক্ত হলো অহি। অধৈর্য কণ্ঠে বললো,

“এটা অসম্ভব, তাই উঠে না।”

“তেমনই অসম্ভব আমার বাহার ভাইয়ের নামে ছড়ানো কলঙ্কের সেই কাজটা।”

চিত্রার উত্তরে হয়তো তাজ্জব বনে গেলো অহি। এই মেয়েটাও যে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এমন জবাব দিবে তা

যেন তার ধারণার বাহিরে ছিল। তবে মনে মনে বেশ খুশি হলো সে। প্রশান্তি মাখানো কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো,

“কেবল এই মনোভাব টা নিজের মাঝে রাখবি, তবেই হবে।”“তুমি রেখেছো তা, আপা? তুমিও নিশ্চয় এমন বিশ্বাস পুষে রেখেছো তাই না?”

চিত্রার প্রশ্নে আবারও হোঁচট খেলো অহি। আমতা-আমতা করে বললো, “বাহার ভাই বিশ্বাসযোগ্য মানুষই। তাই এটা ভাবাও স্বাভাবিক।”

“বাহার ভাই তো ভালোবাসার যোগ্য মানুষও, তবে ভালোবাসলে না কেন?”

চিত্রার প্রশ্নে কেঁপে উঠলো অহি। মেয়েটা আজ কথায় জব্দ করার খেলায় নেমেছে। কী সুন্দর সহজ,

সরল ভাবে কঠিণ একটা প্রশ্ন করে ফেললো! কিন্তু অহিও কম বুদ্ধিমতী না, তার উপর সাইকোলজির ছাত্রী। চিত্রার যে মতিগতি চলছে বর্তমানে, তা বুঝতে খুব একটা বাকি রইলো না তার। তবে সে চিত্রার মনমতন উত্তর দিলো না, বরং ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললো,“সবাই যোগ্যতার মূল্য দিতে পারে না। তাই হয়তো বাহার ভাই

ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হয়েও ভালোবাসা পায় নি।”

চিত্রা হাসলো। অহি আপা যে খুব চালাক তা সে ভালো করেই জানে, তবুও আরেকটু বুদ্ধির পরীক্ষা করে নিলো। সে জানতো, অহি আপা কখনো ভালোবাসা স্বীকার করবে না। যা পায় নি, যা পাবে না, তা পাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করাও এক ধরণের বোকামি। আর অহি

আপা বোকামি খুব কমই করেন। সওদাগর বাড়ির ড্রয়িং রুমে গভীর নিস্তব্ধতা। আজ বাড়ির মধ্যমণি হলো চিত্রা। এই মেয়েটার চোখে-মুখে আজ কেমন উপচে পড়া রহস্য। কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। সোফায় যার যার মতন অবস্থানরত আছে সওদাগর বাড়ির সদস্যরা। রোজা সওদাগরের মুখ আগের মতনই ভার ভার। চিত্রা

সোফার খালি জায়গাটাতে এসে বসলো। তুহিন, মাহতাবও আছেন এখানে উপস্থিত। চিত্রার এমন রহস্যময় নিশ্চুপতায় বিরক্ত হলেন নুরুল সওদাগর। তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

“কী সমস্যা তোমার? আমাদের সময়ের কী কোনো দাম নেই তোমার কাছে? হেয়ালি করছো কেন?”

চিত্রা বাবার কথাকে তেমন পাত্তা না দিয়ে সোফায় আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসলো, তারপর অদ্ভুত কণ্ঠে বললো,

“আব্বু, আপনি কখনো আমায় ভালোবাসেন নি কেন?”

এমন সময়ে চিত্রার এমন প্রশ্নের জন্য সবাই হয়তো প্রস্তুত ছিলো না। নুরুল সওদাগরও ক্ষাণিক থতমত খেয়ে গেলো। বি* স্ফোরিত নয়নে

তাকিয়ে রইলো মেয়ের পানে। সে হয়তো বুঝার চেষ্টা করছে তার মেয়ে কী বলতে চাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে সক্ষম হলো না কেউ। সবারই হতভম্ব অবস্থা দেখে ক্ষীণ হাসলো চিত্রা, কেমন গুমোট পরিস্থিতি তৈরি করে বললো,“জানেন আব্বু, আমিই হয়তো একমাত্র মেয়ে যে আব্বুর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে জান কোরবানি দিয়ে দিতাম। কিন্তু

আপনি তো ভীষণ শক্ত পাথর। আমার জানও আপনার দম্ভের কাছে খুবই তুচ্ছ। আমাকে অপছন্দের কারণ কী কেবল মাত্রই আমার জন্ম পরিচয়?”

“চিত্রা!”

মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়, ডাকের মাঝে ধমক। চিত্রা তাকালো মায়ের দিকে, মুচকি হেসে বললো,“আজ আমি নাহয় একটু বলি, আম্মু? জানো

আম্মু, আব্বু আমায় একটুও ভালোবাসে নি। আমার কত খারাপ লাগতো, কত কান্না করতাম, কত আল্লাহের দরবারে দোয়া করতাম, কেবল আব্বু যেন আমায় একটু ভালোবাসে, কিন্তু আব্বু আমায় ভালোবাসে নি, আম্মু। আল্লাহ্ এর পর যদি কাউকে সিজদাহ্ দিতে বলতো তাহলে সেই সিজদাহ্ টা আমি আব্বুকে দিতাম। অথচ সেই

আব্বুই কি-না আমায় ভালোবাসলো না? আমার এক জীবনে এমন বিশাল আফসোস পুষে বাঁচতে হবে ভাবিই নি। তুমি আমায় তো কত সুন্দর জীবন দিলে আম্মু, একটু আব্বুর ভালোবাসা তো দিলে না?”

মুনিয়া বেগম টলমলে অশ্রু নিয়ে মেয়ের পানে তাকিয়ে আছেন, চোখে মুখে তার অবিশ্বাসের ছাপ। চিত্রা চঞ্চল হলেও কখনো আবদার,

অভিযোগ, অভিমান কিংবা বায়না করে নি মায়ের কাছে। কিন্তু আজ যখন সবকিছুই মায়ের পায়ের কাছে ঢেলে দিলো, তখন মায়েরই বা কী বলার থাকতে পারে!নুরুল সওদাগরের কথা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আজ যেন নতুন চিত্রাকে দেখছে সে। মেয়েটার এমন পরিবর্তন ভাবিয়ে তুললো সবাইকে।

বা’চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুকণাকে ভীষণ অবহেলায় মুছে ফেললো চিত্রা। তাচ্ছিল্য করে বললো,

“আজ এমন কথা কেনো বলছি সেটাই ভাবছো তাই না? কারণ আছে দেখেই বলছি। যখন বা’হাতটা ঝলসে গেলো, হসপিটালের বিছানায় বেঁচে থাকার যু* দ্ধে আমি অনবরত ছুটে যাচ্ছি তখন আপনি আব্বু

আমার ছায়া নাহয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন অবিশ্বাসের তীর। আমি সেদিন কতটা ব্যাথা পেয়েছি তা আপনাকে বুঝাতে পারবো না, আব্বু। সেদিনেই ঠিক করেছিলাম, আপনার অবিশ্বাসের তীর আমি ভেঙে দিবো। আর আজই সেই দিন।”

চিত্রার শেষ কথায় অবাক হলো সবাই। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলো না

কথাটির সারাংশ। ঘেমে-নেয়ে একাকার মাহতাব। শার্টের বাহুতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কেমন বোকা বোকা কণ্ঠে বললো,“কী বলছো এসব!”

মাহতাবের অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলো চিত্রা সেকেন্ডে মাঝে বার বার তার পরিবর্তন ভাবিয়ে তুলছে সবাইকে। অনাকাঙ্খিত ঝরের আভাসও যে

পাচ্ছে সবাই। অহি অধৈর্য কণ্ঠে বললো,

“কী বলছিস তুই?”

“তোমরা জানতে চাও না আমাদের এই ঝলসানোর কারণ কে?”

“কে আবার? মহিন?”

চিত্রার প্রশ্নে অহির সহজ-সরল উত্তর। চিত্রা হাসলো, ডানে-বামে মাথা নাড়িয়ে বললো,

“ভুল উত্তর।”

এতক্ষণে ড্রয়িংরুমে অবস্থানরত প্রত্যেকের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অবাক প্রত্যেকটা মানুষ। চিত্রার কথার অর্থ যেন বুজছে না কেউ। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো এবার তুহিনের। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো,

“তবে কে করেছে তোদের সাথে এমন?”চিত্রা হেলতে দুলতে মাহতাবের কাছে এসে বসলো। ফিচলে কণ্ঠে বললো,

“কী দুলাভাই, আপনি বলবেন না আমি বলবো?”

মাহতাবের অবস্থা তখন বেহাল। মুখের মাঝে কৃত্রিম হাসি আঁকার মিছে চেষ্টাও করলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো,

“কি, কিসব বলছো শালীকা? আমি জানবো কীভাবে?”

“জানবেন না কেন? আপনি নিজে করলেন সেই কাজ অথচ বলছেন অন্য কথা, ইট’স নট ফেয়ার।”

বড়সড় একটা বি* স্ফোরণ হয়ে গেলো ড্রয়িংরুমে। সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠে বললো,

“কী?”চিত্রার চোখ-মুখে এতক্ষণের ঠাট্টার জায়গায় ছড়িয়ে গেলো কাঠিন্যতা। দৃঢ় কণ্ঠে মাহতাবের দিকে তাকিয়ে বললো,

“আপনি আমাদের সাথে এমনটা কেনো করেছেন, দুলাভাই!”

মাহতাব ততক্ষণে ঘেমে-নেয়ে একাকার। উপস্থিত মানুষ গুলোও প্রতিক্রিয়া দেখাতে ভুলে গেলো। একবার মাহতাব, আরেকবার চিত্রার দিকে তাকালো তারা। তন্মধ্যেই চাঁদনী সোফা ছেড়ে ধপ করে উঠে এলো। মুখ-চোখ তার লাল। রাগে দিশেহারা হয়ে সে চিত্রার গালে চ*

ড় বসানোর জন্য হাত তুলতেই তার হাত ধরে থামিয়ে দেয় চিত্রা। মুখে আগের ন্যায় হাসি বজায় রেখে বলে, “আরে আপা থামো। এত তাড়াতাড়ি চ* ড়টা ওয়েস্ট করো না। বলা তো যায় না, অন্য কারোরও প্রয়োজন হতে পারে।”

চাঁদনী ফুঁসে উঠলো। ধমক দিয়ে বললো,“তুই কেমন মেয়ে রে, চিত্রা? তোকে এত আদর করেছি আমি,

অথচ তুই কিনা আমার মায়ের আচরণের রাগ আমার আর আমার স্বামীর উপর উঠাচ্ছিস এসব মিথ্যে বলে? এই তোর আচরণ?”

চিত্রার হাসি হাসি মুখ থমথমে হলো। শক্ত কণ্ঠে বললো,

“তোমার মায়ের প্রতি বা তোমার প্রতি আমার কোনো রাগ নেই। একটা সময় এই বাড়ির নুন খেয়েছি, তাই এর গুণ গাইতেই

হবে। আমি যা বলছি তা এক বিন্দুও মিথ্যে না। আগে শুনবে তারপর যা বলার বলবে।”

চিত্রার মুখে চিলিক দেওয়া আত্মবিশ্বাস দেখে চাঁদনীর তরতাজা, টগবগে রাগটা মিইয়ে এলো। ধীর কণ্ঠে বললো,

“আচ্ছা বল, কী বলবি?”চিত্রা ছোটো শ্বাস ফেলে। মাহতাবের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য হাসি দেয়,

অতঃপর নিজের বড় চাচা আফজাল সওদাগরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে,

“চাচা, তুমি কী রফিক মোহাম্মদ নামে কাউকে চেনো?”

আফজাল সওদাগর কপাল কুঁচকালেন, কতক্ষণ মনে করার চেষ্টা করলেন এমন নামে কাউকে চেনেন কি-না। অতঃপর ব্যর্থ হয়ে হতাশ স্বরে বললেন,

“না আম্মু, মনে পড়ছে না।”“আমি মনে করাচ্ছি। আজ থেকে বিশ কিংবা একুশ বছর আগে তোমার কোম্পানিতে একজন শ্রমিককে চু* রির দায়ে ফাঁসানো হয়। তা নিয়ে অনেক গন্ডগোল চলে কয়েকদিন, অতঃপর সেই ভদ্রলোক তার গায়ে লাগানো তকমা সইতে না পেরে আ* ত্মহ* ত্যা করে। মনে পড়লো এবার?”

আফজাল সওদাগরের কুঁচকানো ভ্রু সোজা হয়। ঘটনা মনে পড়তেই সে অনবরত মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন,

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সে অনেক আগের কাহিনী। বেচারা নির্দোষ ছিলো কিন্তু ভুল তথ্যের কারণে তাকে হেনস্তা পোহাতে হয় এবং সে এটা মানতে না পেরে আ* ত্মহ* ত্যা

করে। কিন্তু এটার সাথে ওটার কী সম্পর্ক?”

“সম্পর্ক আছে, চাচা। সেই রফিক মোহাম্মদের ছেলেই মাহতাব দুলাভাই।”আফজাল সওদাগর হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো,

“কী? পা* গল হলে নাকি? মাহতাবের বাবা মা* রা গেছে তিন

বছর আগে। তুমি কী বলছো এসব?”

“আমি মোটেও ভুল বলছি না, চাচা। দুলাভাই ই সে লোকের ছেলে। আর তিন বছর আগে যে লোকটা মারা যায় তিনি কেবল আর কেবল মাত্র মহিনের বাবা।”

চিত্রার রহস্য নামা গোলকধাঁধায় ফেঁসে সবাই হতভম্ব। অহি হতভম্ব কণ্ঠে বললো,

“মানে!”

“মানে হলো, লতা আন্টি, মানে মাহতাব দুলাভাইয়ের মা, রফিক আঙ্কেল মা* রা যাওয়ার পর আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সেই ঘরের সন্তানই হলো মহিন। তাই না আন্টি?”

শেষের প্রশ্নটা লতা বেগমের দিকে তাকিয়ে করলো চিত্রা। মহিলা রীতিমতো তাজ্জব বনে রইলেন।

প্রশ্নটা করলেই উপর-নীচ মাথা নাড়িয়ে ক্ষীণ স্বরে বললো,“হ্যাঁ।”

উপস্থিত সবার মাঝে অবিশ্বাস্যকর পরিস্থিতি। একজন আরেকজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এমন কিছুও যে থাকতে পারে তা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। চাঁদনী আপা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো মাহতাবের দিকে। বিবশ কণ্ঠে বললো,

“তারপর বল চিত্রা।”

চিত্রাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুরু করলো,“খুব সম্ভবত রফিক আঙ্কেল মারা যাওয়ার সময় দুলাভাই এর বয়স ছয়-সাত ছিলো। তার বাবার এমন মৃ* ত্যু মানতে পারে নি সে। মনের মাঝে পুষিয়ে রেখে ছিলেন ভীষণ ক্ষোভ। উপর উপর সে যতটা ভালো মানুষ ছিলেন, ভেতর ভেতর তার প্রতিহিংসা তাকে এর চেয়ে

বেশিই অন্ধ করে দিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ বড়ো হওয়ার পর সেই প্রতিহিংসাপরায়ণের জন্য সে বিয়ে করেছে চাঁদনী আপাকে। চেয়েছিল এ বাড়ির ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে সবাইকে নিঃশেষ করে দিতে। তাই না দুলাভাই?”

মাহতাব জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো ড্রয়িংরুমের মেঝেতে। সবার নিস্তব্ধতা ঠেলে

চিত্রাই আবার বলে উঠলো,“দুলাভাই সম্ভবত তার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে এবং সে ঘরের সন্তান মহিনকেও মানতে পারে নি কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির কারণে সে বলতে পারে নি সেটা। তাই তো সবার প্রতি ক্ষোভ মিটানোর সুযোগ পেলো আপার সাত মাসের সেই অনুষ্ঠানে। চেরির ভাষ্যমতে চেরির শরীরে হাত দিয়েছিল মহিন যা পরবর্তীতে অহি

আপা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিল তোমাদের সাথে। আমরাও ঘৃণা করেছি মহিনকে। চেরির কথাকেই সত্যতা ধরেছি আর তার কারণও আছে। কিন্তু পরপর আমাদের উপর এ* সিড নিক্ষেপ এবং মহিনের মৃ* ত্যু সব ধোঁয়াশা করে রেখে দিল। অতঃপর সেদিন বড় আপার সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া আমার কলঙ্কের কালি হলো। কিন্তু এখানে এত

মানুষকে বিভিন্ন ঘটনা সাপেক্ষে দোষী মনে হলেও দোষ গুলো করেছে একজন, সে হলো মাহতাব। প্রথমে আসি চেরির ঘটনায়। চেরিকে আঁধার ঘরে ডেকে নিয়ে মহিন বিশ্রী কাজ করেছে আমরা জানতাম এবং মেনেও ছিলাম কিন্তু সেদিন চেরির সাথে দুষ্টুমি করার ছলে জিজ্ঞেস করতেই চেরি বললো সে মহিনের মুখ দেখে নি পাঞ্জাবি

দেখেছিল। সেই অনুষ্ঠানে দুলাভাই এবং মহিন একই পাঞ্জাবি পড়ে ছিলো, তাই দোষটা দু’জনের একজনই করতে পারে। সন্দেহের তালিকায় পড়ে গেল দু’জনের নাম। অতঃপর কিছুদিন আগে কোচিং থেকে আসার সময় আমি মাহতাব দুলাভাইকে দেখি পতি* তালয়ের একটা গলিতে যেতে। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিলো না, কিন্তু আমি নিজে সাথে

সাথে তার পিছে গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিয়েছি।সব ঘটনা গুলো কেমন আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। আব্বু বলেছিল মহিন মা* রা যাওয়ার আগে আমার ফোন দিয়ে তার সাথে কেউ কথা বলেছে। আমি চট করে রেকর্ডিং লিস্টে ঢুকে যাই আর সৌভাগ্যক্রমে সেদিনের রেকর্ডিং পেয়ে যাই যেখানে কণ্ঠ একজন ছিলো মহিন

আর একজন ছিল দুলাভাই। তারা কী নিয়ে যেন তুমুল কথা কাটাকাটি করছে। স্পষ্ট ভাবে বুঝার পর বুঝলাম মহিন প্রচুর ভয় পেয়ে ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের এ* সিডের ঘটনা সম্পূর্ণ রূপে তার ঘাড়ে গিয়ে পরবে তাই সে দুলাভাইকে হুমকি দিচ্ছিল সব বলে দিবে। আর দুলাভাই আমার ফোন দিয়ে কল দিয়েছিল হয়তো ধরা না

পড়ার জন্য। হয়তো সে মহিনের হুমকি তে ভয় পেয়েই খু* ন করেছে নিজের ভাইকে। কেবল তাই ই না, দুলাভাই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তার নারী দোষ আছে। পতি* তালয়ে তার প্রায়ই আসা-যাওয়া।”ড্রয়িং রুম জুড়ে নিস্তব্ধতা। সকলের চোখে অবিশ্বাস্যতা। স্বয়ং লতা বেগম তার ছেলের দিকে সেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে

রইলেন। কণ্ঠ ধ্বনির মাঝেই আটকে রইলো শব্দরা। বহু কষ্টে সে উচ্চারণ করলো,

“এসব মিথ্যে, তাই না আব্বা?”

মাহতাব আগের ন্যায় মাথা নিচু করেই রইলো। সবাই মাহতাবের উত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে রইলো। এই বুঝি মাহতাব বলবে সব মিথ্যে। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,“সবই সত্যি।

একটা শব্দও মিথ্যে না। আমাকে যা ভাবেন সবাই তা আমার ভালো মানুষির আদল কেবল, আমি ভালো মানুষ নই। আর চিত্রাদের এ* সিড নিক্ষেপ করার কাজটাও আমি করিয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল চেরি আর অহিকে ঝলসানোর, চিত্রাকে না। আর মহিনকেও খু* ন করেছি অনিচ্ছাকৃত। আমি ওকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ও

বুঝে নি। আমি নিজের রাগ সংবরন করতে না পেরে মে* রে ফেলি। এ* সিড নিক্ষেপ করা ঐ দুই ছেলেকেও আমিই মে* রেছি যেন ওরা আমার বিপদ আনতে না পারে। চেরির সাথেও ওটা আমি করেছি।”

শেষ কথাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সশব্দে চ* ড় পড়ে মাহতাবের গালে। চ* ড়টা মেরেছে চাঁদনী। রাগে তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে,

হাত-পা কাঁপছে। এক দলা থু থু মাহতাবের উপরে ফেলে ঘৃণা ছুঁড়ে বললো,“পি* চাশ।”

চিত্রা চাঁদনীকে শক্ত করে ধরলো। কম্পিত কণ্ঠে বললো,

“আপনিই সেদিন চাঁদনী আপাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন তাই না? আমি হাতটা কেবল ধীরে ঝারা দিয়ে ছিলাম। কিন্তু আপা বললো আমি নাকি ধাক্কা

দিয়েছি। তখন উপরে আমি আর আপনি ছিলাম, আমি যেহেতু করি নি তার মানে,,, ”

চিত্রার বাকি কথা বলতে হয় না। মাহতাবই গম্ভীর কণ্ঠে বলে,

“আমিই করেছি সে কাজটা। আর এই যে এত দ্রুত সবটা স্বীকার করে নিলাম কেন জানো? কারণ এতশত বাহানার মাঝেও আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি।”

আবারও চ* ড় পড়লো মাহতাবের গালে। এবার চ* ড়টা দিলেন আফজাল সওদাগর। রাগে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। তুমুল এক ধাক্কা দিয়ে বললো,“তোর সাহস কী করে হলো আমার মেয়েদের দিকে তাকানোর? তোর চোখ উঠিয়ে ফেলবো।”

মাহতাব কথা বললো না। ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলো। আরও কয়েক ঘাঁ প্রহার হলো। হৈচৈ ভরে গেলো

সওদাগর বাড়ি। পুলিশ কল দেওয়া হলো। লতা বেগম জ্ঞান হারালেন। চাঁদনী কথার বলার শক্তি না পেয়ে ধপ করে বসে পড়লো। তুমুল বিশৃঙ্খলা পড়লো বাড়ি জুড়ে। চিত্রা সেই বিশৃঙ্খলা ঠেলে বেরিয়ে গেলো রাস্তায়। রাত এগারোটার ব্যস্ত শহরে একা পায়ে হাঁটা শুরু করলো। অনেকটা পথ যাওয়ার পর পুলিশের একটা গাড়ি তার পাশ দিয়ে চলে

গেলো সওদাগর বাড়ির দিকে। চিত্রা তাচ্ছিল্য হাসলো ক্ষাণিক। গতপরশু রাতে সে মাহতাব দুলাভাইদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল পাইপ বেয়ে। ভীতু চিত্রা হুট করেই কেমন সাহসী হয়ে গেলো।তৃপ্তি ভরে সে দেখে নিলো শহরের রাজপথ। আর তো থাকা হবে না এই শহরে। সে আর বাহার ভাইতো অনেকদূর চলে যাবে সংসার করতে। কালই তারা

শহর ছাড়বে। বাহার ভাই আরেকটা চিঠি পাঠিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। সেখানে গেলেই দু’জনের দেখা হবে, তারপর চিরতরে বাহার ভাই চিত্রার। খুব দূরে চলে যাবে তারা। কিন্তু বাহার ভাই বেছে বেছে কবরস্থানের ঠিকানায় কেন দিলো! ধূসর রঙের মেঘেদের আনাগোনা আকাশ জুড়ে। প্রকৃতির ভীষণ মন খারাপ আজ। কিন্তু চিত্রার মনে

উৎফুল্লতার জোয়ার। কী একটা প্রাপ্তির আনন্দ যেন তার পুরো শহর জুড়ে। অথচ কোথাও মন ভালোর ছিটেফোঁটা কারণও নেই। সওদাগর বাড়ির মানুষেরা ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের মাঝে প্রতিটা মানুষের নিজস্ব হা°হা° কার। অহি আপার বিয়ের ডেট টাও বেশ পেছানো হয়েছে। মন খারাপের বেলা গুলো, ভীষণ পানসে আঁকা। চিত্রা ঘুম

থেকে উঠেই বেশ সময় নিয়ে গোসল সেড়েছে। বেছে বেছে বর্তমান প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে ধূসর রঙের জামা বের করেছে।সাদা সেলোয়ার, ওড়নার সাথে মিলেই কেমন বিষন্ন বিষন্ন রঙে সাজিয়ে নিলো নিজেকে। তার মা চলে গিয়েছে কলেজ, ভাইজানও বাসায় নেই। এটাই মোক্ষম সময় বাহার ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়ার। ছোটো

করে একটা চিরকুটও লিখলো সে। পড়ার টেবিলের উপর কালমদানি টা দিয়ে চাপা দিয়ে যত্ন সহকারে রেখে দিলো চিরকুট টা। সে হারিয়ে গেলে আম্মু, ভাইজান যে পা° গ°ল হয়ে যাবে। তাই তাদের সেই সময়টায় শান্তনার বাণী হিসেবে রেখে গেলো চিরকুট টা। চিত্রা জানে, সে যাওয়ার পর মা এবং ভাইজান আবার নিজ গৃহে ফিরে যাবে। আর কতদিন

গৃহান্তরে থাকবে?আর যার জন্য গৃহান্তর, সেই যদি না থাকে তবে সে গৃহান্তরের আর কীই-বা মূল্য রইলো! পুরো ঘরের কোণায় কোণায় একবার হাত বুলিয়ে দিলো সে। সব ক'টা জিনিস চোখ ভরে দেখে নিলো। এরপর আর দেখতে যদি না পায়? কবে না কবে আবার আপন মানুষের ভীড়ে ফিরে আসবে কে জানে? আদৌও ফিরে আসবে কিনা?

পৃথিবীতে কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ করতেই হয়। যেমন বাহার ভাইকে পাওয়ার জন্য চিত্রা ছাড়ছে তার পরিবার। কীই বা করার? লোকটার যে সে ছাড়া কেউ নেই। তপ্ত এক শ্বাস ছেড়ে পা রাখলো সে ফ্লাটের বাহিরে। গন্তব্য তার অজানা, তাতে ক্ষতি কী? পথসঙ্গী তো তার চেনা।লোকাল বাসের ডান সাইডের তিন নাম্বার সারির জানালার পাশে

সিট টাতে বসে আছে চিত্রা। জ্যামে ঠাসা রাস্তা। হুড়মুড় করে বাসের ভেতর একজন মহিলা প্রবেশ করেই চিত্রার সাথের ফাঁকা সিটটায় বসে পড়লো সে। চিত্রা একপলক মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো জানালার বাহিরে। কিন্তু হুট করেই তার মস্তিষ্কে মহিলাটির মুখের অবয়ব ভেসে উঠলো। কেমন পরিচিত মুখ! চিত্রা

আবার ঘাড় ঘুরালো, মহিলাটার দিকে তাকালো। বড্ড পরিচিত লাগলো মহিলাটাকে। অথচ সে এর আগে দেখে নি মানুষটাকে।

চিত্রার পাশে বসা মহিলাটা চিত্রাকে এমন তাকিয়ে থাকতে দেখে ভ্রু কুঁচকালো, মিষ্টি হেসে বললো,“কী গো মেয়ে? ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?”

চিত্রা বেশ থতমত খেয়ে গেলো। আমতা-আমতা করে বললো,

“না, না আন্টি, আসলে আপনাকে বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে।”

“তাই নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে না এর আগে তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে?”

“না আন্টি, দেখা হয় নি। হয়তো মনের ভুল।”

চিত্রার উত্তরে কোমল হাসলেন মহিলা। কিন্তু এবার মহিলাও চিত্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রার মুখ-চোখ জুড়ে কী যেন খুঁজে বেড়ালেন। অতঃপর কণ্ঠ ধীর করে জিজ্ঞেস করলো,

“তোমার নাম কী?”

চিত্রা বেশ দোটানায় পড়লো। নাম বলবে কী বলবে না করেও অবশেষে নাম বললো,

“তোফা সওদাগর।”নামটা শুনে মহিলাটা স্বস্তির শ্বাস ফেললো যেন। কিন্তু তার মনের মাঝে তখনো তুমুল খচখচ। চিত্রারও কেমন অস্বস্তিতে ভরে গেলো শরীর। মহিলাটাকে সে এর আগে দেখে নি কিন্তু তবুও কেনো পরিচিত মনে হচ্ছে! তন্মধ্যেই মহিলাটার প্রশ্ন ভেসে এলো,

“তোমার আর কোনো নাম আছে? ধরো ডাকনাম বা অন্যকিছু?”

চিত্রা ভ্রু কুঁচকালো। সে তো ইচ্ছে করে ডাকনাম টা বলে নি, তাহলে মহিলাটা আন্দাজ কীভাবে করলো যে ডাকনাম থাকতে পারে! চিত্রা মাথা দুলিয়ে বললো,

“চিত্রা, এই নামেই ডাকে আমাকে সবাই।”

চিত্রা নামটা শুনতেই কেমন যেন বিস্ফোরিত নয়নে তাকিয়ে রইলো মহিলা। হাত-পায়ে দেখা দিলো তার

মৃদু কম্পন। শরীরে অস্বাভাবিক ভাবে ঘামের উপস্থিতি। মুহূর্তের মাঝেই পাশের নারীটির এহেন পরিবর্তনে ভড়কে গেলো চিত্রা। ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বললো,“কী হলো আন্টি আপনার? ঘামছেন কেন? কোনো সমস্যা হচ্ছে?”

মহিলা কাঁপতে কাঁপতে দু’হাতের আঁজলে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললো। চিত্রা চোখ মেলে মহিলা

টার পা থেকে মাথা অব্দি আবার পর্যবেক্ষণ করলো। কালো রঙের ডিজাইনিং শর্ট হাতার ব্লাউজের সাথে মখমলের কালো শাড়ি পরিহিতা রমনীর শুভ্র রাঙা শরীর। ডান হাতে কালো মোটা চেইনের ঘড়ি। চুল গুলো বয়কাট। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মনে হলো। এই মানুষটার লোকাল বাসে চড়ার কী দরকার ছিলো!

চিত্রা চিন্তিত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলো,

“আন্টি, কী হয়েছে আপনার? বলুন?”মহিলাটা নিজেকে অনেকটা সময় নিয়ে ধাতস্থ করলো অতঃপর সিটের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললো,

“ও তেমন কিছু না। লোকাল বাসে চড়ার অভ্যাস নাই তো তাই আর

কি। তোমার মায়ের নাম মুনিয়া বেগম তাই না?”

“হ্যাঁ।”

চিত্রা উত্তর দিয়েছে ঠিকই কিন্তু কণ্ঠ তার তখনো কাঁপছিলো। মহিলাটা কী মায়ের কলিগ? মাকে কী বলে দিবে চিত্রার সাথে দেখা হওয়ার কথাটা! এমন অনেক অহেতুক ভাবনায় ভীত হলো চিত্রা। মহিলাটাও অনেকটা সময় চুপচাপ ছিলেন।

অতঃপর অনেকটা পথ যাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন মহিলা। বাস তখন ধীর গতি নিচ্ছিল যাত্রী নামানোর জন্য। ভদ্র মহিলা চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে বিবশ কণ্ঠে বললেন,“আমি এতিমখানা চালাই। বিরাট এক এতিমখানা আছে আমার গাজীপুরে। আমার সন্তানকে আমি তাদের মাঝে খুঁজে নিয়েছি। নিজের ইচ্ছায় খুব কম মানুষই পা°পী হয়, তবে

অনিচ্ছাকৃত পা° পের বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হয় চিরকাল। তোমার এমন গোছানো ভাব দেখে ভালো লাগলো। জীবনের কোনো মোড়ে যেন আমাদের আর দেখা না হয়। তুমি ভালো থেকো, আমার দু'হাতের প্রার্থনায়।"কথা শেষ হতেই ঝ°ড়ের বেগে নেমে গেলেন ভদ্রমহিলা। চিত্রা ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে রইলো মহিলাটির যাওয়ার পানে। চিত্রার

হয়তো বোধগম্য হলো এখন, কেন মহিলাটিকে এত চেনা চেনা লেগেছে তার। নিজের মুখের আদলের সাথে যে সেই ভদ্রমহিলার প্রচুর মিল ছিল যা চিত্রার মস্তিষ্কে হুট করে খেলে গেলো। যাকে এই জীবনে দেখতে চাওয়ার কোনো ইচ্ছে সে পোষণ করে নি, আজ যেতে যেতে তাকেই দেখে নিলো। চিত্রা ভুলে যাবে এই সাক্ষাৎ। কিছু মানুষের সাথে দেখা

না হওয়াই উত্তম। কারণ মানুষ যতটা ক্ষণস্থায়ী, তাদের সাথে কাটানো স্মৃতি ততটাই দীর্ঘস্থায়ী। আরও একটা কেমন অস্বচ্ছ স্মৃতি জমা হলো চিত্রার হৃদয়ে! “জন্মদাত্রী” মানুষটার সাথে স্মৃতি কখনো চায় নি চিত্রা।গা ছ°মছ°মে শুনশান এক ক°বর°স্থানে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। সন্ধ্যার হিমশীতল বাতাস তাকে কেমন ছুঁয়ে যাচ্ছে।

শরীরের লোমকূপ কাঁপিয়ে দিচ্ছে সেই বাতাস। একটু ভ°য়, রোমাঞ্চ, প্রাপ্তির আনন্দ সকল অনুভূতি মিলেমিশে একাকার। চিত্রা চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলো। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে হওয়ায় এখানে আসতে আসতে সন্ধ্যা নেমেছে। কিন্তু বাহার ভাই বেছে বেছে এখানেই কেন আসতে বললো? আর বলেছে নাহয় মানা যায়, কিন্তু কই মানুষটার টিকি

টারও দেখা নেই চারপাশে।চিত্রা ক্ষীণ স্বরে কয়েকবার ডাকলো, “বাহার ভাই, বাহার ভাই? আছেন? শুনছেন?”

কোনো উত্তর এলো না। কেবল বড় বড় তালগাছ, বটগাছের আড়ালের ঝোপঝাড় থেকে শুকনা পাতার উপর হেঁটে যাওয়ার মড়মড় শব্দ হলো। চিত্রার শরীরে কাঁপুনি দিলো। ভ°য় এসে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিলো

তাকে। কিন্তু ঐ যে প্রাপ্তির আকাঙ্খা, সেটা ভ° য়কেও ছাঁপিয়ে গিয়েছে। তাই সে আরেকটু গলা তুলে ডাক দিলো,”বাহার ভাই?”

এবারও সাড়া পাওয়া গেলো না। ক°বর°স্থানে লাগানো হলদেটে লাইট গুলো একটু দুলে দুলে উঠলো। চারপাশে অনেক মানুষের উপস্থিতি টের পেলো সে। হেঁটে যাওয়ার শব্দ কানে বারি খেলো তার কিন্তু চারপাশ

শূণ্য খাঁ খাঁ। ভ°য়ে চিত্রার কলিজা শু°কিয়ে এসেছে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে যখন আবার ডাক দিতে যাবে বাহার ভাইকে, তখনই বা'পাশের ঝোপের আড়াল থেকে গুনগুনিয়ে গানের শব্দ শোনা গেলো। লোকমুখে শোনা কত রকমের উ°দ্ভট কথা মনে পড়ে গেলো তার! চিত্রা একবার ভাবলো ছুটে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে আবার কী মনে করে সে গেলো না।

যা হবে দেখা যাবে কিন্তু বাহার ভাইকে পাওয়ার আশা ছাড়া যাবে না। মনকে শক্ত করে ধীর পায়ে ঝোপের কাছটায় গেলো চিত্রা। গানের গলাটা আরেকটু পরিষ্কার হলো। স্বচ্ছ কণ্ঠে শোনা গেলো,“গর্ভধারিণী মা, জনম দুঃখিনী মা,
দুঃখের দরদী আমার জনম দুঃখী মা।

আমার মায়ের কা°ন্দন যাবত জীবন,
দু’চার মাস বোনের কা°ন্দন রে,
ওরে ঘরের পরিবারের কা°ন্দন,
কয়েকদিন পর থাকে না,
দুঃখের দরদী আমার জনম দুঃখী মা।
পুত্র যদি কু°পুত্র হয়, মা এ নাহি ফেলে,
হাজার দোষ গোপন করিয়া, তবু মায়ে পালে,,, ”

“বাহার ভাই!”চিত্রার বিস্মিত ডাকে গান থেমে গেলো। কিন্তু বাহার তাকালো না চিত্রার পানে। অনবরত পুরোনো এক ক°ব°রে হাত বুলিয়ে গেলো। চিত্রার চোখে-মুখে ছড়ানো বিস্ময়, কণ্ঠেও অবাক ভাব। বাহার ভাইয়ের কেমন বি°ধ্ব°স্ত অবস্থা! পড়নের সাদা পাঞ্জাবিটাতে ধূলোয় মাখামাখি। গালে অবহেলার দাড়ি।

চোখ মুখে কেমন বিংধ্বংস্ততা! চিত্রা আবার ডাকলো,

“বাহার ভাই, কী করছেন?”

“মাকে একটু ছুঁয়ে দিচ্ছি।”

ভাঙা স্বরে বাহার ভাইয়ের উত্তর। বাহার ভাই কী কাঁদছে? চিত্রা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলো বাহার ভাইয়ের দিকে, কম্পিত হাতটা রাখলো বাহার ভাইয়ের বাহুতে। তৎক্ষনাৎ বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো

বাহার। ধূলো ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো,

“অবশেষে ঠিকানা চিনে আসলে?”

“আসতে তো হতোই। আমার গন্তব্যের সমাপ্তি তো আপনিই।”

হলুদ নিয়ন বাতির ঝাপসা আলোয় বাহার ভাইয়ের মুখ কেমন চকচক করে উঠলো, রহস্য করে হেসে বললো,

“ভ°য় লাগছে না তোমার? যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়? যতই হোক, মানুষ হিসেবে তো আমি ভালো নই।”

বাহার ভাইয়ের এহেন কণ্ঠে কিঞ্চিৎ ভড়কে গেলো চিত্রা। মৃদু কম্পন বয়ে গেলো শরীর জুড়ে। তবুও নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে বললো,“খা°রা°প কিছু হবে না, আমার ভরসা আছে।”

“অথচ আমি খাঁরাঁপ কিছু করার জন্যই সওদাগর বাড়িতে পা রেখেছিলাম। সওদাগর বাড়ির দঁম্ভ, সম্মান ভেঁঙে চুঁরঁমাঁর করে দিতেই তো গিয়েছিলাম।”

একে তো অনাকাঙ্খিত জায়গা তার উপর বাহার ভাইয়ের অপ্রত্যাশিত কথায় হতভম্ব চিত্রা। তবুও সাহস নিয়ে বললো,

“আমরা এখান থেকে বেরিয়ে কথা বলি, বাহার ভাই? চলুন।”চিত্রার ভ°য়ে জ°বুথ°বু মুখটা দেখে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো বাহার। দুনিয়ার সবচেয়ে অপরিচিত লাগলো তাকে। চিত্রার পা কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কথাও বের হচ্ছে না। এই অপরিচিত বাহার ভাইকে তার ভ°য় লাগছে।

কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে মানুষটাকে!

বাহার চিত্রার থেকে একটু সরে গিয়ে পাশাপাশি থাকা দু'টি কবরের মধ্য খানে শুয়ে পড়লো। হাত-পা মাটির উপর বিছিয়ে বেশ আরাম করে শুয়ে পড়লো। যেন এর চেয়ে আরামের জায়গা কিছু নেই। অতঃপর খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্চস্বরে বললো,

“শুনছো সর্বনাশিনী রঙ্গনা, আমি মারা গেলে, আমারে হেতায় তুমি রেখে যেও। এই কবর দুটির মাঝে যেন ঠাঁই হয় মোর।”মারা যাওয়ার কথা শুনে আৎকে উঠলো চিত্রা। তড়িঘড়ি করে বললো,

“অমন বলবেন না, বাহার ভাই। আমাদের এখনো একসাথে সংসার করা বাকি। অনেক বছর বাঁচা বাকি আমাদের।”

বাহার আবার হো হো করে হেসে উঠলো। অবশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

“সংসার করার খুব সা°ধ না তোমার?”

“হ্যাঁ।”

“অথচ আমার গায়ে ক°ল°ঙ্কের কালি।”“আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, বাহার ভাই। চাঁদের গায়ের ক°ল°ঙ্কের কথা রটে সাধারন মানুষ,

তাই বলে চাঁদের অসাধারণত্ব তারা কখনো গোপন করতে পারে নি। মানুষের স্বভাবই সুন্দরে কা°লি লেপা। চাঁদের গায়ের দীপ্তিময় সৌন্দর্যের কাছে মানুষের মুখে রটা ক°ল°ঙ্ক নে°হাৎই কৌতুক।”

“কাব্য আর বাস্তবতা যে ভীন্ন রঙ্গনা। আমাদের বোধহয় এ জনমে আর সংসার করা হবে না। জানো রঙ্গনা, সেই আদি থেকেই আমি দেখেছি

আমার কোনো শখ পূরণ হয়নি, তাইতো তোমাকে মনে প্রাণে নিজের ভেবেও চাওয়ার সাহস করি নি। কিন্তু অপ্রাপ্তির এই জীবনে প্রাপ্তির শখ তো আমারও হয়, হয় না বলো? ভেবেছিলাম একটা চাকরি করবো, একটা চাকরির অভাবে অনেক কিছু হারিয়েছি, কেবল তোমায় হারাতেই চাই নি। কিন্তু আমার ভাগ্য দেখো, তোমাকে পাওয়ার আগেই চারপাশে

কেমন না পাওয়ার ঘোষণা! আমারই কেন বার বার স্বপ্ন ভাঙতে হবে বলো রঙ্গনা?”

চিত্রা চুপ করে কেবল বাহারের এতদিনের লুকিয়ে রাখা অভিযোগ শুনলো। কোনো কথা বললো না, শব্দও করলো না। বাহার আগের ন্যায় শুয়ে থেকেই বললো,“তোমাকে আমার অভাগিনী মায়ের গল্প শোনাই আসো। স্বামী ভক্ত একজন

নারীর গল্প। যে গল্পে জুড়ে আছে ভ°য়া°বহ বিচ্ছেদ। বো°কা-সোকা আম্মা আমার কখনো সুখ চায় নি, কেবল চেয়ে গেছে স্বামীর মঙ্গল। আজ যদি সে নিজের জন্য কিছু করতো, তবে আমাকে এখন উ°ন্মা°দ হয়ে দু'টো ক°ব°রের মাঝখানে শুয়ে থাকতে হতো না। আমার মাকে যিনি বিয়ে করেন, তিনি কখনো আমার আম্মুকে তার

বাড়ি নিয়ে যায় নি। আমার আম্মু সবসময় আমার নানার কাছে থাকতো। গরীব নানা ভাই আমার তবুও যত্নে রাখতেন মেয়েকে। আমাদের যে জন্মদাতা, আমার মায়ের স্বামী, তিনি সপ্তাহে কয়েকদিন এসে থেকে যেতেন, টাকাও পাঠাতেন। আমার জীবনটা তখনও ঠিক ছিল। আম্মাও অতটুকুতে খুশি ছিলো।কিন্তু সমস্যা

হয় যখন আমার বয়স সাত কিংবা আট আমার বোনও তখন মায়ের গর্ভে, ঐ ভদ্রলোকের আসা-যাওয়া কমে যায়। তবে এর আগে থেকেই কম আসতেন কিন্তু বোন গর্ভে আসার পর দু তিন মাসে একবার আসতেন। কখনো টাকা পাঠাতেন, কখনো পাঠাতেন না। মায়ের যখন নয় মাসের মাঝামাঝি, আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে

তাঁড়িঁয়ে দেওয়া হয় বাসা ভাড়া দিতে না পারার কারণে। আব্বুর একটা নাম্বার ছিল আম্মুর কাছে। অনেক পুরোনো বোঝাই যায়। কখনো আমার মা সে নাম্বারে কল দেয় নি বোধহয়, যদি আব্বু রাগ করে। কারণ লোকটাকে তো আমার মা বড্ড ভালোবেসে ছিল। সেদিন যখন আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটু বাঁচার আশায় মা

তার স্বামীকে কল দিলো তখন অপর পাশ থেকে মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এলো।মাকে যা না তা বলে অ°প°মান করলো। আমার মা গরীবের মেয়ে হলেও আত্মসম্মানবোধ তার আকাশ ছোঁয়া। ওসব কথা সহ্য করতে না পেরে মা জ্ঞান হা°রা°লো। তাকে আমি আর নানা মিলে নিয়ে গেলাম কাছের এক সরকারী হসপিটালে। আমার বোন

পৃথিবীতে আসার সময় হয়ে গিয়েছে। অনেক টাকার দরকার। চোখে-মুখে যখন আঁধার দেখছি আমি। আট বছরের আমি কী বুঝতাম বলো? কিইবা করতে পারতাম? নানা আমাকে আমার আব্বুর ঠিকানা দিলো, বললো যেভাবে হোক আব্বুকে আনতে হবে। ছোটো জীবনের বড় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমি ছুটে এলাম

গাজীপুর থেকে ঢাকায়। কতবার রাস্তায় পি°ছ°লে পড়ে ‘মা’ ‘মা’ বলে আ°র্ত°নাদ করেছি!কেউ ছিলো না আমার হাতটা টেনে তুলে ধরার জন্য। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, আমার পুরো পৃথিবী শূন্য। আমার পথ সহজ না। এই ঢাকা শহরে পা রাখতেই মাথা ঘুরে গেলো। সারাদিন পর রাতের দিকে খুঁজে পেলাম বাবার বাড়ি কিন্তু তার বাড়িতে এসে

আমি অবাক, বিস্মিত। চারদিকে আলোকসজ্জা। বাবার কোলে যমজ দু’টো ছেলে, যাদের একবছরের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, সাথে তার রাণীর মতন বউ। বুঝলাম, আমার মায়ের বি°ধ্ব°স্ত°তার কারণ কী! আমার আর সেই মুহূর্তে ঐ লোকটার কাছে যেতে ইচ্ছে করে নি। কেবল ঘৃ°ণা জন্মেছিল। সেই রাতের রাস্তায় না খেয়ে অপরিচিত

এই ইট পাথরের শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। গাড়ি ভাড়ার টাকা নেই, ফিরবো কীভাবে! অবশেষে ভি°ক্ষে করেছি। বুঝলে আমার হাতের বাস্তবতার নি°র্ম°ম°তা কেমন ছিল? পরের দিন যখন হসপিটাল এসে পৌঁছালাম দেখি বড্ড দেরী হয়ে গেছে ফিরতে ফিরতে। মা আমার জন্য অপেক্ষা করেন নি।আমার কোলে সদ্য জন্ম নেওয়া নবজাতক

চিৎকার করে কাঁদছে অথচ আমি কাঁদতে পারি নি, মা হা°রা°নোর পরও। মা যে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল হাতে, চোখে দিয়ে গিয়েছিল বড় হওয়ার স্বপ্ন। মা কত স্বা°র্থ°প°র বলো? যে লোকটা মাকে আদৌও ভালোই বাসে নি, তার জন্য মা কিনা অভিমান করে বি°দায় নিলো! আর আমি যে মাকে এত ভালোবাসলাম, তা বুঝি কিছুই না? ভালোবাসা

মানুষকে সত্যিই অসহায় করে দেয়। আট বছরের একটা শিশুর কোলে আরেকটা শিশুর দায়িত্ব, মাথার উপর ছাতা নেই, কেবল ছিল রোদের উত্তপ্ততা। মেয়ে হারানোর শো°কে আমার নানাজানও ভে°ঙে এসেছিল। কিন্তু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে জী°র্ণ°শী°র্ণ দেহখান নিয়েও আবার পথ চলা শুরু করলো। প্রিয় শহর ছাড়লাম,

ছাড়লাম আব্বা ডাকার স্বাধ।মায়ের ক°ব°র দেওয়ার জন্য নিয়ে চলে এলাম এখানে। চলতে চলতে গুটি গুটি পায়ে চলে গেলাম অনেকটা দূর। নিজের পড়াশোনা, বোনের দায়িত্ব, নানা ভাই এর বৃদ্ধ দেহের বোঝা সব আমার পিঠে কিন্তু বড় হতে হলে তো পড়াশোনা লাগবে তাই ছাড়লাম না সেটা। নিজেও ইটের ভাঁটায় কাজ করতাম। যা

টাকা পেতাম তা দিয়ে সংসার চলতো কিন্তু আমার বোনের শখ যে পূরণ করার ক্ষমতা ছিলো না। নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন এই অসহায় জীবন থেকে মুংক্তি পেলেন নানাভাই। এই পৃথিবীর বুকে আমাকে আর আমার বোনকে একা রেখে দিয়ে গেলেন। এতদিন যেই সাংহস টা ছিল, তাও নিভে গেল। এংতিংম দু'টো ছেলেমেয়ে পুরো

পৃথিবীতে একা। বাবা বলতে মানুষটার অস্তিত্ব তখন আর আমার জীবনে নেই। সংসার চালাতে নানা ভাইয়ের রিকশার প্যাডেল ঘোরালাম। ঠেলাগাড়ি টানলাম, কুলি হয়ে খেলাম কত লা° ঠি ঝাঁ°টা।সে গল্প পৃথিবীর বুকে লুকানো অমর কোনো এতিমের কাব্যগ্রন্থ। নিজের পড়াশোনা আর বোনের পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। তখন আমি অনার্স

প্রথম বর্ষের ছাত্র। কঠোর পরিশ্রমের পর ভর্তি হলাম পাবলিক ভার্সিটিতে। রোজ এখান থেকে শহরে যেতাম আবার আসতাম এখানে। বোনও তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। এখানেরই একটা স্কুলে তাকে পড়াতাম। একদিন বায়না করলো নুপুর কিনে দেওয়ার। কী তার বায়না! স্কুলে সকলের নুপুর আছে কেবল তারই নেই। বোনকে বুঝাতে পারি নি, সুখ

যে সকলের থাকে না। তবুও আমি কথা দিলাম নুপুর কিনে দিবো। ঢাকা যখন যেতাম, ভার্সিটি শেষে একটা বড় শপিং মলে সেলসম্যান এর কাজ করতাম। এমনই একদিন ঘটনা, দু'দিন পর ঈদ, শপিংমলে তুমুল ভীড়। বাড়ি ফিরতে পারছি না। অবশেষে বোনাসের টাকা পেয়ে বোনের জন্য একটা নুপুর কিনলাম, একজোড়া নুপুর কেনার সামর্থ্য যে

আমার ছিল না।নুপুর কিনে, ফিরে এলাম বাড়ি। রাত তখন এগারোটা। ঘরে ফিরে দেখি বোন আমার ঘরে নেই। দ্রুত প্রতিবেশীদের কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ দিতে পারলো না আমার বোনের খোঁজ। পুরো এলাকাতে পা°গ°লের মতন ছুটে বেড়ালাম। বুকে তখন হা°রা°নোর ভ°য় উৎ°পা°ত চালাচ্ছে। টানা দু'দিন খোঁজাখুঁজির পর বোনের লা°

শ পেলাম স্কুলের সাথে ডোবায়। আমার পুরো পৃথিবী এক°লা করে কেমন করে আমাকে ছেড়ে চলে গেলো অভি°মানী°নি, দেখলে? ওরা কত স্বা° র্থ°প°র তুমি দেখলে রঙ্গনা। আমায় ওরা কেমন শূন্য করে দিয়ে চলে গেলো। আমারে কতটা নিঃ°স্ব করে দিয়েছে এ পৃথিবী, আমি কারে দেখাই সে নিঃ°শ্ব°তা। রঙ্গনা, তুমি দেখলে তো

আমার অপ্রাপ্তির খাতায় কেমন বিরাট একটা শূ°ন্যতা? আমার বোনটা নুপুরও পড়ার সুযোগ পেলো না, অমন ফুলটাকে বাঁ°চতে দিলো না এই সভ্য সমাজ। এই সমাজ আমার সব কে°ড়ে°ছে। অ°সহায়দের জন্য এই সমাজ না রঙ্গনা। এতিমদের জন্য এ সমাজ না। মানুষ শা° লা এত নি° ষ্ঠু°র। আমাকে বাঁ°চতেই দিলো না সুখের

সাথে। কী ব্যাংথা যে রঙ্গনা!”কংবংরংস্থানের নিংস্তব্ধতা ভেদ করেও বাহার ভাইয়ের কেমন একটা হাংহাংকার। চিত্রা বসে পড়লো থম মেরে। বাহার ভাইয়ের বর্তমান অবস্থাকে কোনো মৃং ত লাং শের হাংহাং কার বলা যায়। এই আংর্তংনাদ থামানোর ভাষা চিত্রার জানা নেই, সে কেবল অংশ্রু বিসর্জন দিতেই জানে।

বাহার ভাই অনেকক্ষণ চুপ রইলো। লোকটা কী কাঁদলো! কে জানে! নিরবতা ঠেলে গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠে বাহার ভাই বললো,“কাঁ°দছো রঙ্গনা? কেঁদো না। আমার জন্য কেউ কাঁদুক তা আমি চাই না। জীবনের এত গুলো বছর তো কাটালাম কারো দয়ামায়া বিহীন, কেউ আমার জন্য মায়া দেখালে আমার হাসি আসে। বোনের দে°হটা মায়ের সাথে শু°ইয়ে

দিয়ে কথা দিয়েছিলাম এই সভ্য সমাজে চ°র°ম অ°সভ্য হবো আমি। বোনের মৃ° ত্যুর রহস্য ভেদ করে জানলাম শহর থেকে এক নেতা এসেছিল ওদের গ্রামের স্কুলে আর তারই দৃষ্টির লা°ল°সায় স্বী°কার আমার বোন। সেই তুমুল রা°গ আর প্রতি°হিং°সা নিয়ে আমি পা রেখে ছিলাম শহরে। আর কেন তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম বলো তো?”

চিত্রা জবাব দেয় না। কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ছন্নছাড়া বাহার ভাইয়ের দিকে। তাই বাহার ভাই নিজেই বলে,“আমার জীবনের চরম সর্বনাশ যে করেছে, তার মহল ঘৃণায় ভেঙে দিতে গিয়েছিলাম। আমার জন্মদাতার ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে গিয়েছিলাম।”

চিত্রা অবাক হলো। বাহার ভাইয়ের জন্মদাতার সাথে চিত্রা নিজের বাড়ির কোনো সংযোগ পেলো না। অবাক কণ্ঠে বললো,

“আমাদের বাড়িতে আপনার জন্মদাতা?”

বাহার তাচ্ছিল্য হাসলো। হেয়ালি করে বললো,

“তুমি এত বো° কা কেন গো? তবে তোমার এমন বো° কামি আমার

প্রিয়। আমার জন্মদাতা তোমাদের বাড়িতে কেন জিজ্ঞেস করলে! কারণ আমার জন্মদাতার বাড়িই ওটা। আফজাল সওদাগরই আমার জন্মদাতা।”

চিত্রা বি°স্ফো°রিত নয়নে তাকিয়ে রইলো। অবাক কণ্ঠে বেশ উচ্চস্বরে বললো,“কীহ!”

“তোমার বড় চাচীর যখন সন্তান হচ্ছিলো না তখনই তোমার চাচা

আমার আম্মুকে বিয়ে করেছে। কিন্তু সে সমাজের কাছে পরিচয় দেয় নি আমাদের। যখন তার সন্তান হলো সে ভুলে গেলো আমাদের। তোমার চাচীও যখন জানতে পারলো স্বামীর কথা, তখন লুকিয়ে গেলো সবার কাছে। আর আমাদের থেকে কে°ড়ে নিয়েছে বাবাকে। এই যে আমি তোমাদের বাড়ি থাকতাম, এত কিছু

করতাম, তবুও তোমার চাচা কিছু বলতো না একমাত্র এই কারণেই।”

“বড় চাচীও জানতো?”“না, এতদিন জানে নি। তবে সেদিন জেনে গিয়েছিল যার ফলস্বরূপ সে আমার হাঁতেপাঁয়ে ধরে বলেছিল তোমাদের বাড়ি ছাঁড়ার কথা। তাই তো ছেড়েছিলাম বাড়ি। কিন্তু ঐ যে ভাঁঙা ভাগ্য, ফেঁসে গেলাম খুব

খারাপ একটা জালে। আমি জানি, এ জাল থেকে বের হওয়া সম্ভব না।”

“কে ফাঁ°সি°য়ে°ছে আপনাকে?”

“আমাদের ভার্সিটির ঐ রাজ°নৈতি°ক নেতা। আর আমার বোনের খু° নি। আরও একটা মেয়ে ঝরে গেলো অকালে। কিন্তু সে বি° চার পাবে না। আর ক্ষমতার কাছে হয়তো হে°রে যাবো আমি।”

চিত্রা উঠে দাঁড়ালো। দ্রুত বাহারের কাছে গিয়ে বাহারের ডান হাত আঁকড়ে ধরে চোখের জল ছেড়ে দিয়ে বললো,

“চলুন না বাহার ভাই, আমরা চলে যাই এখান থেকে। অন্য কোনো শহরে, অপরিচিত কোনো স্থানে আমরা দু’জন থাকবো। চলুন না।”বাহার ভাইও গা ঝেরে উঠে

দাঁড়ালো। চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,

“তাহলে চলো, দূরে কোথাও ঘর করি আমরা। আমাদেরও পূর্ণতার গল্প হোক।”

দু’জন এতিম ছেলেমেয়ের ভাগ্য সত্যিই যদি ভালো হতো! বাহার আর চিত্রার মিষ্টি স্বপ্নের মাঝে জল ঢেলে ক°ব°রস্থা°নের চারপাশ থেকে বেরিয়ে এলো পু°লি°শ ফোর্স।

দু’জনকে ঘিরে ফেললো তারা। চিত্রা আর বাহার কেবল অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। তাদের চোখে মুখে টর্চের আলো পড়তেই চোখ-মুখ কুঁচকে ফেললো তারা। অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাতেই নুরুল সওদাগরের গম্ভীর মুখটা ভেসে এলো চোখের সামনে। বাহারের হাতে ততক্ষণে হ্যান্ড°কা°ফ পড়ানো হয়ে গেছে। চিত্রা কেবল দেখে

গেলো চুঁরঁমার করা স্বপ্ন ভাঁঙঁন। চিত্রা নিজের বাবার পা চেপে ধরলো। আকুতি মিনতি করতে করতে বললো,“আব্বু, ছেড়ে দেন বাহার ভাইকে। ছেড়ে দেন আব্বু। আপনি তো জানেন বাহার ভাই এমন করতে পারে না। প্লিজ ছেড়ে দেন আব্বু। আমরা অনেক দূর চলে যাবো, একটা বার দয়া করুন। আমরা আর এখানে ফিরে আসবো

আব্বু। ছেড়ে দেন। আমি বাঁচবো না যে উনাকে ছাড়া।”নুরুল সওদাগর তার দায়িত্ব পালন করলেন। মেয়ের কথা অনেক শুনতে চেয়েও দায়িত্বের সাথে আপোস করতে পারলেন না তিনি। তার চোখে ভেসে উঠলো অনেক বছর আগের সেই দিনটি যেদিন অবনীও এমন হা°হা°কা°র করেছিল। কিন্তু নুরুল সওদাগর পারেন নি কিছু করতে। সে মানুষ

হিসেবে যেমন হোক, দায়িত্ব কখনো হেরফের করে নি। তাই তো সেদিন অমন নি°ষ্ঠু°র°তম কাজটা করতে পেরেছিল। আর আজ! সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো আবার!

বাহারের ঠোঁটে তখনও হাসির রেখা। কণ্ঠে বিষাদ আর আফ°সোসের সহিত সে উচ্চারণ করলো,

“আমাদের আর সংসার করা হলো না, রঙ্গনা।”সময় কখনো থেমে

থাকে না। এই যে প্রেমের ঋতু বসন্ত, সে কি প্রেমিক হারানোর যন্ত্রণায় কভু নিশ্চুপ থাকে? থাকে না। কারণ, প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে চলে। আর খুব সহজে সে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলে বাঁচতে শিখে যায়।

সময়টা রিক্ত শীতের মাস নভেম্বরের মাঝামাঝি। শহরের কঠিন শরীর চাদরে ঢাকা শীতকাল। বাহার

ভাইয়ের জেল জীবনের অতিক্রান্ত সাতাশ দিন। বদলে গেছে সবকিছু। চিত্রারা ফিরে এসেছে নিজের বসতভিটাতে। সওদাগর বাড়িতে পিনপতন নীরবতা। কোথাও যেন দূর বন হতে ভেসে আসে কানাকুয়োর অকল্যাণের সুর। বাতাসে বাতাসে কেমন স্বজন হারানোর শোক! সেই শোক ভুলানোর জন্য আফজাল সওদাগর

অহির বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন আবার। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে তিনি সেড়ে ফেলতে চান বিয়েটা। অন্তত এই সুবাদে আনন্দরা হুমড়ি খেয়ে পড়ুক বাড়ির আঙ্গিনায়। হাসিরা নাহয় আরেকটা বার বাঁধন মুক্ত হোক। প্রতিটি মানুষের মাঝে নিজস্ব ভাঙন, অথচ প্রকাশ্যে তারা করছে ভালো থাকার চেষ্টা।মিরপুরের আধুনিক কলোনী শ্যাওড়া পাড়ার

পাশ ঘেষে যাওয়া শুনশান জনমানবহীন হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। পড়নে তার সাদা থ্রি-পিস। চোখে লাগানো রোদ চশমা এবং মুখে লাগানো মাক্স। খুব ধৈর্যের সাথে মিনিট কয়েক ব্যয় করে সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কারো অপেক্ষায়। শীতের মৌসুম অথচ তার শরীরে কোনো

শীত বস্ত্র নেই। বরং হালকা ঘামের আভাস দেখা দিচ্ছে তার দেহ জুড়ে। আরও মিনিট পাঁচ ব্যয় করতেই বড় আলিশান হোটেলটি থেকে বেড়িয়ে এলো সাদা পাঞ্জাবি পড়া উঁচু, লম্বা শক্তিশালী দেহের পুরুষ। মুখে লেগে থাকা মোহনীয় হাসি, শীতের শীতলতায় লাল লাল ওষ্ঠ। নির্দ্বিধায় সুপুরুষ বলা যায় তাকে।হোটেলের বাহিরে এসে কাঙ্খিত রমণীকে

চোখে পড়তেই মুচকি হাসলো সে। বেশ ভদ্রতার সাথে বললো,

“চিত্রা? এম আই রাইট?”

বেশ শান্ত ভাবে চিত্রা উত্তর দিলো,

“হ্যাঁ।”

ভদ্র লোকটি পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নিতে নিতে বললো,

“খুব ভুল না করলে আপনি বর্তমানের জেল খাটা আসামী বাহারের প্রেমিকা, তাই না?”

চিত্রার কোমল মুখমণ্ডল শক্ত হলো, কর্কশ কণ্ঠে বললো, “না। শুভাকাঙ্খী।”

চিত্রার উত্তরে বেশ দা°ন°বীয় এক হাসি দিলো লোকটা। কোমড়ে দু’হাত রেখে গা জ্বালানো হাসি দিয়েই বললো,

“হয়, হয়, এমনই হয়, প্রেমিকের কঠোর সময়ে প্রেমিকারা তাদের পরিচয় দিতে চায় না। প্রেমিক তখন

শুভাকাঙ্খী হয়ে রয়।”লোকটার গা জ্বালানো কথায় বিরক্ত হলো চিত্রা। চোখ মুখ বিরক্তে কুঁচকে এলো তার। অসহ্য রকমের এক মুখ ঝাস্টা দিয়ে বললো,

“প্রেমিক-প্রেমিকার সংজ্ঞা শুনতে আমি আপনার কাছে আসি নি। দরকারেই এসেছি। আমার দরকারী কথাটা শুনবেন দয়া করে।”

“হ্যাঁ বলুন। আমার আবার তত সময় নেই।”

বর্তমানে নিজের সামনের অবস্থানরত ছেলেটার সাথে কথা বলার নূন্যতম ইচ্ছাও চিত্রার মাঝে নেই। তবুও, বিপদের সময় ইচ্ছে অনিচ্ছার চেয়ে গুরুত্বটা বেশি ভূমিকা পালন করে। সেই জন্যই চিত্রা নিজেকে ধাতস্থ করে বললো,

“আপনি নিজের এমন পাওয়ার ভুল কাজে লাগানো বন্ধ করবেন।”

“যেমন?”“আপনার জন্য আজ আমার বাহার ভাই দোষী নাহয়েও চৌদ্দ শিকের ঐ অন্ধকার ঘরে আটকে আছে। তার উপর কোনো উকিল আমাদের পক্ষের কেইস লড়তে ইচ্ছুক না। একমাত্র আপনি তাদের ভয় দেখাচ্ছেন বলে তারা রাজি হয়েও পিছিয়ে আসছে।

রাজনীতি যদি কুকাজেই লাগান তবে সে রাজনীতির মানে কী?”

“আর কিছু?”

নিজের এত গুলো কথার বিপরীতে সামনের লোকটার এমন উত্তরে ভীষণ বিরক্ত হলো চিত্রা। মাথার মাঝে তরতর করে রাগেরা হামাগুড়ি দিলো। মুখ-চোখ তার নিমিষেই লাল হয়ে উঠলো, কণ্ঠধ্বনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে সে চেঁচিয়ে

বললো,“আপনাকে আমি খুন করবো।”

কথাটা বলার সাথে সাথেই চিত্রার গলাটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরলো লোকটা। এতক্ষণের ফুরফুরে মেজাজটা আর দেখা গেলো না লোকটার মধ্যে। শরীর, চেহারা জুড়ে কেবল কাঠিন্যতা। সেই কাঠিন্যতা চলে গেলো কণ্ঠস্বর অব্দি। চিত্রার

গলার মাঝে আরও চাপ দিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো,

“আওয়াজ নিচে।”ভয়ে, অস্বস্তি এবং ব্যাথায় চিত্রার দম আটকে আসার উপক্রম। চোখ-মুখ উল্টে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা। মুখ বেয়ে কিছুটা লালাও বেড়িয়ে এলো। চিত্রার এহেন দশা দেখে হয়তো মায়া হলো লোকটার, ছেড়ে দিলো সে চিত্রার গলা। আবার আগের মতন ফুরফুরে

মেজাজ অথচ গাম্ভীর্যতা নিয়ে বললো,

“আপনাকে যদি এখানে মে°রে পুঁতেও ফেলি, তাহলেও কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আপনাকে কেন মা°র°লা°ম না বলেন তো?”কাশতে কাশতে চিত্রার অবস্থা নাজেহাল কিন্তু লোকটার কথা শোনার জন্য তাকালো লোকটার মুখমন্ডলে। চেহারার মাঝে উত্তরের

আকাঙ্খা। লোকটা নিজের রোদ চশমাটা পড়তে পড়তে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা করে বললো,

“আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আমার কাছে ধরা দিয়ে বেশ ভুল করেছেন। এবার পস্তানোর পালা।”

চিত্রা কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না, তন্মধ্যেই বিশাল কালো গাড়িটা দিয়ে লোকটা চলে গেলো দৃষ্টি সীমানার বাহিরে। চিত্রা কেবল

চেয়ে চেয়ে দেখলো। এখানে আসাটা যে তার চরম ভুল হয়েছে, তা সে মিনিটের মাঝেই উপলব্ধি করতে পারলো। কিন্তু হয়তো উপলব্ধি করতে বড্ড দেরী করে ফেলেছে। সারাদিন উকিলদের দরজায় দরজায় ঘুরে হতাশ চিত্রা বিরস মুখে বাড়ি ফিরলো। ড্রয়িংরুমে তখন সওদাগর বাড়ির সকলেই প্রায় উপস্থিত। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া চিত্রাকে

দেখতেই মুনিয়া বেগম নিজের হাতের চায়ের ট্রে টা টেবিলে রেখে ছুটে এলেন। মেয়ের বাহু জড়িয়ে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

“কোথায় ছিলিস আজ? শরীরটার কী অবস্থা করেছিস, দেখেছিস?”

চিত্রা নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালো, হতাশ স্বরে বললো,

“ভালো উকিলের খোঁজ করতে গিয়ে ছিলাম, আম্মু। বাহার ভাইটার যে ওখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।”

মুনিয়া বেগম করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের পানে, স্বান্তনা দিয়ে বললেন,

“এভাবে ভেঙে পড়লে তো হবে না। তোমার বাহার ভাইকে আমরা ফিরিয়ে আনবোই। আমিও আমার কলিগদের সাথে কথা বলেছি ভালো

উকিলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। তুমি চিন্তা করো না। সব ভালো হবে।”

“সত্যিই যদি সবটা ভালো হতো!”কথাটা বলার পর পর বেড়িয়ে এলো বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস। আফজাল সওদাগর তখন সোফায় বসে কোনো গভীর ভাবনায় মগ্ন হয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। চিত্রার কথা তার কর্ণগোচর হতেই চোখ মেলে তাকালেন, ক্ষীণ স্বরে বললেন,

“আমিও করে ছিলাম উকিলের খোঁজ। কিন্তু কেউ রাজি হচ্ছে না।”

নুরুল সওদাগরের কথা থামতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রোজা সওদাগর। খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললেন,

“কেন, কেন, আপনাকে কেন ঐ ছেলের জন্য উকিল খুঁজতে হবে? রাস্তার ছেলের জন্য এত কিসের দরদ আপনার? কেমন বেঁজন্মা

ছেলে সে! এমন ভয়ানক পাপ টা করেছে!”

কথাটা থামতেই সশব্দে কাঁচের টেবিলটা ভেঙে যাওয়ার শব্দ হলো। সাথে সকলের দৃষ্টিগোচর হলো চিত্রার র°ক্তা°ক্ত হাত। মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধানল। ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো তুলে ধরে নিজের বড় চাচীর দিকে তাক করে শাসানির স্বরে বললো,“বাহার ভাইয়ের নামে আর

একটা খারাপ কথা যদি আপনার মুখ দিয়ে বের হয়, তবে জিহ্বা টা আর থাকবে না কথা বলার জন্য।”

উপস্থিত সকলে আহম্মক হয়ে তাকিয়ে রইলো চিত্রার পানে। তাদের পরিচিত, চঞ্চল, আবেগী সেই ছোটো চিত্রাকে খুঁজে বেড়ালো এই মানবীর মাঝে কিন্তু সবাইকে হতাশ করে দিয়ে সেই বাচ্চা চিত্রা রণচণ্ডীর রূপ ধারণ করেছে। মুনিয়া

বেগম তাজ্জব বনে কেবল উচ্চারণ করলো, “চিত্রা!”

চিত্রার চোখে-মুখে তখনও হিং°স্র°তা। হাতের কাঁচটা ছুঁড়ে মারলো দূরে। অহি, চাঁদনী, অবনী বেগম, তুহিন সহ সবাই এই ভয়ঙ্কর চিত্রার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। কাঁচ ভাঙার শব্দে নুরুল সওদাগরও নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রোজা সওদাগর

মুখে কাপড় চেপে কান্না আটকানোর অদম্য চেষ্টা করলেন। অভিযোগের স্বরে নিজের স্বামীর পানে তাকিয়ে বললেন,

“আপনি চুপ থাকবেন আজও? নিজের সন্তানের বয়সী মেয়ের থেকে এমন আচরণ পাবো বলেই কী আমার এত ত্যাগ তিতিক্ষার পরে সাজিয়ে ছিলাম এ সংসার! এটাই কী আমার প্রাপ্য?”

আফজাল সওদাগর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তবে চিত্রা এমন আচরণ মানতে পারে নি সেও। গম্ভীর কণ্ঠে যখন সে চিত্রার উদ্দেশ্যে বললো,“তোমার অন্যায় হয়েছে,চিত্রা।”

তৎক্ষনাৎ চিত্রার তাচ্ছিল্য কণ্ঠে উত্তর ভেসে এলো,

“আপনার চেয়ে আমার অন্যায় টা বোধহয় কমই, বড় চাচা।”

আবার অযাচিত নীরবতা গ্রাস করলো সওদাগর বাড়িতে। প্রতিটি প্রাণী হতবিহ্বল। মেয়েটা কী পা°গ°ল হলো!

সবার নীরবতা ছাপিয়ে শোনা গেলো চিত্রার কণ্ঠ, অসহায় স্বরে সে বললো,

“ভরণপোষণের দায়িত্বই যদি না নিতে পারেন, তবে কেন সন্তানের ভার মাথায় নিয়ে ছিলেন,

চাচা?”আফজাল সওদাগর, রোজা সওদাগর এবং নুরুল সওদাগর বাদে কেউ বুঝলো না চিত্রার কথার মর্মার্থ। অনেক দিনের লুকানো রূপকথার অতীত বেরিয়ে আসতে চলেছে ভেবেই ধপ করে সোফায় বসে পড়লো আফজাল সওদাগর। মাথা নিচু করে বিধ্বস্ত কাঁচের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো যেন হিমালয় ভেঙে পড়েছে। বড় চাচা

মানুষটি তো হিমালয়ের চেয়ে কম ছিল না সওদাগর বাড়ির সদস্যদের কাছে, তবে হিমালয়েরও জঘন্য অতীত থাকতে পারে তা যেন সবার ভাবনার বাহিরে ছিল। নুরুল সওদাগর আজ কিছু বললেন না। বাহারকে জেলে নেওয়ার পর থেকেই লোকটা চুপচাপ থাকেন, কোনো রকমের কটুক্তি করেন না। এ যেন অগাধ পরিবর্তন।

চাঁদনী আপা চিত্রার কাছে এলেন। স্থির নয়নে জোড়া, অথচ চঞ্চল মন। কোনো একটা অনাকাঙ্খিত ভয়ে দুরুদুরু কাঁপছে বুক। তবুও সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলো,“চিতাবাঘ, কী বলছিস! পা°গ°ল হলি নাকি?”

চিত্রা হাসলো, তাচ্ছিল্য করে বললো, “না গো আপা, পা°গ°ল হই নি। তোমাদের কাছ থেকে লুকানো

এতদিনের অস্বচ্ছ অতীতটা পরিষ্কার করছি। আমার বাহার ভাইয়ের তো কোনো দোষ নেই, তবে তার জন্য কেন এমন কথা উঠবে! সেই কৈফিয়ত আমার চাই।”

রোজা সওদাগর ভীত হলেন। ছোটো ছোটো চক্ষুদ্বয়ে ভর করলেন ভয়। ভীতু গলায়ই বললেন,

“চিত্রা, তোর মাথা গরম এখন, ভুলভাল বলিস না।”

কথাটা শুনতে স্বাভাবিক মনে হলেও, কোথাও যেন চরম নিষেধাজ্ঞার আভাস। হয়তো সতর্কবার্তা। চিত্রা মানলো না সেই সতর্কতা, কেবল তাচ্ছিল্য করে বললো,“চাঁদনী আপা, একটু আগে তোমার আম্মু বললো না বাহার ভাই বেঁজন্মা? সেই বেঁজন্মা মানুষটা কার সন্তান জানো? তোমার বাবার।”

ড্রয়িংরুমে ছোটোখাটো বোম্মা ফাটলো মনে হয়। আফজাল সওদাগর মুখ ঢেকে ফেললেন দুই হাতে। চাঁদনী ধমকে বললো, “চিত্রা!”কিন্তু চিত্রা থামলো না। একটু স্বার্থপর হলো সে। অনবরত বলে গেল বাহার ভাইয়ের জীবন বৃত্তান্ত। সবাই টান টান উত্তেজনা এবং অবাক ভাব নিয়ে শুনলো সেই বৃত্তান্ত। কারো পা কাঁপছে কারো বা

চিত্ত। এতদিনের পুষে রাখা ঐতিহ্য ভেঙে গেলে তো ব্যাথা হবেই। চিত্রা এক মনে বললো সবটা, কোনো বিরতি নেই, কোনো ক্লান্তি নেই। বাহার ভাইয়ের শরীর থেকে সব ধরণের কলঙ্ক যেন সে মুছে দিবে, পৃথিবীর বুকে বাহার ভাই কেবল উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবে। বাহার ভাইদের কোনো কলঙ্ক নেই। অনবরত দীর্ঘ এক বক্তব্যের পর

থামলো চিত্রা। তার পরিবারের লোক যেন সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে পাথর হয়ে গেছে। বড় চাচার মতন মানুষের অবহেলার জন্য আজ বাহার ভাই এবং তার পরিবারের এ দশা! চাঁদনী নিজেকে যথেষ্ট সামলে নিলো, মাহতাবের ঘটনার পর থেকেই মেয়েটা নিজেকে এখন সামলে নিতে শিখে গেছে। সে নিজের বাবার

দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে, অসহায় কণ্ঠে বললো,

“আব্বু জানো, মাহতাব আর তোমার মাঝে আজ কোনো পার্থক্য আমি খুঁজে পেলাম! অথচ এটা তো হওয়ার কথা ছিলো না।”

আফজাল সওদাগর কিছু বললেন না তবে ধমকে উঠলো রোজা সওদাগর। চাঁদনী সে ধমককে পাত্তা না দিয়েই বললো,“মাহতাব হয়তো

ইচ্ছেকৃত তার সন্তানকে মে°রে°ছে, নিজের হাতে। অথচ তুমি অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও নিজের সন্তানের খু°নি। তোমাকে যে মানুষটা ভালোবেসে, বুকে যত্নে আগলে রেখেও তোমার চরিত্রে তকমা না লাগিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তুমি সে মানুষটারও খু°নি। তুমি কীভাবে এত পাষাণ হলে আব্বু? আমার আব্বুর না নরম

মাটির দেহ ছিলো! মন তবে কেন এত পাথর হলো!”রোজা সওদাগর মানুষ হিসেবে যেমনই হোক, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে পরিপূর্ণ। তাই তো স্বামীকে এমন প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেখেও সে চুপ থাকতে পারলো না। তেড়ে এলেন মেয়ের দিকে, মেয়ের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে চিৎকার করে বললেন, “তুই কাকে প্রশ্ন করছিস? এই মানুষটাকে? যে তোদের সুখের জন্য

সারা দিন-রাত খেটে গিয়েছে! আমি দিচ্ছি তোর প্রশ্নের উত্তর, আমার কারণে তোদের বাবা ওদের কাছে যেতে পারে নি। কোন মেয়ে তার স্বামীর ভাগ দিতে পারে, বল? আমিও পারি নি তাই স্বামীর ভাগ দিতে। যখন জানলাম আমার স্বামী বাহিরে ঘর করছে মানতে পারি নি তখন। তবুও চুপ ছিলাম নিজের অক্ষমতার জন্য।বিবাহিত জীবনে

একটা সন্তানের মুখ দেখাতে পারি নি, আমার কী জোর খাটানো সাজে! কিন্তু যখন তুই হলি তখনই পেয়ে গেলাম তোর বাবাকে আটকানোর অ°স্ত্র। আমি জানতাম বাহারের মা যে প্রসব ব্যাথায় কাতরাচ্ছিল, কিন্তু আমি বলি নি। তুই স্বামীর ভাগ দিতে পারতি বল? সেই ছোটো বয়সে এ সংসারে হাল ধরেছি। সংসারের বেড়াকলে পড়ে ধীরে ধীরে

ননীর পুতুল থেকে কাঠের পুতুল হয়েছি, কিন্তু এ সংসার আমাকে কী দিলো বল?স্বামীটাও শেষ অব্দি বাহিরে সংসার পাতলো, মানতে পারতি তোরা? তোর দাদীর অত্যাচার সহ্য করতাম সন্তান নেই বলে, পাড়া-পড়শীর কটু কথা। কিন্তু দিনশেষে যদি তোর বাবা অন্তত আমার সাথে থাকতেন, তাহলে আমার আফসোস ফুরাতো। এই যে

যখন জানলাম চিত্রার জন্য তোর সন্তান টা বেঁচে নেই তখনও আমি আমার অতীতের সেই ভয় থেকে এমন করেছি। আমি তো জানতাম আমার হাসিখুশি সংসারে ভেতরের খবর। ভয় হচ্ছিল এই ভেবে যে আমার মতন না তোরও আবার এমন ভাবে পু°ড়°তে হয়। আমিও তো দিনশেষে মানুষ, কষ্ট আমারও তো হয়। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে

না, প্রকৃতি ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না। সেদিন ওদের অসহায় অবস্থার কথা জেনে চুপ ছিলাম আজ আমরাও একই জায়গায় দাঁড়ানো। হায়রে জীবন!”

কেউ আর কোনো কথা বললো না। একই অবস্থানে কেটে গেলো অনেকটা সময়। বার বার ধাক্কায় সওদাগর বাড়ির ভিত্তিটা বেশ নড়বড়ে হলো। আনন্দের বেলা

ফুরালো। প্রাণ গুলো আজ আধমরা! গভীর রাত। কুয়াশাময় আকাশ। শরীরের শীত কাপড় টা ভেদ করেও যেন শীতলতা ছুঁয়ে দিচ্ছে, যেমন করে দুঃখ ছুঁয়ে দেয় আমাদের। অহির হাতে ধোঁয়া উঠা কফির মগ। একটু খিদেও পেয়েছে তার। রাতের খাবার আজ কেউ খায় নি। এমন কথা শোনার পরও খাওয়ার ইচ্ছে ঠিক থাকে না। যে যার মতন মাথা

দিয়েছে নরম বিছানায়। কেউবা এমন অহির মতন আকাশে লিখেছে নির্ঘুম এক রাতের গল্প।

ধোঁয়া উঠা গরম কফির মগে চুমুক দিতেই ফোনের ভাইব্রেশনে ধ্যান ভাঙে অহির। ফোনের স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে উঠে 'নওশাদ' নামটা। কয়েক সেকেন্ড সেই নামটার দিকে তাকিয়ে থেকে কলটা রিসিভ করে অহি। সাথে সাথে ওপাশ থেকে নওশাদের

কণ্ঠ ভেসে আসে,“আমি জানতাম, আপনি ঘুমান নি।”

অহি আকাশের দিকে তাকিয়ে, কফির কাপে দ্বিতীয় চুমুকটা দিয়ে বললো,”কীভাবে?”

“আপনার মন খারাপ, তাই।”

“জানলেন কীভাবে?”

অহির প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক সাথে সাথে দিলো না নওশাদ। বরং বেশ খানিকটা সময় নিয়ে বললো,

“বিয়ের তারিখটা কী পিছিয়ে দিবো?”

নওশাদে প্রশ্নে কেমন অসহায়ত্বের সুর। খারাপ লাগলো অহিরও। লোকটা নিরেট ভদ্রলোক। আগাগোড়া ভালো মানুষ। এই ক্ষেত্রে অহি তার ভাগ্যের উপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। এতটা ভালোমানুষ তার জীবনে আসবে সে ভাবেই নি।

অহিকে চুপ থাকতে দেখে নওশাদ নিজেই বললো,“বাহার ভাই ফিরে আসুক, আমরা নাহয় তখন ধুমধাম করে বিয়ের সেলিব্রেশন করবো।”

অহি উত্তর দিলো না। পরিবেশ, পরিস্থিতির এ অবস্থায় বিয়ের অনুষ্ঠান টা বেমানান। অথচ বার বার এমন বিয়ে পিছিয়ে নিলে দেখতেও দৃষ্টিকটু লাগবে। নওশাদের পরিবারও বা কীভাবে নিবে বিষয়টা,

ভেবেই অহির বুক চিরে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস।

অহির ভাবনা হয়তো বুঝলো নওশাদ, দীর্ঘশ্বাসের আড়ালের কথা গুলো হয়তো পৌঁছে গেলো নওশাদ অব্দি। তাই তো সে তৎক্ষণাৎ বললো,“আশেপাশের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই আপনার। আপনি কেবল আপনার মনের কথা শুনুন বাকিটা আমি সামলে নিবো।

একদিন বৃষ্টিস্নাত রাতে একজন মানুষ বলেছিল ভালোবাসা নাকি মানসিক শান্তি। আমি তা আজ বুঝি। এই যে আপনার সাথে দু তিনটে কথা হয়, সেটাই আমার মানসিক শান্তি। আমি এভাবেও কাটিয়ে দিতে পারবো। আমার মানসিক শান্তিরও কিছু শান্তির প্রয়োজন তাই না? আপনি বরং সময় নিন।”

নওশাদের এমন স্নিগ্ধ কথায় মুগ্ধ হলো অহি। একটা মানুষের পরিপূর্ণতা কী? যখন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের তৃপ্তিতে খুশি হয়, তখনই একজন মানুষের পরিপূর্ণতা সেটা। আর নওশাদ নামের ছেলেটা পরিপূর্ণ। এই ছেলেটাকে ভালো লাগা থেকে এখনও ভালোবাসাতে আনতে পারে নি দেখে খারাপ লাগে অহির। তবে

ভালবাসা কী আর হাতের মোয়া? যখন তখন যাকে তাকে দেওয়া যাবে! অহি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলো,“আমি ভেবে জানাবো। রাখছি।”

নওশাদ আর কোনো বাক্যব্যয় না করে ফোনটা রেখে দিলো। এই মানুষটার মতন বোধহয় অহিকে আর কেউ বুঝতে পারবে না এই

জীবনে। এমন মানুষও পাওয়া ও ভাগ্যের ব্যাপার।

কফির কাপটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। অহি রুম ছেড়ে বের হলো। কফির কাপটা রান্নাঘরে রাখতে গিয়ে দেখে বাড়ির কাজের মেয়ে দোয়েলের শোবার দরজা খোলা। কৌতুহল বশত অহি উঁকি মেরে দেখে মেয়েটা ঘরে নেই। কপাল কুঁচকে আসে তার। অতঃপর

নজর যায় তাদের ড্রয়িংরুমের পাশে লাগোয়া ছাঁদের সিঁড়ির দিকে। ছাঁদের দরজাও খোলা! ছাঁদের দরজার দিকে তাকাতেই অহির বুকটা কেমন শূন্য শূন্য লাগে। বাহার ভাই বাড়ি ছাড়ার পর এত গুলো দিন ছাঁদে উঁকি দেওয়া হয় নি তার। মনের শূন্যতা মানা যায় কিন্তু স্মৃতির শূন্যতা মানা যায় না। ছাঁদে যখন গিয়ে দেখবে আগের মতন

চিলেকোঠার ঘরে হলুদ বাতিটা জ্বালানো নেই, কিংবা গিটারের টুংটাং শব্দ আসছে না তখন স্মৃতির দেয়ালে যে শূন্যতা তৈরী হবে, তা অহিকে জ্বালিয়ে দিবে। কিন্তু আজ এতদিন পর গুটি গুটি পায়ে ছাঁদের দিকে এগিয়ে গেল অহি। কিছুটা শূন্যতা কুড়ানো যাক নাহয়।ছাঁদের বা'পাশের দিকে লাইট জ্বলছে যা রীতিমতো পুরো ছাঁদটাকে

আলোকিত করার কাজ সম্পাদন করছে। ছাঁদের খষখষে, উঁচুনিচু মেঝেতে পা গুটিয়ে বসে আছে চিত্রা। তার সামনেই দোয়েল বসা। চিত্রার দিকে এক গ্লাস দুধ এগিয়ে দিয়ে কোমল স্বরে বললো,

“ছোটো আপা, খাইয়া লন না দুধটা।”

চিত্রা নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকালো দোয়েলের পানে, বিষন্ন স্বরে বললো,

“তোকে আমার জন্য দুধ আনতে কে বলেছে?”

“ক্যান, বাহার ভাইজান।”

দোয়েলে উত্তরে চমকানোর সাথে সাথে অবাকও হলো চিত্রা। বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“বাহার ভাই? বাহার ভাই তোকে কীভাবে বললো? মজা করছিস আমার সাথে? বিরক্ত করিস না তো।”

“মজা করুম ক্যান? আমি সত্যিই কইছি আপা। বাহার ভাইজানই বলছে আপনারে প্রতি রাতে এক গেলাস কইরা বাদামদুধ দিতে।”চিত্রার কুঁচকানো কপাল আরও কুঁচকে গেলো। অবাক ভাবটা তখনো তার চোখ-মুখে স্পষ্ট। সে আবার প্রশ্ন করলো,

“বাহার ভাই তোকে কখন বলেছে এটা?”

“আইজ ই বলছে। আপনি তো দুইদিন ধইরা জ্বরের লাইগ্যা দেহা করতে যাইতে পারেন না। তাই আইজ বাজার করার নাম দিয়া আমিই গেলাম। আপনার আব্বার থানাতেই তো তারে রাখছে। আমি যহন গেছি তহন চাচা থানায় ছিলো না। জানেন আফা, বাহার ভাইজানের লগে দেহা করার লাইগ্যা ঐ পুলিশ হাবিলদাররে আমার

পাঁচশো টাকা দেওয়া লাগছে। বাহার ভাইজান তো আমারে দেইখাই আপনার কথা জিজ্ঞাস করছে। আমি যখন কইলাম আফনি অসুস্থ তখনই আমারে হেই কইছিলো আপনারে যেন প্রতি রাইতে বাদাম দুধ খাইতে দেই।”ষোলো বছরের কিশোরী দোয়ালের কথা শুনে অবাক হলো চিত্রা। এতটুকু একটা মেয়েও কিনা বাহার ভাইকে দেখতে পাঁচশো টাকা

খরচ করেছে! চিত্রা ক্ষীণ হাসলো, কোমল কণ্ঠে বললো,

“তুই এতখানি টাকা খরচ করতে কেন গেলি? কই পেলি এত টাকা?”

চিত্রার কথায় চোখ বড়ো বড়ো করলো দোয়েল। তার যে পছন্দ হলো না কথাটা তা চোখে-মুখে ফুটে উঠলো। সে মুখ বাঁকিয়ে বললো,“আল্লাহ্, যামু না কেন? ভাইজান কত ভালো মানুষ। তারে

দেখার লাইগ্যা আমি পাঁচশো কেন, এর বেশিও দিতে রাজি। আম্মার ওষুধ কেনার লাইগ্যা যে টাকাটা রাখছিলাম, সেইখান থেইকাই দিছি। আম্মা এই মাসে একটা ওষুধ নাহয় কম খাইলো। জানেন আফা, ভাইজান প্রায়ই আমারে দুই তিন হাজার কইরা টাকা দিতো আম্মার ওষুধের লাইগ্যা। আর খালি কইতো ‘দোয়েল, দেখে রাখিস আম্মারে।

মনে রাখিস তোর বড় সম্পদ ঐ মানুষটা’। তহন তো বুঝতাম না ভাইজান ক্যান এমন কইতো, কিন্তু আইজ তো বুঝলাম মানুষটার মনে কী কষ্ট আছিলো। ভাইজান আমারে কত গুলান বইও আইন্যা দিছিলো আপা, কইছিলো আমারে পড়তে। পড়ালেহা করলে নাকি আম্মার দুঃখ মুছা যাইবো। হেই মানুষটা আইজ হেই অন্ধকার ঘরে কেমন কইরা

থাহে আপা? তার তো অনেক কষ্ট হয় তাই না কন? ভাইজানরে আপনে ফিরায় আনবেন তো? কন?”শেষের কথা গুলো বলতে বলতে ষোড়শী কন্যা দোয়েল ঠোঁট ভেঙে কেঁদে দেয়। সিঁড়ির কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা অহির চোখেও অশ্রু আসে কেবল কাঁদে না চিত্রা। চোখ ভরে দেখে দোয়লকে। একটা ছন্নছাড়া মানুষ পুরো পৃথিবীর বুকে

কেমন মায়া ঢেলে দিয়ে গেছে? মানুষটা নাকি ভালোবাসতে জানে না! মানুষটার মতন অমন করে ক’জনই বা ভালোবাসতে পারে!

চিত্রা দোয়েলের মাথায় হাত বুলিয়ে স্বান্তনার স্বরে বললো,

“কাঁদিস না দোয়েল, তোর ভাইজান ফিরে আসবে। আমি তো আছি তাই না বল? তুই আমার উপর বিশ্বাস রাখিস না?”দোয়াল টলমলে অশ্রু

চোখে এবং মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে বলে,

“আপনার উপরই এখন আমার ভরসা, আপা।”

চিত্রা কেবল মলিন হাসে। দূর হতে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা অহিও ক্ষীণ স্বরে বলে,

“আমিও তোর উপর ভরসা করে আছি চিত্রা। ফিরিয়ে আনিস তাকে।”

অতঃপর সে ফোনের স্ক্রিন অন করেই ক্ষুদে বার্তা পাঠালো নওশাদের ফোনে ‘বিয়েটা তারিখ অনুযায়ীই হবে।’

একটা রাতের আকাশে কত গুলো মানুষের হৃদয় উজাড় করা বিশ্বাস। পাওয়ায় আকাঙ্খা ভেসে বেড়াচ্ছে, পূর্ণতা পাওয়ার অপেক্ষায়।আজ বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো চিত্রার। শীতের কুয়াশা-মাখানো আকাশেও

রৌদ্রের উত্তাপ। বুঝাই যাচ্ছে দুপুর ঘনিয়েছে। চিত্রা দ্রুত উঠলো। সারা রাত মাটিতে শুয়ে থাকার ফলে পিঠ ব্যাথা হয়ে গেছে। কয়েকদিন যাবত অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগেছে। রাত হলেই শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। বুক ব্যাথা করে। এমন দিনের পর দিন মেঝেতে ঘুমালে ঠান্ডা তো লাগবেই, তাও আবার শীতকাল। মুনিয়া বেগম এর জন্য একদিন অনেক

রাগারাগিও করেছেন। চিত্রা কেবল এতটুকু বলেছে, ‘আমার বাহার ভাইয়েরও আজ এমন শীতল মেঝেতে ঠাঁই হয়েছে, সে পারলে আমি কেন পারবো না?’ মুনিয়া বেগম মেয়েকে আর কিছু বলতে পারলো না। কথা গুলোর গভীরতা যে অনেক।

শরীরে এমন গা কাঁপানো জ্বর নিয়েও ঠান্ডা পানিতে গোসল করলো

চিত্রা। শরীর বেশ শৌখিন একটা বস্তু। এটাকে আরাম দিলে ননীর পুতুল হবে, আরাম না দিলে কাঠের পুতুল। এর সাথে এত কোমলতা দেখানোর কিছুই নেই।গোসল সেড়েই ঝটপট তৈরী হয়ে নিলো সে। আজ কোর্টে হেয়ারিং আছে। বাহার ভাইয়ের কেইস টা দ্রুতই কোর্টে উঠছে। কিন্তু উকিল না পাওয়ার কারণে ঘুরে-ফিরে বারবার

সময় দেওয়া হচ্ছে বাহার ভাইকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো লাভ হচ্ছে না। প্রমাণ সব বাহার ভাইয়ের বিপক্ষে। কেইসটাকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে দোষী মনে হচ্ছে তাকেই। মেয়েটিকে যে অ°স্ত্র দিয়ে মা°রা হয়েছে সেটাতেও বাহার ভাইয়ের আঙ্গুলের ছাঁপ। অথচ বাহার ভাই ছু°ড়িটা বের করার জন্য ধরেছিলেন। মেডিকেল রিপোর্টও

বাহার ভাইয়ের বিপক্ষে তুমুল টাকার কাজ যে এটা তা আর বুঝতে বাকি নেই কারো। আর এত দ্রুত কেইসটা চলার পেছনেও যে বিরাট হাত আছে তাও সবাই জানে। এসব ভেবেই হতাশার শ্বাস ফেলে নিচে নেমে এলো চিত্রা। রান্নাঘরে তখন দোয়েল আর বড় চাচী রান্না করছে। চাচীর চোখ-মুখ স্বাভাবিক। গতকাল যে এতকিছু হলো তার কোনো

প্রভাবই তার চোখে-মুখে নেই। গম্ভীর চোখ-মুখ।

চিত্রা বাহিরে যেতে উদ্যোত হতেই দোয়েল রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে। ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বলে,“আপা, খাড়ান না।”

চিত্রা দাঁড়ালো। ব্যস্ততা মেশানো কণ্ঠে বললো,

“কী হয়েছে? তাড়াতাড়ি বল। দেরী হচ্ছে।”

দোয়েল নিজের হাতের টিফিন বক্স টা চিত্রার হাতে দিতে দিতে বললো,
“ডিমসহ বড় বড় ইলিশ মাছের টুকরা বেগুন আলু দিয়া ঝোল করছি আর সাদা গরম ভাত। ভাইজানের তো অনেক পছন্দ। কতদিন মানুষটা ভালোমন্দ খায় না। নেন, উনারে দিয়েন।”
চিত্রা টিফিন বক্স টা নিতে নিতে সন্দিহান কণ্ঠে বললো,

“মাছ কে এনেছে? রেঁধেছে কে?”
চিত্রার প্রশ্নে আমতা-আমতা করলো দোয়েল। পরক্ষণেই তাড়াহুড়ো করে বললো,
“আপনার না দেরী হচ্ছে আপা? যান যান। সব ভালো হবে দেইখেন।”
চিত্রাও আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। দোয়েল রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসি দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললো।মানুষের

পরিপূর্ণ হৈচৈ কোলাহলে ভরা কোর্টের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো চিত্রা। আশেপাশে তাকাতেই দেখলো, বড় দালানের কিনারায় বেঞ্চিতে বসে আছে বাহার ভাই। চিত্রা দ্রুত পায়ে সেখানে গেলো। পুলিশের পোশাকে থাকা নিজের বাবাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো চিত্রা। কোনোরকম অনুমতি না দিয়ে সে বসে পড়লো বাহার ভাইয়ের পাশে। নুরুল

সওদাগর কিছু বললেন না। বরং কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন।
চিত্রাকে দেখেই মলিন হাসলো বাহার। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,
“শরীর কেমন?”চিত্রা এই ভেঙে যাওয়া বাহার ভাইকে দু-চোখ ভরে দেখলো। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেশ নরম স্বরে বললো,

“আপনি চিন্তা করবেন না, আমাদের ঠিক একটা গতি হয়ে যাবে।”

চিত্রার কথায় হাসলো বাহার। মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,

“ভেঙে পড়ছো কেনো? তোমাকে ভালো থাকতে হবে। তুমি ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো।”

চিত্রার কান্না এলো দু-চোখ ভরে। ঠোঁট চেপে কান্না আটকানোর চেষ্টা চালালো। তবে চোখের জল যে

বরাবরই অবাধ্য। সে তার নিজ গতিতে ঝরে পড়লো। বাহার মিছি মিছি রাগ দেখালো, মিছে ধমক দিয়ে বললো,

“কাঁদছো কেন? একদম এখান থেকে ফেলে দিবো।”

বাহারের ধমকে ফিঁক করে হেসে দিলো চিত্রা। তার ঐ হাসি হাসি মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে মোহনীয় কণ্ঠে বাহার ভাই

বললো,“তোমার আর আমার সংসার হলে খারাপ হবে না বলো? দু চারদিন তোমার হাসি দেখে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তাই না?”

চিত্রার হাসি হাসি মুখটা কেমন চুপসে এলো। বিবশ কণ্ঠে বললো, “আমাদের একটা সংসার হলে, আমি পৃথিবীর সকল স্বা°র্থপরতা ভুলে যেতাম বাহার ভাই।”

“পৃথিবী কোথায় স্বা°র্থ°পর? সে তো তার জায়গায় ঠিকই আছে। আমরাই বরং কিছু নিয়ম মানতে পারি না। তবে মানিয়ে নেওয়াটাই উচিত।”

চিত্রা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ক্ষীণ স্বরে বললো,

“খাবার এনেছি। খাইয়ে দেই?”

“আমার কাছে অনুমতি না দিয়ে নিজের বাবার কাছে নেও। কারণ আমি তার দায়িত্বে।”

না চাইতেও চিত্রা নিজের বাবাকে ডাক দিলো,

“স্যার?”নুরুল সওদাগর কিঞ্চিৎ চমকালেন। প্রায় আঠাশ দিন পর মেয়েটা তাকে ডাকলো তাও অন্য কোনো নামে! সেদিন রাতের সেই আহাজারির পর থেকে মেয়েটা আর তাকে ডাকে না। কেমন গম্ভীর হয়ে থাকে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নুরুল সওদাগর উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ?”

“আপনাদের আসামীর জন্য বাড়ি থেকে খাবার এনেছি। খাওয়াতে পারবো? নাকি মুখের খাবারও কেঁড়ে নিবেন?”

শেষের কথাটাই তুমুল তাচ্ছিল্য। নুরুল সওদাগর তা গায়ে মাখলেন না। বরং ধীর কণ্ঠে বললেন,

“পারো।”অনুমতি পেতেই চিত্রা হাত ধুয়ে ভাত মাখালো। বেশ আয়েশ করে এক লোকমা তুলে দিলো বাহারের মুখে। বাহার ভাইয়ের চোখ গুলোতে তখনও টলমলে অশ্রুর চিলিক। তা দেখে চিত্রারও কান্না এলো কিন্তু সে শব্দ করে কাঁদলো না। নিরবে বিসর্জন দিলো অশ্রুকণা। দূর থেকে এমন দৃশ্য দেখে অবাক নয়নে পথচারীরা চাইলো। কোর্টের

বামপাশে চায়ের দোকানের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা অহি এবং অবনী বেগমও দেখে কাঁদলেন কিছুটা। নুরুল সওদাগর আরেকটুখানি দূরে সরে গেলেন। ছেলেমেয়ে গুলোর এমন দৃশ্য কত মানুষ চোখ মেলে দেখলো।

অবশেষে শেষ মুহূর্তে নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলো না চিত্রা। বাহার ভাইয়ের গলা জড়িয়ে হাউমাউ

করে কেঁদে উঠে বললেন,“আমাদের একটা সংসার হলে খারাপ হতো না, বাহার ভাই। তবুও কেন বিধাতার এমন বিধান?”

“খুব ভালো কিছু যে হতে নেই রঙ্গনা।”

মানুষ দেখলো দু’জনের হাহাকার। কেউ কেউ চোখের জল মুছলো। বিচ্ছেদে এত ব্যাথা কেন!বাহিরে উতলা মন নিয়ে অপেক্ষারত চিত্রা।

টানটান উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছে মন। কোর্টের ভেতরে যায় নি সে। কী হবে, কী হবে না ভেবেই আর যাওয়া হয় নি। আজ নাকি কেইসের শেষ শুনানি। এরপর হয়তো বদলে যাবে সব। ভয়, আশংকায় তরতর করে চিত্রার গায়ের তাপমাত্রা বাড়লো। অস্থির পায়ে পায়চারী করলো সে।

তন্মধ্যেই কোর্ট থেকে অহি আপা, ছোটো চাচী বেরিয়ে এলেন। চিত্রার হৃৎপিণ্ডের গতি যেন আকাশ ছুঁয়েছে। হাত-পা কাঁপছে তার। তবুও সে কোনোমতে ছুটে গেলো তাদের দিকে। অস্থির চিত্তে অনবরত প্রশ্ন করলো,

“কী হয়েছে অহি আপা? চাচী, কী বললো ওখানে? আরেকটু কী সময়

দিয়েছে আমাদের? ভালো কিছু কী হয়েছে?”

অহি আপা এবং চাচীর মুখ থমথমে। অবনী বেগম চিত্রাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে উৎকণ্ঠিত গলায় বললো,“আল্লাহ্! তোমার তো শরীরে অনেক জ্বর! বাড়ি চলো তাড়াতাড়ি।”

চিত্রা বিরক্ত হলো। বেশ উচ্চস্বরে বললো,

“ভেতরে কী হয়েছে চাচী? বলুন না।”

“ডিসেম্বরের বিশ তারিখ, বাহার ভাইয়ের ফাঁ° সি।”

চিত্রা যেন কিছুটা সময়ের জন্য থমকে গেলো। কণ্ঠধ্বনিতে আটকে গেলো,শব্দরা। কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বললো,

“তুমি মজা করছো, আপা?”

চিত্রার প্রশ্নে ডানে-বামে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কেঁদে দিলো অহি। চিত্রা অনবরত পাগ°লের মতন ডানে-বামে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো,

“না, না। আমার বাহার ভাইয়ের সাথে আমার অনেক গুলো বছর বাঁচা বাকি। না আপা, তুমি কী বলছো! এটা কী বললে তুমি।”

অশান্ত চিত্রাকে সামলানোর আগেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে এলো বাহার ভাই। দু'হাত মেলে ধরে ডাক দিলো,"রঙ্গনা।"

চিত্রা চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকালো বাহার ভাইয়ের পানে। বাহার ভাইয়ের হাতের দিকে তাকিয়ে ছুটে গেলো সেদিকে, কিন্তু যেই মুহূর্তে সে বাহার ভাইয়ের বুক পাজরে মুখ লুকাবে,

ঠিক সেই মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নিলো বাহার। মুচকি হেসে বললো,

“এই বুকে যে তোমাকে ঠাঁই পেতে দিলো পৃথিবী। পরজন্মে নাহয় লুটিয়ো হেতায়।”

চিত্রা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বাঁধ ভাঙলো কান্নার। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললো,

“এটা তো হওয়ার কথা ছিলো না, বাহার ভাই। এটা তো কথা ছিলো

না। আপনি কথা ভাঙছেন কেন? এটা তো কথা ছিলো না।”

বাহার ভাই অশান্ত চিত্রাকে দেখলো। ততক্ষণে সেই মানুষটার চোখের কোণ ঘেঁষে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। মুখে লেপ্টে আছে মায়াবী হাসি। মোহনীয় কণ্ঠে সে বললো,“ভেঙে পড়লে হবে, বলো? তোমার তো এখন অনেক দায়িত্ব। বাহার ভাইয়ের অসম্পূর্ণ কাজ গুলো পূরণ

করবে না? তোমার বাবার কাছে নূপুর জোড়া গচ্ছিত আছে। যেদিন আমাকে পৃথিবী ছাড়ার হুকুম দিয়েছে, সেদিন নাহয় সেই নুপুর জোড়া আমার বোনের কবরে রেখে দিয়ে এসো। রাখবে না বলো?”

চিত্রা জোর করে নিজের মাথাটা চেপে ধরলো বাহার ভাইয়ের বুকে, অভিযোগে স্বরে বললো,

“ও বাহার ভাই, বাহার ভাই, এমন করছেন কেন? আপনি জানেন না অষ্টাদশী আপনাকে ছাড়া থাকতে পারে না? আপনি তো এত নিষ্ঠুর না, বাহার ভাই। তবে কেন কষ্ট দিচ্ছেন আমাকে? আপনারে ছাড়া আমি কেমন করে থাকবো বলেন? পারবো না আমি। আমার বুকের ভেতর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে জানেন? আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আপনি

ছেঁড়ে গেলে আমি বাঁচতে পারবো না, বাহার ভাই। অষ্টাদশীর বুকের মাঝে এমন ভাবে এক্কা-দোক্কা খেলে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটতে পারলেন বলুন। আপনারে ছাড়া বাঁচবো না যে।”“বাঁচবে রঙ্গনা। পৃথিবীতে একটা তিক্ত সত্যি কী জানো? আমরা মানুষ হারিয়েও বাঁচতে পারি। প্রকৃত পক্ষে আমাদের যা মনে হয় তা বাস্তবে ঘটে না।

আমরা মানুষ, নীল তিমি নই যে সঙ্গী হারানোর শোকে ম°রে যাবো। কিংবা কাকের মতন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবো। আমরা হলাম গিয়ে মানুষ, আর আমাদের মানুষ ভুলে বেঁচে থাকার অদম্য শক্তি আছে। তুমি সামলে নেও নিজেকে রঙ্গনা। মনে রেখো,তুমি ভেঙে পড়ো না এভাবে,

কেউ থাকে না চিরদিন সাথে।

রঙ্গনা, তোমার সংসার করার স্বপ্ন পূরণ হোক। আমার সাথে নাহয় না হলো, অন্য কারো সাথে পূরণ হোক। আমাদের অযাচিত বিচ্ছেদ ভুলে খুশি হও তুমি।

❝তোমার একটা সংসার হোক, অল্প বিস্তর ভালোবাসার নামে,
আমায় তুমি খুঁজে নিও, পরিচিত কোনো ডাকনামে।❞

বাহার ভাইয়ের মুখে মায়াবী হাসি, রঙ্গনার গগন ফাঁটানো চিৎকার, ” বাহার ভাই কথা রাখে নি, আল্লাহ্। বাহার ভাই কথা রাখে নি।”কথায় আছে, সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। শীতের রিক্ততা নিয়ে নভেম্বর মাস বিদায় নিয়েছে। তার মাঝে বাহার ভাইয়ের কেইসটা আবারও দু একবার কোর্টে উঠেছিল কিন্তু ফলাফল সেই আগের

জায়গাতেই। চিত্রার শরীর ধীরে ধীরে অনেকটা ভেঙে গিয়েছে। শরীর জুড়ে ভর করেছে অসুস্থতা। তবুও রোজ নিয়ম করে থানায় যায়, রোজ রোজ দেখা হয় না বাহার ভাইয়ের সাথে তবুও সে বসে থাকে। সারাদিন গিয়ে যখন সন্ধ্যা নামে প্রকৃতির বুকে তখন ক্লান্ত পায়ে সে বাড়ির দিকে চলে আসে। এর মাঝে দু একবার সেই

রাজনৈতিক নেতার সাথে কথাও হয়েছে চিত্রার তবে আর বিশেষ কোনো লাভ নেই। সুখের বেলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে চিত্রার জীবনে। সময়টা উনিশেই ডিসেম্বর। সওদাগর বাড়ি কৃত্রিম আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আগামীকালই অহি আপার বিয়ে। বিয়েটা আর পেছানো হয় নি। জীবনকে জীবনের ধারা অনুযায়ী চালিয়ে নিতেই হবে সে

যতই কষ্ট হোক না কেন। সন্ধ্যার আমেজ তখন প্রকৃতিতে, শীতটাও মাখো মাখো হয়ে এসেছে। ছোটো চেরি, অয়ন ছোটোছুটি করছে ড্রয়িংরুম জুড়ে সাথে আত্মীয় স্বজনের সাথে আসা তাদের বয়সী বাচ্চারা। রান্নাঘরে তুমুল রান্নার আয়োজন। মিঠে আওয়াজে সাউন্ড বক্স বাজছে ছাঁদে। মানুষ হারানো শোকটাকে লুকিয়ে সবাই ই কৃত্রিম

আনন্দ দেখাচ্ছে। আফজাল সওদাগর প্রায় শয্যাশায়ী। অসুস্থতা লেগে আছে কত গুলো দিন যাবত। সেই জন্যই এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ের আয়োজন। ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের সে একটু বেশিই ভালোবাসেন। জীবনে হয়তো অনেক খারাপ কাজ করেছে কিন্তু যাকে ভালোবাসা দিয়েছে তার প্রতি কোনো ক্ষেত্রেই সে কৃপণতা করে

নি।সাজগোজে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত অহি। তাকে টুকটাক এগিয়ে দিতে ব্যস্ত চাঁদনী আপা। গায়ের হলুদের অনুষ্ঠানে সকলে হলুদ রঙেরই জামাকাপড় পড়েছে। হলদিয়া রঙে রঙিন আজ সওদাগর বাড়ি। অনেক গুলো দিন পর মিছে আনন্দ হলেও হচ্ছে তো কিছু ভালো। চাঁদনী আপা তার হাতের কালো ক্লিপ টা অহির মাথায় গুঁজতেই লতা বেগম ধীর

গতিতে হাজির হলেন সে ঘরে। নিজের শাশুড়ীকে দেখে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেলো চাঁদনী, চিন্তিত কণ্ঠে বললো,

“মা, উঠছেন কেন? কিছু প্রয়োজন হলে ডাক দিতেন আমাকে। হাঁটু ব্যাথা কমেছে আপনার?”

লতা বেগম বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষীণ হেসে বলে,“কত আর ভালো লাগে বলো শুয়ে থাকতে?

বিয়ে বাড়িতে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না তাই একটু হাঁটাহাঁটি করতে এলাম। সাজাচ্ছো নাকি ওকে?”

চাঁদনী কাঠের চেয়ার টা এগিয়ে এনে শাশুড়ীকে সযত্নে বসিয়ে দিতে দিতে বললো,

“হ্যাঁ, মা। মেয়েটা তো সাজগোজ কিচ্ছুটি পারে না। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকলে কীভাবে

পারবে বলুন তো? তাই সাজিয়ে দিচ্ছি।”

“আজ তুমিও নাহয় একটু সেজো।”

শাশুড়ীর কথায় চাঁদনীর হাসি হাসি মুখটা ক্ষাণিক চুপসে এলো। হাসিটা কেমন চলে যাবে যাবে ভাব, তবুও ক্ষীণ হাসি ধরে রেখে বললো,

“এইতো, আমার সাজার আর কি আছে, যেমন আছি তেমনই থাকি।”

“কার জন্য কষ্ট পাচ্ছো তুমি? যে তোমার কষ্টের কোনো দাম দেই নি, ভাবে নি তোমার কথা, তার জন্য কষ্ট পাচ্ছো!”

“মা, থাকুক না সেসব।”কথাটা বলতে বলতে দু’ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো চাঁদনীর চোখ বেয়ে। লতা বেগম কোমড় ব্যাথা নিয়ে উঠে গেলেন। চাঁদনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

“কাঁদছো কেন! কেঁদো না। কান্নার অপমান তোমার চোখে শোভা পায় না। জানো, বেশ প্রাপ্ত বয়সেই আমি বিয়ে করেছিলাম। তারপর তো তোমার শ্বশুর মা°রা গেলেন। আমি ঘূনাক্ষরেও তার জন্য তোমার বাবাকে দ্বায়ী করি নি। দোষ তো মানুষ মাত্রই হয়। সন্তান সামলাতে আমার কষ্ট হতো না, একাই হয়তো আমার ছেলেটাকে মানুষ করতে

পারতাম কিন্তু বিধবা হাতে সমাজ চালানো যে অনেক কষ্টের। না পেরে দ্বিতীয় বিয়েটা করলামই। উনি মাহতাবকে ভীষণ ভালোবাসতেন, আমি কখনো বুঝতেই পারি নি মাহতাব এভাবে ভেঙে পড়েছে ভেতর ভেতর, তাহলে আমি কখনোই এ কাজটা করতাম। একটা বার যদি বুঝতাম আমার ঐ শান্ত ছেলেটা মানতে পারে এসব তাহলে

ওর শৈশব টা আমি আরও সুন্দর করার চেষ্টা করতাম। মা হিসেবে তো আমি ব্যর্থ। কোথাও না কোথাও সবকিছুর জন্য আমিই দ্বায়ী। আমি আরেকটু সচেষ্ট থাকলে এত গুলো প্রাণ আজ এমন হাহাকারে পুড়তো না। আমায় তুমি ক্ষমা করো মা।”

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ মহিলার চোখ বেয়েও গড়িয়ে পড়লো অশ্রুকণা। চাঁদনী মুখ ডুবালো

শাশুড়ীর বক্ষ মাঝে। মানুষটা বেশ শক্তপোক্ত ধরণের ছিলেন কিন্তু একটা ঘটনা মানুষটাকেও কেমন ভেঙে দিয়েছে!

লতা বেগম চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন,“এই পুরো দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই। আমার ছেলের এমন ঘটনার পরও তুমি আমার অনেক যত্ন করেছো। আমি আমার শেষ সময়টাতে তোমার

ভরসায় আরামে কাটাতে চাই। আমি তোমাকে জোর করবো না বিয়ে করতে, তোমার জীবনে তুমি যেটা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, ঠিক সেটাই করবে। তোমার বোনের কাল বিয়ে, ওর বিদায়ের পর পর আমরাও চলে যাবো নিজেদের বাসায় কেমন? মা-মেয়ের একটা ছোটো সংসার হবে। অনেক গল্প করবো, বৃষ্টি এলে দু'জন ছুটে চলে

যাবো ছাঁদে, ভিজে চুপচুপে হয়ে বাসায় আসবো, দু’জনের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠবে যখন, তখন আমরা দু’জন দু’জনকে বকে দিবো। তুমিও একা, খুঁটি নেই তোমার। বিয়ের পর বাবার বাড়ি কেবল আত্মীয়ের বাড়ির মতন। তুমি এই মায়ের সাথে আমাদের দু’জনের বাড়িতে থাকবে। তুমিও একা আমিও একা, আমরা দু’জন দু’জনের সঙ্গী হবো। কে

বলেছে বেঁচে থাকতে হলে অনেক মানুষ দরকার? দিনশেষে বুক শীতল হওয়ার মতন একজন মানুষ হলেই যথেষ্ট। যাবে না বলো আমার সাথে?”চাঁদনী এই ষাটোর্ধ্ব মহিলাটাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, “যাবো, মা।”

অহি কেবল চুপ করে দেখলো সবটা। আনন্দ অশ্রু দু এক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো তার গাল বেয়ে। হুট

করে তার মনে হলো, অনেকদিন এমন করে সে মায়ের বুকে মাথা রাখে না। কত গুলো দিন মা বলে ডাক দেয় না। আর কত অভিমান পুষে রাখবে মনে। জীবনটা তো বড্ড ছোটো, মান অভিমান করে কাটিয়ে দিলে জীবনটা যে আর উপভোগ করা যাবে না। হলুদ শাড়ির কুঁচিটা হাতের ভাঁজে চেপেই অহি ছুটে গেলো মায়ের কাছে।

একবার নাহয় শৈশবে ফেরা যাক। মায়ের বুকের মাঝে একবার নাহয় স্বর্গ খোঁজা যাক।

অবনী বেগম সবে নিজের ঘরের আলমারি থেকে গয়নার বক্স বের করে রাখছিলেন। মেয়েটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তো অন্যের বাড়ি পাঠাতে হবে। মা হয়ে তো সে মেয়েটাকে কম অবহেলা করে নি, পরের মা নাহয় তাকে আগলে রাখলো।

ভাবনার মাঝেই অহি কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লো অবনীর বুকের মাঝে। অবনী বেগম অসাবধনতা বশত পিছিয়ে গেলেন দু’পা। শক্ত করে আলমারিটা চেপে ধরে নিজের অবস্থান ঠিক করলেন। অতঃপর হলুদিয়া পাখির ন্যায় নিজের মেয়েকে বুকের মাঝে লুটিয়ে পড়তে দেখে অবাক দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কেমন নিজের

চোখকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না সে এরকম দৃশ্যটা। কত গুলো দিন পর মেয়েটা এমন ভাবে বুকের মাঝে এসে পড়লো! ঠিক কত গুলো দিন না, কত গুলো বছর পর এমনটা হলো তা মনে নেই অবনী বেগমের। সে কেমন ঘোরে চলে গেলেন! কিন্তু যখন সে অনুভব করলো অহি কাঁদছে তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। আদুরে হাতে মেয়েকে

আঁকড়ে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,“কী হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন? অহি? কেউ কিছু বলেছে?”

মায়ের এমন আদুরে ছোঁয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক অহি কেমন বাচ্চা হয়ে গেলো। মায়ের বুকে মাথা রেখেই ক্রন্দনরত স্বরে বললো,

“তোমাদের ছেড়ে যাবো ভাবলেই আমার কষ্ট লাগে, আম্মু।”

অবনী বেগম স্মিত হাসলেন। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

“ছেড়ে কোথায় যাচ্ছো! আমাদের তো তুমি তোমার বুকের মাঝে পুষে রেখে নিয়ে যাচ্ছো। এটাকে কী আর ছেড়ে যাওয়া বলে?”

অহি মাথা নাড়ালো কিন্তু কোনো কথা বললো না আর। অবনী বেগমও খুব গোপনে শ্বাস ফেললেন। যাক, অবশেষে কিছুটা প্রাপ্তি তার

খাতাতেও এসে যোগ হলো।হলুদ শাড়ি টা সাদামাটা ভাবে শরীরে জড়িয়ে থানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। শরীরটা আগের মতন তত গোলগাল নেই। শুকিয়ে গেছে খুব। পিঠের চুল গুলো এখন প্রায় কোমড়ের কাছাকাছি। এতদিন খেয়াল করে নি সে। আজ চুলে হাত দিয়ে হঠাৎ করে চুলের এই অগাধ পরিবর্তন দেখে সে বেশ অবাক

হলো। নিজের প্রতি কতটা ছন্নছাড়া হলে দেহের পরিবর্তন গুলোও চোখে লাগে না! নিজের কথা ভেবেই একটা আফসোসের শ্বাস বেরিয়ে এলো। নিজের প্রতি নিজের খুব মায়া হলো, আহারে জীবন!বরাবরের মতনই থানার বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা। অনেক আকুতি মিনতি করার পরও তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। সে তবুও ঠাঁই দাঁড়িয়ে

রইলো বাহিরে। আজ নুরুল সওদাগর থানায় নেই, কোথাও একটা গিয়েছে। তাই বাহার ভাইয়ের সাথে দেখা করাটা আরও কঠিন হয়ে গেছে। চিত্রা তবুও দাঁড়িয়ে রইলো। তন্মধ্যেই পুলিশের জীপ গাড়িটা এসে থামলো থানার সামনে। তুমুল শব্দ তুলে এসেছে সেটা। চিত্রার দৃষ্টি গেলো সেখানে। নুরুল সওদাগর ব্যস্ত পায়ে নেমে দাঁড়ালো গাড়ি

থেকে। গাড়ীটা সাইড করতেই সে ব্যস্ত পা চালিয়ে থানায় প্রবেশ করতে নিলেই চিত্রাকে দেখে থেমে যায়। অবাক কণ্ঠে বলে,“তুমি এখানে কেন?”

“দেখা করতে এসেছি বাহার ভাইয়ের সাথে।”

নুরুল সওদাগর একবার নিজের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন। রাত আটটা দশ বাজে। এতক্ষণে বোধহয়

বাড়িতে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে কিন্তু মেয়েটা সব ছেড়ে ছুঁড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হতাশার শ্বাস ফেললো নুরুল সওদাগর। শান্ত কণ্ঠে বললো,

“আগামীকাল ওর ফাঁ° সি। আজ তো আর দেখা করার নিয়ম নেই। এটা আইনবিরোধী।”

“কত কিছুই তো আইনবিরোধী হয়, তবুও তো মানুষ সে কাজ গুলো

করে। তবে আজ নাহয় আপনিও একটু করুন।”

নুরুল সওদাগর আর কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলেন, তার একটু পরই একজন কনস্টেবল এলেন, রাশভারী কণ্ঠে বললেন,“তুমি কী চিত্রা?”

চিত্রা যেন আশার আলো দেখলো। সে ভাবলো আব্বু হয়তো পারমিশন দিয়েছেন, এই হয়তো তাকে ভেতরে

যেতে বলবে। কিন্তু তার ভাবনাকে হতাশায় ভরিয়ে দিয়ে কনস্টেবল গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“বাহার ছেলেটার কাল ফাঁ° সি। তাই আজ আর তাকে কারো সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে না।”

চিত্রার চোখে টলমলে অশ্রুর ভীড় দেখা দিলো। ভীষণ অসহায় কণ্ঠে বললো,

“স্যার, একটা বার দেখা করতে দিন। এই যে দেখছেন না আমি সেজেছি, তা আমার বাহার ভাইকে দেখাবো। একটা বের একটু কথা বলবো। দেন না।”“মা, তুমি বাসায় ফিরে যাও। বড় স্যার নির্দেশ দিয়েছে যেন দেখা করতে দেওয়া না হয়।”

চিত্রার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা মুক্তোর মতন অশ্রু ঝরে পড়লো। বিবশ কণ্ঠে বললো,

“স্যার, আপনার বড় স্যারকে বলে দিবেন, কখনো যদি আমি মা°রা যাই, তবে সেটা সবার কাছে মৃত্যু হলেও আমার কাছে হবে খু°ন। বাবা নামক লোকটা আমাকে বাঁচাতে দিলো না।”

কনস্টেবল অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো চিত্রার দিকে। চিত্রার চোখে তখন অশ্রুদের বর্ষণ। লোকটার বোধহয় মায়া হলো মেয়েটার জন্য, রোজ রোজ এমন কান্না করতে দেখে মেয়েটাকে। দেখা হবে না জেনেও প্রায় সময় ঠাঁই বসে থাকে এই থানার সামনে। কেমন একটা উন্মাদনা মেয়েটার মাঝে! চিত্রা চলে যেতে নিলে ক্ষীণ স্বরে ডাক দেয়

কনস্টেবল। চাপা স্বরে বলে,“অনেক ভালোবাসো তাই না ছেলেটাকে?”

চিত্রার বাঁধ ভেঙে কান্না আসে। ঠোঁট চেপেও সংবরণ করতে পারে না সেই কান্নার স্রোত। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে দেয় সে, কেমন আহাজারি করে বলে,

“তারে ছাড়া আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয় না যে, স্যার। এতখানি ভালোবাসি। আজ কত গুলো দিন

আমি ঘুমাতে পারি না, কোনোরকমের বেঁচে থাকা যাকে বলে। তাকে যে আমার লাগবে, খুব করে লাগবে স্যার।”

বয়স্ক লোকটার মুখেও কেমন ব্যাথার ছাপ। চিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে বললো,

“তোমাদের মতন বড় বড় লোকেদের মেয়েদের এমন মধ্যবিত্ত ছেলেদের মায়ায় আটকাতে নেই,

মা। দু’জনকেই তখন কষ্ট সহ্য করতে হয়। কেন যে তোমরা বুঝো না।”“বুঝ দিয়ে কী আর ভালোবাসা হয়, স্যার!”

লোকটা তাকিয়ে রইলো এই অষ্টাদশী মেয়েটার দিকে। যার চোখে মুখে কেমন বেদনার হাহাকার। বড্ড মায়া হলো। কিন্তু মেয়েটার বাবারই কিনা একটুও মায়া হয় না! এত পা° ষা°ণ কীভাবে হয় মানুষ! দীর্ঘশ্বাসে

ভারী হলো প্রকৃতি, করুণ স্বরে লোকটা বললো,

“আর তো আজকের রাতটা, আম্মু। এরপর তুমি চাইলেও আর তোমাদের দেখা হবে না। তখন কীভাবে থাকবে?”

চিত্রার কান্না হঠাৎই থেমে যায়। কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে বলে,

“একসাথে থাকবো কথা দিয়েছি যে, স্যার! তাহলে আলাদা হই কেমন

করে? এই পৃথিবী আমাদের সুখ দেখতে পারে নি, ঐ জগৎ নিশ্চয় এত স্বা°র্থপর হবে না, তাই না?”বৃদ্ধ লোকটা তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। এই ছোটো মেয়েটার বুকের মাঝে পুষে থাকা আস্ত এক ভালোবাসার সাম্রাজ্য দেখে অবাক হয় সে। এই একুশ শতকে এসেও কেউ এমন ভালোবাসতে পারে! তা যেন ভাবনার বাহিরে ছিলো। কিন্তু উপরওয়ালার

ইচ্ছে হয় তো অন্যকিছু। আফসোসের শ্বাস ফেলে লোকটা বলে,

“তুমি বরং কাল বারোটার দিকে একবার এখানে এসে ঘুরে যেও। শেষ দেখাটা নাহয় দেখে যেও। যেভাবে হোক আমি তোমার সাথে তার দেখা করিয়ে দিবো। আজ তাহলে যাও।”চিত্রা আর জেদ করলো না। কী সুন্দর মেনে গেলো!

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো রাস্তার দিকে। কোনো ব্যস্ততা নেই, তাড়া নেই তার। কেবল পথচলা। ‘শেষ দেখা’ শব্দটা তার কানের মাঝে ঝনঝন শব্দ তুলে কেবল বাজতে লাগলো। সে আজও বিশ্বাস করতে পারছে না, বাহার ভাইয়ের সাথে তার আর দেখা হবে না। চাইলেই আর বাহার ভাইয়ের পুড়ে যাওয়া ঠোঁটের দিকে লাজলজ্জা খেয়ে

তাকিয়ে থাকা হবে না, বেসামাল কথা বলে বাহার ভাইকে লজ্জা দেওয়া আর হবে না। আর কিছু হবে না, মানুষটাই আর থাকবে না, পুরো পৃথিবীতে এত ‘না না না’ কেন? কেন এত নি°ষ্ঠু°রতা! চিত্রার মনে এক্কাদোক্কা খেলা বাহার ভাইয়ের জীবনেই কেন এত বিধ্বস্ততা থাকবে! তবে কী সত্যিই, বড় লোকের মেয়ে চিত্রাদের বাহার

ভাইদের ভালোবাসতে নেই! দারিদ্রতা কী তবে মরণব্যাধি!

সোডিয়ামের আলোয় কুয়াশাময় রাস্তা কেমন ধোঁয়াটে দেখালো। সেই অস্বচ্ছ রাস্তার দিকে চিত্রার ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া, তারপর ধোঁয়াশার মধ্যে কেমন হারিয়ে গেলো সে! এমন করেই বোধহয় হারিয়ে যেতে হবে ভবিতব্য না মানতে পারে। পুরো পৃথিবী জানিয়ে দিলো,

ভালোবাসা ফুল নহে, তা কেবল ভুল।গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান তখন মাঝামাঝি পর্যায়ে। চিত্রা অচঞ্চল পায়ে ছাঁদে এসে দাঁড়িয়েছে। সবার থেকে একটু দূরেই দাঁড়ানো। অহি আপার হাসি হাসি মুখ, হলুদ গাল গুলো। কত সুন্দরই না লাগছে! চিত্রারও তো এমন একটা রাতের স্বপ্ন ছিলো। তবে, সব স্বপ্ন কী আর পূরণ হয়! এটাও নাহয় না হলো।

এত ব্যস্ততার মাঝে দূরে দাঁড়ানো নির্জীব চিত্রার দিকে চোখ যায় অহির। হাসি হাসি মুখটার হাসিটা আরও বিস্তৃতি লাভ করে, কণ্ঠ বেশ ক্ষাণিকটা উঁচুতে তুলে সে ডাক দেয়, “এই চিত্রা, এখানে আয়। আপাকে হলুদ লাগাবি না?”

না চাওয়া স্বত্তেও চিত্রা কৃত্রিম হাসি নিয়ে এগিয়ে যায় আপার কাছে। অহি আবার ডান পাশটাতে বসতেই

চিত্রার এক আত্মীয়, সম্পর্কে ফুপি হয়, সে বেশ ঠেস দিয়ে বলে,“কিরে চিত্রা? তোর হাবভাব তো সুবিধার লাগছে না! কেমন দেবদাস, দেবদাস ভাব। ছ্যাঁকা খেলি নাকি?”

মহিলার ঠাট্টা মাখানো কথায় হাসির ঢল নেমে গেলো উপস্থিত জায়গায়। কেবল হাসলো না সওদাগর বাড়ির কেউ, কেবল অসহায় চোখে তারা তাকিয়ে রইলো চিত্রার দিকে।

তাদের হাসিতে তাল মেলালো চিত্রা, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বললো,

“কেন ফুপি, ছ্যাঁকা খেলে কী তুমি মলম লাগিয়ে দিতে পারবে?”

মহিলাও কম যায় না, ঝরঝরে কণ্ঠে সে উত্তর দিলো,

“তুই আমাদের আদরের ভাইঝি, মলম লাগাতে না পারি, শুনতে তো পারি নাকি?”

“মলমই যদি না লাগাতে পারো, তবে শুনে কী লাভ! সেই তো ক্ষত আরেকটু বাড়ানোর কাজই করবে। থাক নাহয়, আমার ক্ষত আমারই।”এবার আর মহিলার মুখে হাসিটা দেখা গেলো না। সে চোখ মুখ বাঁকা করে বললো,

“এত বড় বড় কথা কেন বলছিস রে! এতটুকু একটা মেয়ে!”

“এতটুকু একটা মেয়েকে তুমিই বা এমন বড় কথাটা বললে কেন ফুপি?”

মহিলা বেশ বিরক্ত হলো চিত্রার কথায়। মুনিয়া বেগমের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললো,

“মেয়ে তো বানাও নি যে আগুন বানিয়েছো।”মুনিয়া বেগম অন্যসব মায়ের মতন মুখ অন্ধকার করলেন

না বরং বেশ সুন্দর একটা হাসি দিয়ে উত্তর দিলেন,

“আগুন না হলে তো অন্য আগুন তাকে পুড়িয়ে দিতো। তাই বানালাম আর কি।”

সওদাগর বাড়ির সবার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি দেখা দিলো। নতুন উদ্যমে জমে উঠলো আবারও অনুষ্ঠান। চিত্রা খুব ধীরে অহির গালে লাগিয়ে দিলো একটু হলুদ। অহি

কেবল তাকিয়ে দেখলো মেয়েটাকে। এই মেয়েটার দিকে তাকালে মনেহয়, অহি ঠিক মতন ভালোবাসতে জানেই নি। কই, ভালোবাসার মানুষটার এমন নির্মম পরিণতি জেনেও তো সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে, আর অন্যদিকে মেয়েটা কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে!

অহি আপাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্মিত হাসলো চিত্রা। ক্ষীণ স্বরে বললো,“কিছু বলবে আপা?”

“তুই বাঁচতে পারবি তাকে ছাড়া?”

অহির প্রশ্নে চমকায় না চিত্রা। কেবল অন্যমনস্ক হয়ে বলে,

“সেটা সময় বলবে।”

“তুই কী জানিস, আমিও বাহার ভাইকে ভালোবাসি?”

“একটু একটু জানি বোধহয়।”

“তবে তোর মতন আমি এমন নিস্তেজ হতে পারলাম না কেন? তবে কী কম ভালোবেসেছি?”

আপার বাচ্চামো প্রশ্নে হাসলো চিত্রা। আপার গালে হাত রেখে ফিসফিস করে বললো,

“তুমি যতটা ভালোবাসতে পেরেছো, ততটা ভালো আমিও বাসতে পারি নি। বিচ্ছেদ মানুষের মাঝে দু রকমের প্রভাব ফেলে। কেউ বিচ্ছেদ

সহ্য করতে না পেরে শক্ত হয় আর কেউ মুক্তি খোঁজে মৃত্যুর মাঝে। তুমি হলে গিয়ে প্রথম জন।”“আর তুই কী তবে দ্বিতীয় জন!”

অহি আপার প্রশ্নের উত্তর দিলো না চিত্রা। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো এখানে, তেমন ভাবেই নিঃশব্দে ছাঁদ থেকে নেমে গেলো নিচে। নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিলো। হাঁটুর মাঝে মুখ ডুবিয়ে বললো,

“আপনারে ছাড়া এই বাড়ির ছাঁদে যেতেও আমার দমবন্ধ হয়ে যায় বাহার ভাই। আর সেই আমি কেমন করে এই বিশাল পৃথিবীতে থাকবো?”ডিসেম্বরের বিশ তারিখ। প্রকৃতিতে ঘন হয়ে আসা মেঘের বিচরণ। ঝড় আসবে বোধহয়। শীতকালে বৃষ্টির দেখা মেলে না তবে আজ সকাল থেকেই আকাশের মন খারাপ। সকালের আকামে কেমন

সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। সাদা পাঞ্জাবির পকেটে দামী ফোনটা ঢুকিয়ে হেলতে দুলতে বিরাট হোটেলটায় ঢুকে পড়লো নামীদামী সেই নেতা। আজ আরও একটা জয়ের সেলিব্রেশন করতে তার মেয়ে সঙ্গী দরকার। ভালো একটা মেয়ে এসেছে। বৃষ্টিমুখর এই জয়ের উদযাপন ভীষণ ভালো ভাবেই করা যাবে ভেবেই তৃপ্তির ঢেকুর তুললো সে। সচারচর

সে নিজের সাথে কয়েকজন ছেলে রাখলেও এ সময়টা একা উদযাপন করে। তাছাড়া এমন খবর লিক হয়ে গেলেও সমস্যা। তাই এই সময়টা সে একা থাকে।চির পরিচিত বিশাল রুমটাতে প্রবেশ করতেই অবাকে হা হয়ে যায় নেতা সাহেব। ঘুটঘুটে আঁধারের মাঝে কেমন মোমবাতি জ্বালানো। একদম মোহনীয় পরিবেশ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে

যায় সুঠামদেহী লোকটা। এত বিশেষ আয়োজনে কখনো নারী ভোজ করা হয় না। তবে আজ এমন বিশেষত্ব দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে আসে। সাদা বিছানার উপর সাদা শাড়ি পড়া ঘোমটা দেওয়া রমণীকে দেখে তার তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে গেলো ঠোঁটে। ঘোর ঘোর দৃষ্টিতে সে এগিয়ে এলো রমণীর দিকে। নেঃশাক্ত কণ্ঠে বললো,

“বাহ্, নতুন বউয়ের সাজে কখনো মা** দের বসে থাকতে দেখি নি। তোমার শরীর আমাকে বড্ড টানছে। তোমার মুখটা দেখি।”রমণী এমন বাজে সম্বোধনের পরেও খিলখিল করে হেসে উঠলো। সারাঘরে যেন মুক্তো ঝরলো সেই হাসির শব্দে। নেতা সাহেব মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো। রমণী খাট থেকে নেমে গিয়ে টেবিলের উপর থাকা দুধের

গ্লাস এনে নেতা সাহেবের ঠোঁটের সামনে ছুঁইয়ে দিলো। ঘোরের মাঝে থাকা নেতা সাহেব রমণীর কোমড় জড়িয়ে খেয়ে নিলো সে দুধটুকু। তৃপ্তিতে তৃপ্তিতে ভরে উঠলো তার চারপাশ। আরও একবার সুখের সাগরে ভেসে যাওয়ার প্রস্তুতিতে মত্ত হয়ে গেলো সে।কমিউনিটি সেন্টারে মানুষের তুমুল ভীড়। কনে কখন আসবে সে উন্মাদনায় মুখিয়ে আছে

সবাই। সবার টান টান উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটিয়ে অবশেষে হাজির হয় অহি। তাকে নওশাদ হাত ধরে গাড়ী থেকে নামায়, চিন্তিত কণ্ঠে বলে,

“পাক্কা দেড় ঘন্টা লেইট! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন!”

অহি শরীরের শাড়ি ঠিক করতে করতে বললো,

“পার্লার থেকে তো সেই কখন বেরিয়েছি কিন্তু এত জ্যাম ছিলো যে

আসতে আসতে এতটা সময় লেগে গেলো।”

নওশাদকে কথাটা বলেই চাঁদনী আপার দিকে তাকালো অহি, ব্যস্ত কণ্ঠে বললো,

“আপা, পড়নের শাড়িটা ব্যাগে। ঠিক করে রেখো তো।”চাঁদনী মাথা দুলিয়ে গাড়ীর কাছে চলে আসে, অহি ততক্ষণে স্টেজের দিকে চলে গিয়েছে। চাঁদনী শাড়ির ব্যাগটা ধরে

টান দিতেই শপিং ব্যাগটা ছিঁড়ে শাড়িটা নিচে পড়ে গেল। কপাল কুঁচকে শাড়িটা উঠাতেই অল্প কিছু লাল রঙের দাঁগ দেখে বিরক্ত হয় সে। মেয়েটা এত অযত্ন কেমনে করে! সাদা শাড়িটার মাঝে কেমন বিদঘুটে লাল দাঁগ ফেলে দিয়েছে! দুপুর প্রায় একটার কাছাকাছি। কোনো রকমের হাঁপিয়ে ওঠা শরীরটা নিয়ে থানার সামনে দাঁড়ালো

চিত্রা। বুকের মাঝে ভয়। বাহার ভাইকে কী নিয়ে চলে গেলো!

থানার কাছটাতে এসে দাঁড়ালো চিত্রা। বাহার ভাইকে গাড়িতে তুলে ফেলেছে। গাড়ীটা কেবলই ছাড়তো। চিত্রা কোনোমতে গাড়ীটার সামনে দাঁড়াতেই গতকাল রাতের কনস্টেবল টা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো, ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে বললো,“এত দেরী করে এসেছো!

কতক্ষণ যাবত তালবাহানা করে গাড়ীটা আটকে রেখেছি জানো? দাঁড়াও বড় স্যারকে জিজ্ঞেস করে আসি এখন আর তাকে গাড়ী থেকে নামতে দেওয়া যাবে কিনা।”

চিত্রা মাথা নাড়াতেই লোকটা নুরুল সওদাগরের কাছে চলে গেলেন। কী যেন বললে কতক্ষণ। অনেকটা সময় বাকবিতন্ডার পর লোকটা আবার

ব্যতিব্যস্ত পায়ে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বাহার ভাইকে বের করলেন।

চিত্রার হৃৎপিন্ড হুট করেই যেন থেমে গেলো। মানুষটার মুখে কেমন মায়াবী হাসি! চিত্রাও আজ কাঁদলো না। হাসিমুখে এগিয়ে গেলো মানুষটার দিকে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো,“কেমন লাগছে বলুন আমাকে?”

বাহার আপাদমস্তক দেখলো চিত্রাকে। তারপর মিষ্টি হেসে বললো,

“একদম মেঘের মতন।”

চিত্রা খিলখিল করে হাসলো, ঠাট্টা করে বললো,

“আকাশে যাবো তো, তাই মেঘ হয়েছি।”

“আকাশ তোমার জন্য নহে, মেয়ে। ছোটো জীবনে অনেক পাওনা বাকি তোমার।”

“যেখানে আপনাকেই আর পাওয়া হলো না, সেখানে অনেক পাওনা আমার কাছে অনর্থক।”

“দু একটা না পাওয়া থাকতে হয় জীবনে।”“আপনাকে পেয়ে গেলেই আমার না পাওয়াদের মুক্তি হতো।”

বাহার ভাই আর কোনো উত্তর দিলো না। কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো চিত্রার দিকে। হাসি হাসি মুখটা নিয়েই বললো,

“ভাবতেই খুব অবাক লাগে মেয়ে, আমাদের আর কখনো দেখা হবে না। আমার এর জন্য কোনো আফসোস নেই, আমার আফসোস কেবল, তুমি ভালোবেসে কী কষ্টটাই না পেলে!”

এতটুকু কথাই হয়তো যথেষ্ট ছিলো চিত্রার মুখের হাসি কেড়ে নিতেই। ছোটো চিত্রা যে অনেক চেয়েও পারলো না কান্না আটকাতে। বাহার ভাইয়ের ডান হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। চিৎকার দিয়ে বললো,“আমার বুকের মাঝে ক্ষত করে পালাচ্ছেন, বাহার ভাই? এজন্যই বোধহয় বলেছিলেন

আপনাকে জ্বালালে আমি নিজেও জ্বলে যাবো তাই না। এই পৃথিবী অনেক নিষ্ঠুর জানেন তো, বাহার ভাই। আপনার জন্য আমি চির জীবন শোক পালন করে ম°রার মতন বেঁচে থাকতে পারবো না। বুকের ভেতর আস্ত একটা বাহার ভাই পুষে রাখা আমি, বাহার বিহীন বাঁচতে পারবো না। আমায় কেন এমন পর করে দিলেন!”

রঙ্গনার চোখের পানি মুছে দিলো বাহার ভাই। খুব যত্নে, আদুরে হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,“কে বলেছে পর করে দিয়েছি? আমি তো তোমার অস্তিত্বে মিশে আছি, রঙ্গনা। এই-যে, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যে তৃপ্তি পাবে, সেই তৃপ্ততায় আমি থাকবো। তোমার ছাঁদের ফুল গাছ গুলোতো, হাসি হাসি ফুলের মায়ায় আমি থাকবো, আমি থাকবো তোমার

উদাস বিকেলে, আমি থাকবো তোমার নির্ঘুম রাত গুলো তে, আমি থাকবো তোমার বারান্দার অযত্নের ফুলের টবে, আমি থাকবো তোমার সাদা শাড়ির আঁচল মাঝে, তোমার চুলের খোপায়, চুড়ির ভাজে আমি থাকবো রঙ্গনা। তোমার বুকের মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়ে আমি থেকে যাবো চিরকাল রঙ্গনা। তোমার চোখের কান্না হয়ে আমি আছি।”“অথচ আমি

যে আপনাকে রঙিন বসন্তে চেয়েছিলাম।”

“বসন্তেই তো আছি, রঙ্গনা। চৈত্রমাসের মতন। কিছুটা শুষ্ক, ফেঁটে যাওয়া মাটির খড়ার মতন হয়ে। তোমার যতবার মনে হবে আমি নেই, ততবার তোমার মস্তিষ্কে আমি আছি। কাঁদছো কেন রঙ্গনা? সবাই যে চিরদিন থাকে না।”

“বাহার ভাই যে সবার মাঝে পড়ে না। ও বাহার ভাই, আমার অনেক ব্যাথা হচ্ছে বুকে। থেকে যান না প্লিজ। থেকে যান। আপনাকে আমি খুব গোপনে রেখে দিবো। পৃথিবীর বুক থেকে আড়াল করে রেখে দিবো আমি। থাকুন না, বাহার ভাই।”“নিয়তি যে আমার হাতে নেই। তবে আমার আর কোনো আক্ষেপ নেই মেয়ে বরং এটা ভেবে

শান্তি যে, টুপ করে ম°রে গেলে, টুপটাপ বৃষ্টিতে আমার ভিজে কবরের উপর ছাতা ধরে রাখার একজন মানুষ এই পৃথিবীতে আছে। আমার কবর যত্নে রাখার মানুষ আমি রেখে যাচ্ছি এখানে। পৃথিবীর প্রতি এই কৃতজ্ঞতা আমার থেকে যাবে।

শুনো, মেঘের বেশে থাকা রঙ্গনা,
কাঁচের ফাটল মানায়, তোমার না।”

চিত্রা যখন আরেকটু জড়িয়ে ধরবে বাহার ভাইকে, ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হলো। নিষ্ঠুর ভাবে বেজে উঠলো বিদায়ের ঘন্টা। চিত্রার হাত থেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাহার ভাইকে। আর দেখা হবে না। মানুষটার মুখের হাসিটা চাইলেও আর দেখতে পারবে ভেবেই হাউমাউ কান্না জুড়ে দিলো চিত্রা। গগণ ফাটানো চিৎকার। সাথে

প্রলাপ বকে বলছে,“আব্বু, আমার কবর খানা বাহার ভাইয়ের কবরের পাশে করবেন। আপনার কাছে আমার শেষ আবদার আব্বু, আমায় আপনি বাহার ভাইয়ের পাশে ঠাঁই দিয়েন।”

বাহার ভাই গাড়ীর মাঝেই সুর তুললেন, দৃষ্টি তার রঙ্গনাতেই আবদ্ধ। হুট করেই শীতের আকাশে ঝুম বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ভিজে

একাকার রঙ্গনা। সে রঙ্গনার পানে নির্মিশেষ তাকিয়ে থেকে বাহার ভাই গাইলেন,

“দূর আকাশে চান্দের পাশে,
ঝলমল করে তারা,,
আমার কেউ না-ই রে বন্ধু
কেবল তুমি ছাড়া।”বিয়ের বাড়িতে খুশির আমেজ। বৃষ্টিমুখর আবহাওয়ায় অনুষ্ঠানে কেমন মাখো মাখো ভাব। অহির হাতে কলম, বুক

তার কাঁপছে। যেখানে একটা জীবনের শেষ আজ, সেখানে আরেকটা জীবনের নতুন পথচলা শুরু। অহি চোখ বন্ধ করলো, চোখের পাতায় ভেসে উঠলো ছন্নছাড়া বাহার ভাইয়ের মায়া মায়া মুখের আদল। কখনো তার খিলখিল হাসিতে পরিপূর্ণ থাকা মুখ, কখনো তার সিগারেটে পুড়ে যাওয়া ব্যাথা গুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো অহির

হৃদয় জুড়ে। অহি তপ্ত শ্বাস ফেললো, চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুকণা, মন বলে উঠলো,

“আজ শেষ মুহূর্তে আমি আবার শুরুর কথাটা বলছি, শেষবারের মতন ভালোবাসি। এই সূর্য, চাঁদের সত্যিটার মতন আমি আপনারে ভালোবাসি। শেষ বেলা এসেও আমি আপনারে ভালোবাসি বাহার ভাই। আপনার প্রতি আমার যে ভালোবাসা

তা আমি বোধহয় ভুলে গিয়ে কাউকে ভালোবাসতে পারবো না। থাকুন না আপনি খুব গোপনে।”

আফসোসের দীর্ঘশ্বাসের ভার সামলে সাইন করে ফেললো সে। অবশেষে বাহার ভাইকে হৃদয়ে পুষে আরেকজনের জীবনে পদার্পণ করেই ফেললো। এটাই তো জীবন, ভাসতে ভাসতে যেতে হয় ভাসানপুর।পুরো বাড়িতে অবনী বেগম একা। সবাই

এখনো বিয়ের অনুষ্ঠানে। সে বাড়িতে এসেছে চিত্রার জন্য। মেয়েটাকে সেন্টারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে সে ভেবেছিলো মেয়েটা বাড়ি এসেছে কিন্তু বাড়িতে এসে দেখে বাড়িতে কেউ নেই। অগোছালো বাড়িটাকে তাই গুছিয়ে নিচ্ছে। মেয়ে জামাইকে আজ এ বাড়িতেই রাখা হবে আফজাল সওদাগরের আবদারে।ফুলদানী টা গুছাতে

গুছাতে বাড়ির কলিংবেলটা সশব্দে বেজে উঠলো। অবনী বেগম ব্যস্ত হাতে খুলে দিতেই একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে চোখে পড়লো। লোকটা তাকে দেখেই একটা খাম এগিয়ে দিলো। খামটা দেখেই মনে হচ্ছে কোনো অফিসিয়ালি কিছু। অবনী বেগম সাইন করলেন। খামটা দরজায় দাঁড়িয়েই খুললো। খুলতেই তার

চোখে অশ্রুদের ভিড় জামলো। বাহারের চাকরি টা হয়ে গিয়েছে। এবং সেই লেটারই এসেছে। বুক চিরে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। প্রাণের বিনিময়ে কী তবে সৃষ্টিকর্তা চাকরি টা দিলেন! কী তার মহিমা! শাড়ির আঁচল দিয়ে যেই না চোখ মুছে দরজাটা বন্ধ করতে নিবেন, সেই মুহূর্তে দরজার সামনে বর্তমানে উপস্থিত হওয়া মানুষটাকে দেখে সে

দু’পা পিছিয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে, এলোমেলো অনুভূতি নিয়ে কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন,“আ আমজাদ!”

ফর্মাল পোশাকে থাকা আমজাদ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো অবনী বেগমকে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো,

“আমি একবারে চলে এসেছি, অবু। আমি আর তোমাদের ছেড়ে কোথাও

যাবো না। তোমার মতন কেউ হয় না, কেউ না।”

অবনী বেগম কেবল বিস্মিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই রইলেন। তার যেন বিশ্বাস হলো না ঘটনাটা।তুমুল বৃষ্টি ধারায় চুপচাপ ভিজে চলছে চিত্রা। হাতের নুপুর জোড়া রেখে দিয়েছে বাহার ভাইয়ের বোনের কবরের উপর। দু’টো কবরের মাঝখানে সে বসে আছে। কি যেন বলছে, হাসছে

আবার হুট করে কেঁদে দিচ্ছে। বুকের মাঝে ব্যাথাদের তোলপাড়। তুমুল শীতের মাঝে ভিজে শরীর নিয়ে আবার কেঁপে কেঁপেও উঠছে কিঞ্চিৎ।

মাটিতে মাখামাখি তার শরীর। চোখের উপর ভাসছে কয়েকমাস আগের তার জীবনের হাসিখুশি চিত্র গুলো। বাহার ভাইয়ের গিটারের শব্দ, এলোমেলো গানের সুর। বন্ধ

চোখের পাতা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। চিত্রা হাসতে হাসতে হাতের মুঠোয় থাকা ব্লে° ড টা বের করে বা’হাতের রগ বরাবর চেপে ধরলো। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললো,“আল্লাহ্, আমার সকল অভিযোগ আমি রেখে গেলাম তোমার দরজায়। এই পৃথিবী আমাদের বাঁচতে দিলো না আল্লাহ।

তোমার তৈরী এই পৃথিবীর বড্ড নিষ্ঠুর। আমাদের মতন মানুষ যে সহ্য করতে পারে না সে নিষ্ঠুরতা। তুমি আমায় ক্ষমা করো আল্লাহ। তোমার ঐ দুনিয়ায় আমার ঠাঁই হবে জেনেও আমি পাপ করছি। কী করবো বলো? এমন ভাবে আদৌও বাঁচা যায়! বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে নিয়ে মৃত্যু যে কতটা কঠিন, তা কেউ জানবে না। কেবল তুমি

জানবে তোমার বান্দার হাহাকার। এ পৃথিবী বাহার ভাই আর চিত্রার সংসার তৈরী করতে দিলো না। মানুষ গুলো আমার আপন হয়েও হইলো না। বাহার ভাই শুনছেন, আপনাকে রঙ্গনা বড্ড বেশিই ভালোবাসে। তাই তো সে আপনার মিছে পাপ মুছতে না পেরেও মুছে ফেলেছে সে পাপীকে। ভালোবাসি বাহার ভাই।”হাতের চাপ শক্ত করার

আগেই পেছন থেকে কোমল পুরুষালী কণ্ঠে কেউ বলে উঠলো,

“আমিও তোমায় ভালোবাসি রঙ্গনা। ঠিক চৈত্রমাসের মতন। যে চৈত্রমাস বসন্ত আনে ধরায়, ঠিক সেই চৈত্রমাসের মতন। আমাদের সংসার হবে রঙ্গনা। তুমি আমার চিত্ত চিরে চৈত্রমাসের কারণ, তুমি আমার শত ভুলের আকাশ ছোঁয়া বারণ। আমাদের সংসার হবে মেয়ে।

কাঁদছো কেন মেয়ে, সংসার করবে না?”

চিত্রা পেছনে ঘুরে বিস্মিত কণ্ঠে বললো,

“বাহার ভাই!”বিরাট হোটেলের সাদা বিছানায় র° ক্তের স্রোত। নুরুল সওদাগর তন্নতন্ন করে খুঁজছে বিরাট রাজনৈতিক নেতার খু° নের রহস্য। তন্মধ্যে তার ফোনে কল এলো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে সে ফোন উঠাতেই দেখলো

উপর মহল থেকে কল। নুরুল সওদাগর ফোন ধরেই সালাম করতে অপর পাশ থেকে কর্কশ কণ্ঠে বড় অফিসার বলে উঠলেন,

“আপনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নাকি একজন ফাঁ° সির আসামী পালিয়েছে!”

“জি স্যার!”

“ধ্যান কোথায় থাকে আপনাদের? আপাতত ঐ আসামীর তদন্ত বাদ

দিয়ে মিস্টার শেখরের খু° নের তদন্ত করুন এবং ঐ আসামীর ছবি পুরো শহরে ছাপিয়ে রেড লাইট এলার্ট জারী করুন।”

“ইয়েস স্যার।”ফোন কেটেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো নুরুল সওদাগর। তার বিশ্বস্ত সেই কনস্টেবল এসে রাশভারী কণ্ঠে বললো,

“স্যার, বাহারের ছবিটা কখন ছাপাবো!”

নুরুল সওদাগর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “আজ রাতের পর। ওরা ঢাকা ছাড়ুক, তারপর নাহয়।”

“বড় স্যার কল দিলে কী বলবেন?”“আহা, চিন্তা করো না শাহাবুদ্দিন, আপাতত এই বিশিষ্ট নেতার খবরেই তোলপাড় হবে মিডিয়া। বাহার তো অন্যান্য

আসামীর মতনই নরমাল। তাকে নিয়ে ঝড়টা তেমন আসবে না। এখন সব প্রেশার পড়বে এ খুং নটা নিয়ে।”

কনস্টেবল এবং নুরুল সওদাগর কুটিল হাসি দিলেন। দু’জন লেগে পড়লো খুং নের রহস্য নিয়ে। তন্মধ্যে নুরুল সওদাগরের পায়ের নিচে কিছু পড়তেই তিনি থেমে গেলেন। এক টুকরো সাদা চুড়ি।

নুরুল সওদাগর চুড়িটা উঠিয়ে খুব গোপনে পকেটে গুঁজে নিলেন। মনে মনে বললেন,“অনেক হেঁটেছি আইনের পথে, দুর্নীতির এ জীবনে সৎ হওয়াটা মহা পাপ। বাবা তোমার কথা শুনেছে, চিত্রা। দু একবার চোখ বন্ধ করে আইন ভঙ্গ করে দেখেছে। এর চেয়ে শান্তি কিছুতেই নেই। তোমাদের সুখের সংসার হোক। তোমার বাহার ভাই তোমারই

থাকুক। বাবা তোমায় ভালোবাসবে না ভালোবাসবে না করেও ভালোবেসেছে। তুমি ভালো থেকো, পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া বেকার বাহারদের গল্পে।”কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া বেকার বাহার ভাইরা ভালো থাকুক। খুব গোপনে হলেও তারা ভালো থাকুক। চিত্রাদের গল্পে তারা রোজ রোজ বাঁচুক, হাসুক। বেকারত্বের অভিশাপেও যেন

বাহাররা না হারায়। ভালোবাসার কাছে যেন এমন করেই হেরে যায় সকল আইন, সকল স্বার্থপরতা। ভালোবাসার চেয়ে বড় কোনো আদালত এ পৃথিবীতে নেই। তোমরা যতই স্বার্থপর হও, তোমাদের এই ভালোবাসার কাছে এসে থামতেই হবে। বেকার বাহারদের হাত ধরে পথ চলে দেখো, একদিন তারা তোমায় পুরো পৃথিবী দেখাবে।

রঙ্গনাদের প্রাপ্তিতে, অহিদের অপ্রাপ্তিতে আপনি থেকে যান বাহার ভাই, আমরা রেখে দিবো।